কল্লোল

১৩৩০ অগ্রহায়ণ ৮ম সংখ্যা

শ্রাবণ-শেষে

শ্রাবণ যেদিন হারিয়ে যাবে
সব হারাবার ক্রন্দনে ;
ফেনিল স্মৃতি থাক্‌বে ভেসে
ভাদ্র-নদীর ঢেউয়ের শেষে,
আলো ঝরার দিন ফুরাবে
মরণ বাহুর বন্ধনে।

দয়িতা তার কাঁদে যেথায়
ব্যাকুল-ব্যথার স্মরণে ;
শ্রাবণ যাবে কূল ভাসিয়ে
কেয়াবনের ফুল হাসিয়ে,
নবীন্ ধানের ক্ষেতের বুকে
আপন মরণ বরণে।

রবে না তার চোখে সেদিন
দিক্ হারানো চাহনি ;

তরুণ-ব্যথার রক্ত ঝরা
পলাশ-বনের আগুন-ধরা
রবে না তার কাঁদন ভরা
গোপন বুকের দাহিনি।

হাস্‌বে সেদিন রবির-রেখা
অরুণ আলোর অঞ্চলে;
শ্রাবণেরই মরণ-রাতের
দুঃখ-জয়ী জীবন পাতের
অধর কোণের মিলিয়ে যাওয়া
শেষ হাসিটি—মন ছ'লে।

* * *

ভিখারী মানুষের বালাই, কিন্তু 'দয়া' জিনিষটাকে শান্ দিতে এত বড় উপকরণ আর নাই।

দর্শক।

* * *

বন্ধন

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

টরে টক্ টরে টক্! . . .

বিরামহীন বিশ্রামহীন তারের শব্দ কানের কাছে বেজে চলেছে—টরে টক্ টরে টক্। . . .

বহু পুরাতন ক্ষুদ্র একখানি ঘর। তার মধ্যে আসবাব পত্রও অতি সামান্য। সমস্ত ডাকঘর থেকে পৃথক করা ঐ যে এক কোণে খাঁচার ভরা ঘরখানি, তারি মধ্যে সে অনবরত কাজ করে চলেছে—নির্ব্বাক্ ও নিঃশব্দ . . .

কত নবীন বসন্ত, কত সরস বর্ষা, কত আঁধার হেমন্ত, তার চোখের ওপর দিয়ে ব'য়ে যায় কিন্তু তার চোখ সেদিকে পড়ে না। সে শুধু ঐ সরব যন্ত্রটার নম্র মধুর ও বজ্র নিঠুর বিভিন্ন বারতা কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে লিখে চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ফিরে তাকাবারও সময় নেই তার!

সমস্ত দিন ডাকঘরের কোলাহল মুখরিত উৎসাহ উত্তেজনায় তার মন ভরে থাকে কিন্তু দিনের শেষে যখন সকল কর্ম্মের অবসানে সমস্ত ডাক বাড়ীটা নির্জ্জনতায় ডুবে যায়—প্রান্তরের পরপারে ক্লান্ত রবির রাঙা আলো নিভে আসে তখন বাতি জ্বালিয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় নির্জ্জন গৃহ-কোণের একপ্রান্তে বসে বসে প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। ছুটী? সেত অর্দ্ধরাত্রি ভিন্ন হবার যো নাই!

কত দেশের কত বুক ভরা আনন্দের রুদ্ধ আবেগ ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটার ভিতর উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, আবার কত নরনারীর অভাগ্য অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তির ব্যথা ও তপ্ত নয়নাশ্রুর করুণ কাহিনী তাতে বেজে ওঠে। সে বসে বসে লেখনী সাহায্যে তারই পুনরুক্তি করে যায় মাত্র। অসংখ্য লোকের প্রীতি ও অভিশাপ সে কুড়িয়ে আস্‌ছে সারাজীবন ধরে কিন্তু কিছুই তার মনে দাগ কাট্‌তে পারে না।

খুব একঠা উচ্ছ্বাসপূর্ণ আনন্দ সংবাদ যন্ত্রটাতে বেজে উঠ্‌তেই সে সেটা লিখে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলে। তার পর সব চুপ চাপ! কালো আঁধারে সমস্ত পৃথিবী আছন্ন হয়ে গেছে। জান্‌লা দিয়ে অনেকদূরে আকাশের কোলে উজ্জ্বল

তারাটী জল্ জল্ করে জলছে, সে সেই দিকে চেয়েছিল। বাইরে শীতের বাতাস হু হু করে বইছে, তাতে হাড়ের ভেতরটা অবধিও কাঁপিয়ে দেয়। সে সেদিকে লক্ষ্য না করে অসীম কালো আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে ভাবছিল তার ক্ষুদ্র শিশুটীর কথা।

কত নদ-নদীর ব্যবধানে কত শত মাইল দূরে সেই শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামটীর পারে সেই নির্জ্জন কুটীরে গৃহ-কোণে মার বুকে শুয়ে খোকাটী তার ঘুমিয়ে আছে। সে তার অসুখের খবর পেয়েছিল অনেকদিন —এখন কেমন আছে কে জানে ?

টক্কা টরে টরে টরে। . . . জোরে যন্ত্র বেজে উঠ্ল !

চিন্তাসূত্র মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যেতেই চোখ নামিয়ে সে কল ধর্‌লে। কিন্তু একি! এমন অসময়ে তার নিজের নামে কিসের তার এ! বুক তার কেঁপে উঠ্ল। ধমনীতে রক্ত তার বরফের মত ঠাণ্ডা! রগ দুটো তার দপ্ দপ্ করে উঠ্ল। ওগো তার বড় আদরের খোকাধন কেমন আছে গো সে কেমন আছে ?—

টরে টক্কা টরে টরে টরে! . . . শব্দ থেমে গেল !

হঠাৎ সেই নিঃস্পন্দ নিস্তব্ধতা ভেদ করে চীৎকার উঠ্ল খোকা! খোকা রে আমার!—তার পর ঘরখানা আবার অসীম নিরবতায় ডুবে গেল! . . .

---

* * *

মানুষ যখন বলে—'তোমায় ভাল বাসি,' তখন তার মনখানি শ্রদ্ধায় আনন্দে গর্ব্বে পরিপূর্ণ থাকে তাই বল্‌তে পারে—'তোমার লাগিয়া কলঙ্ক পসরা মাথায় বহিয়া সুখ'।

'চিত্রি'।

শেষ বেলা

—শ্রীমিনতি দেবী

২রা আষাঢ়।

ক'দিন হল এ বাড়ীতে এসেছি। রাস্তার ওপরেই ঘর আমার। দিন এক রকমে কেটে যায় এই কোলাহল মুখরিত রাজপথকে দেখে। সকলেই নিজের কর্ত্তব্যে ব্যস্ত হয়ে যে যার কাজে চলে যায়। বিরামবিহীন এই পথের কাজ দেখে ভাবি, মানুষের জীবনও কি এম্নি হতে পারে না? উঃ! কি কষ্টকর এই রোগ ভোগা! বড় অসহ্য! কবে যে এর শেষ হবে তা তিনিই জানেন। (এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে আশ্রয় করে মানুষের এত আশা এত আকাঙ্ক্ষা কেন যে জেগে ওঠে তা জানি না! বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ক্ষুদ্র এই মানুষকে তিনি কেন যে এমন করে চাবুক মারেন তা বুঝি না।)

৮ই আষাঢ়।

দিন দিন যে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু বড়, ধীরে ধীরে যে! কবে যে এগুলোর শেষ হবে তা জানি না। আর যে আমার ভাল লাগে না - সকলকে যেন অস্থির করে তুল্‌ছি। কাউকে যেন আর বিরক্ত কর্‌তে না হয়। হে ঠাকুর! শেষ করে দাও এই অভিশপ্ত জীবনকে। হে মৃত্যু আমার চির বাঞ্ছিত এস। তোমার ঐ শীতল স্পর্শে আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাক্! কত লোকের ত তুমি ভরা বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাও। আর যে চিরদিন তোমাকেই ডেকে আস্‌ছে, তার কাছে আস্‌তে তোমার এ কিসের সঙ্কোচ তা বুঝি না।—ও বুঝেছি, তুমি সুখের সংসারে মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া সংসারে ঢুকে তার বুকে বসে রক্ত খেতে ভালবাস। যে জীবনের দরকার নাই, যার জীবন সংসারের ভার, যে হতভাগীর গেলেই শান্তি, তুমি বড় দয়াবান্ তার ওপর বড় অনুগ্রহ দেখ্‌তে পাচ্ছি তার ওপর তোমার। পৃথিবীর শূন্যতার ভার তার বুকে চাপিয়ে বাঁচিয়ে রাখ।

১০ই আষাঢ়।

শুন্‌লাম পাশের বাড়ীতে আমারই মত রোগে ভুগ্‌ছে একটী মেয়ে। প্রায়ই

দেখি ডাক্তার আসা যাওয়া করেন। ছোট ছোট দুটি ছেলে আছে। আমরা আস্‌বার অল্পদিন আগেই এঁরা এসে'ছন, অনেক জায়গায় ঘুরে অবশেষে এই খানে। বিধবা মায়ের এই একটী মাত্র সন্তান। স্বামী বেশ অবস্থাপন্ন। বেচারার কোনই অভাব নেই। আহা তার সুখের জীবন কি এত অল্পকাল মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে? সংসারে কদিনই বা সে সুখভোগ কর্‌তে পেলে? যেতেই হবে তাকে বোধ হয়। এই কাল রোগ যখন ধরেছে, তখন কি আর উপায় আছে? আহা ছেলে দুটীর কি হবে?

২০শে আষাঢ়।

এই খাতাটাই আমার জীবনের সঙ্গী। এটাকে নিয়েই আমার অনেক সময় কেটে যায়। যদি এটাকে না পেতাম, তাহলে আমার যে কি অবস্থা হ'ত তা জানি না! নিঃসঙ্গ জীবনের এম্‌নি একটি সঙ্গী না পেলে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? ক'দিন শরীরটা বড়ই খারাপ ছিল, তাই আর কিছু লিখ্‌তে পরিনি। মানুষ কথা না কয়ে কি থাকতে পারে? আমি কথা কই এইটির সাথে। ডাক্তারের কাছ থেকে অনেক করে অনুমতি নিয়ে একে পেয়েছি, নইলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতুম।

২৫শে আষাঢ়।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। রাত বোধ হয় গভীর হয়ে এসেচে, উঃ, খুব বৃষ্টি নেমেছে দেখ্‌ছি! দুচারটা গাড়ী যাচ্ছে মাঝে মাঝে, তার আওয়াজ আস্‌ছে, ছপ্‌-ছপ্‌-ছপ্‌। ঘোড়া গুলো যেতে পার্‌ছে না এই জল ভেঙ্গে! আহা, নিরীহ জীবের ওপর একি অত্যাচার মানুষের!—বল হরি, হরিবোল!—আহা এই বাদল রাতে কে গেল? কোন অনন্তের উদ্দেশে তার যাত্রা সুরু হল, কে জানে? এমনি রাতে কেউ বেরোয় গো? ওগো অনন্ত পথের যাত্রী, এই কি তোমার যাবার সময় হল? জানি না কেন এই অজানা যাত্রীর জন্য মনটা আমার এমন লাগ্‌ছে। আহা, বেচারী তার স্নেহের নীড় ছেড়ে আত্মীয় বন্ধুর ভালবাসা সব ফেলে রেখে এই ঝড় জলে অনন্তের উদ্দেশে যাত্রা করল!

এই বৃষ্টিতে ওকে পথিক গান গেয়ে গেল :—

এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোল খোল।
হল দেখা হল মেলা
আলো ছায়ার হল খেলা,
স্বপন যে সে, ভোলো ভোলো।

১লা শ্রাবণ।

ডাক্তার বলে গেছেন—"আর বোধ হয় বেশী দিন নয়।" কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার, তা শুনে! "হয়ত দু সপ্তাহ মধ্যেই সব শেষ হয়ে যেতে পারে।" সত্যি যদি তাই হয়, বড় শান্তি বড় আরাম পাব যে আমি তাহলে। ঐ বাড়ীর মেয়েটী কেমন আছে কে জানে? সকাল থেকে দু তিনবার ডাক্তার এল, বোধ হয় খুবই অবস্থা খারাপ।—আচ্ছা আমাদের দুজনের মধ্যে কে আগে যাবে? ও যেন না যায়, ওর যে সুখের সংসার! বড় ব্যথা লাগ্‌বে যে সকলের। ওর বোধ হয় যাবার ইচ্ছা নেই, কেনই বা থাকবে? বুকে যেন কেমন ব্যথা কচ্ছে, হাত যেন আর চল্‌তে চাচ্ছে না, আর পারছি না লিখতে—

৫ই শ্রাবণ।

আজ সকালে মেয়েটী চলে গেল! বাড়ী থেকে রাস্তায় এনে নামিয়ে ছিল। জান্‌লা দিয়ে বিছানা থেকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। বেশ সুন্দর দেখ্‌তে, বছর কুড়ি বয়েস। সিঁদুরে আর আল্‌তায় তাকে লাল করে দিয়েছিল! ফুল দিয়ে বেশ সাজিয়ে ছিল, মনে হচ্ছিল—ঘুমিয়ে আছে। আহা কি পুণ্যবতী ও! চলে গেল। ওর মায়ের এ কান্না যে আর সহ্য হয় না। ছোট্ট ছেলেটা যে বড় কাঁদছে! কে থামাবে তাকে? সে হতভাগা ত জানে না তার মা তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল।—যাক্ সব শেষ হয়ে গেল। আমার হাতটা বড় কাঁপছে—বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। . . .

---

* * *

বিশ্বাস 'করা' যত সহজ, বিশ্বাস 'রক্ষা' করা তত নয়, কারণ প্রথমটিতে আছে 'স্বার্থ', দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে 'স্বার্থ ত্যাগ'।

যাত্রা-পথে

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী

তখনও বেশ একটু রৌদ্র তরুশিরে গৃহপ্রাচীরে বিচিত্র সোনালী রং প্রতিফলিত করিয়া হাসিতেছিল, শীতের স্নিগ্ধ সমীর দিবাশেষে মন্দ মন্দ ভাবে বহিয়া যাইতেছিল, দাঁড়ের উপর কাকাতুয়াটা একান্ত তদ্‌গত চিত্তে তার সাধা বুলি বলিতেছিল "হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

অপরাহ্নের এই শান্ত উদাস মূর্ত্তিটীর দিকে মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অরুণের অন্তরটা কি যেন এক অজানা বেদনায় ভরিয়া উঠিল, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা নভেল লইয়া মনটাকে অন্য পথে ফেলিবার চেষ্টায় পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে তাহার বৌদিদি আসিয়া যখন তাহাকে প্রশ্ন করিল "এখনও শুয়ে আছ যে?"

তখন অরুণ হাতের বইখান নামাইয়া শান্তমুখে একটু করুণ হাসির রেখা টানিয়া বলিল "না বৌদিদি, ঠিক শুয়ে নেই, বই পড়্‌ছিলাম"।

"বই পড়্‌ছিলে! কেন পরীক্ষা ত শেষ হয়েছে"। বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৌদিদি তাহার মুখের দিকে চাহিল। অরুণ বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে বসিতে উত্তর দিল "দুনিয়ায় কি আর পড়ার বই ছাড়া আমাদের আর কিছু পড়্‌তে নেই বৌদিদি"?

বৌদিদি ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলিল "না—তা নয়, নভেল পড়্‌ছিলে বুঝি? কিন্তু কি জান ভাই, ঐ নভেল গুলো তোমাদের যত ভাল লাগে, আমাদের আর তত ভাল লাগে না"।

অরুণ সকৌতুকে প্রশ্ন করিল "কেন নভেলের অপরাধ? তোমার ত চাল্‌সে ধর্‌তে এখনো অনেক দেরী বৌদিদি এর মধ্যেই ভাল লাগে না"?

বৌদিদি পূর্ব্বের মতই বলিল "মানুষ যতদিন সংসারে প্রবেশ না করে ততদিন নভেলের ভিতরকার সাংসারিক চিত্রগুলি তার চোখের নিকটে বড়

প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়, তারপর যখন নিজে সে সংসারী হয়, তখন লক্ষ্য করে, তার নিজের জীবনের প্রত্যেক দিবসের ভিতরেই একটা একটা নভেল সৃষ্টি হয়ে পড়েছে, তখন আর নভেলের ভিতরকার বিরহ-মিলন মান-অভিমান এগুলো তার পক্ষে বেশী বলে মনে হয় না—কাজেই রুচি আসে না"।

অরুণ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একটুখানি নীরব রহিয়া পরে বলিল "কথাগুলো বড় মন্দ বলনি বৌদিদি"।

২

সেদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা যখন সহসা বন্ধ হইবার মত কোন উপক্রমই দেখা গেল না তখন বাধ্য হইয়া পাষাণী তার শিশু পুত্রটীকে ঝিয়ের কোলে ছাড়িয়া দিয়া রন্ধনের উদ্যোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা উষাকে বলিয়া গেল "খবরদার জলে নেমো না, তা হলে এসে পিটিয়ে দেবো"। মধ্যম পুত্রটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "বইটী হাতে করে পড়্‌তে বসো মাণিক"।

পুনরায় ঝিয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "খোকার গায়ে যেন ঠাণ্ডা না লাগে দেখিস"।

তারপর নিজের গায়ে একখানা মোটা কাপড় জড়াইয়া সে কোন মতে রান্না ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠিল।

একটু আগেই ঝি উনানটা ধরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উনানের উপর ডালের কড়াটী চাপাইয়া দিয়া এইবার পাষাণী তরকারীর ঝুড়িটী পাড়িয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল, সেদিনের রন্ধনের উপযোগী কোন কোন তরকারী ঝুড়িটীর ভিতর হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

পিছন হইতে ডাক আসিল "বৌদিদি"। বৌদিদি মুখ ফিরাইয়া দেখিল অরুণ একটা ছাতা মাথায় দিয়া উঠান পার হইতেছে। বৌদিদি স্নেহের অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিল "একি এত জলে! বেশ তো ঘরটীতে বসেছিলে ভাই"!

"ছিলাম বৌদিদি,—কিন্তু একা একা যে ভাল লাগলো না, তাই মনে হল দেখি গিয়ে বৌদিদি আজকের দিনে কি খাবার যোগাড়টা কর্‌ছে" বলিতে বলিতে অরুণ বারান্দায় উঠিয়া একখান পিঁড়ি টানিয়া লইয়া পাষাণীর অনতিদূরে বসিয়া পড়িল।

পাষাণী আর কোন উত্তর দিল না, অরুণের উদাস করুণ কণ্ঠস্বর কেবল

তার সমস্ত অন্তরের ভিতর একটা ব্যথা জাগাইয়া তুলিল, সে হাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

অরুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "কি দেখ্‌ছো বৌদিদি"।

"না কিছু নয়" সংক্ষেপে উত্তরটা দিয়া পাষাণী আবার তরকারীর ঝুড়িতে হাত দিল।

সেই সময়ে ব্যস্ত ভাবে উদয় আসিয়া রান্না ঘরের বারান্দায় পা দিয়া অরুণকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল, "রান্নাঘরে যে, এখানে তোমার কি কাজ আছে?"

কথাটার ভিতরে যে একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তি রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে অরুণের বেশী বিলম্ব হইল না, তথাপি সে সংযত ভাবেই বলিল "একলা বসে থাকৃতে সব সময়ে ভাল লাগে না দাদা, তাই বৌদিদির রান্না দেখ্‌তে এসেছিলাম"।

উদয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিল "হুঁ" তারপর বলিল "যাও দেখি আমার ত সময় নেই—সেই চিঠিখানার জবাবটা তুমি লেখগে দেখি, আফসে যাবার সময় যেন পাই"।

অরুণ কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া পড়িল। সে যখন অনেকখানি রাস্তা পার হইয়া গেল,—তখন উদয় পাষাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "পাষাণী, দেখ তুমি বড় ভাল কর্‌ছো না, ওকে বড় বেশী রকম আস্কারা দিয়ে বাড়িয়ে তুল্‌ছো, ও আমার কে বলতো, দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই, তার জন্যে তোমার যেন মাথা ব্যথাটা কিছু বেশীই দেখি"।

কঠিন প্রস্তর মূর্ত্তির মতই হাতের বঁটি ফেলিয়া পাষাণী আরক্তমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। উদয় তাহা দেখিয়া সহসা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

৩

সংসারের ভিতর যে একটা গুপ্ত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে দিন কয়েকের ভিতরেই অরুণ তাহা লক্ষ্য করিল, ব্যাপারটা কিছু কিছু যে অনুমান না করিল এমন নয়; সুতরাং আর যে তার এখানে থাকা শ্রেয়ঃ নয় তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। তার ভগ্ন ব্যথিত অন্তর লইয়া পিতৃমাতৃহীন আশ্রয়চ্যুত হইয়াই সে, এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থের অভাব তার না থাকিলেও পৃথিবীতে স্নেহ করিবার মত আত্মীয় তার একটীও ছিল না! সেইজন্যই দাদা আর বৌদিদি বলিয়াই এখানে আসিতে সাহস করিয়াছিল। তারপর বৌদিদির স্নেহে

তার রিক্তবুকের অনেকখানি বুঝি তৃপ্ত হইয়াছিল কিন্তু তার এ সৌভাগ্য সহ্য হইল না; আর ত সে এখানে থাকিতে পারে না! উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া শুষ্ক ভাবে অরুণ বসিয়া রহিল।

এমন সময় তাহার বৌদিদি আসিয়া বলিল "রাত যে দশটা বেজে গিয়েছে, কি ভাব্‌ছো এমন করে—আজ কি ভাত খেতে হবে না?"

বৌদিদির এই স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরে অরুণের সমস্ত অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অন্তর হইতে একটা অশ্রান্ত রোদন যেন কণ্ঠ পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিল, কোন মতে নিজেকে শামলাইয়া লইয়া গাঢ়ভাবে অরুণ উত্তর দিল "ভাত? তা যে খেতেই হবে বৌদি—তা যে না খেলে চল্‌বেই না—চল, খাব বই কি"।

পাষাণী এ কয়দিন যথাসম্ভব সাংসারিক ব্যাপারগুলোকে চাপা দিবার চেষ্টাই করিয়া আসতেছিল, কিন্তু আজ যখন বুঝিল স্থিরবুদ্ধি অরুণের নিকট কিছুই অপ্রকাশ নাই, তখন নিজের মনে যেন একটা গভীর বেদনা ও লজ্জা আসিল, স্বামীর উপরে একটা মর্ম্মান্তিক অভিমান জাগিয়া উঠিল—যদি এমন ব্যবহারই করিবেন, তবে কেনই বা ইহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন? সে কোন উত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া অরুণের মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাকিল "এস ভাত খাবে।"

অরুণও আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যতক্ষণ খাওয়ার ব্যাপার চলিতেছিল ততক্ষণ কেহই কোন কথা কহে নাই। খাওয়া এবং আচমন শেষ হইলে অরুণ শান্তভাবে বলিল "বৌদি, আমি বারটার ট্রেণে বাড়ী যাচ্ছি।"

"কার কাছে যাবে!" কথা কয়টা বলিতে গিয়া বৌদিদির গলাটাও যেন ধরিয়া আসিল। বলিল "যে আমাকে এমন অসহায় নিঃস্ব ক'রে পাঠিয়েছে সেই থাকবে, আর থাকবে বৌদিদির স্নেহভরা আশীর্ব্বাদ।"

বৌদিদির উভয় চোখ জলে ভরিয়া উঠিল! অরুণ ধীরে ধীরে বৌদিদির পায়ের ধূলি লইয়া, একটা বেদনাচাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

৪

"তুমি! তুমি তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছিলে বৌদিদি!"

"হাঁ অরুণ!"

"তাই ত এযে প্লেগ! ছেড়ে দিতে ত পার্লাম না, এস আমার সঙ্গে!"

"কোথায় যাব"? বলিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পাষাণী অরুণের মুখের দিকে চাহিল।

অরুণ ব্যথিত ভাবে বলিল "বৌদিদি, তোমার অরুণ কি আজ এত পর হয়ে গিয়েছে, সে কি তোমার জন্যে যা তা ব্যবস্থাই কর্বে?"

পাষাণী আর কোন উত্তর দিল না, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য আপনার জ্বর-তপ্ত উভয় হাতে অরুণের মাথাটা চাপিয়া ধরিল। এই আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকার ভিতর হইতেও আজ অরুণের মাথায় বৌদির কতখানি স্নেহ ঝরিয়া পড়িল, তাহা আত্মবিস্মৃতের মতই সে অন্তর দিয়া অনুভব করিল।

অরুণ বৌদিদিকে সঙ্গে করিয়া অনিয়া এক প্রশস্ত ঘরের ভিতর বিছানার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিল "শুয়ে পড় বৌদি।" পাষাণী আর দাঁড়াইতেও পারিতেছিল না, বাধ্য হইয়াই যেন শুইয়া পড়িল। অরুণ কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল, পরে উঠিয়া গিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া আবার আসিয়া বিছানার পাশেই বসিল।

পাষাণীর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। অরুণের পায়ের শব্দে সহসা সে চোখ মেলিয়া বলিল "ওকি, এখানে বসে আছ। না এখানে বসো না, রোগ ভাল নয়।"

অরুণ স্নিগ্ধভাবে উত্তর দিল "ভাগ্যের উপর হাত নেই বৌদি! তোমার কাছ হ'তে আজ দশ বছর চলে এসেছি, আর আট বছর এই কাজ কর্ছি,—জীবনটায় যে বিশেষ কোন দরকার আছে তা কোন দিন ভাবিনি।"

পাষাণী ব্যস্তভাবে বলিল "না না, তুমি যে সংসারী, সাবধান হ'তে হবে বৈকি।"

অরুণ উদাস ভাবে একটু হাসিয়া বলিল "সংসারে থাকলেই সংসারী হ'তে হয় বৌদি! তার আর বিশেষত্ব কি? তাই বলে নিজেকে আঁকৃড়ে ধরে থাক্‌লেই যে অমর হবো তাতো নয়।"

এমনি ভাবেই সমস্ত দিন কাটিল, কিন্তু অপরাহ্ণে পাষাণীর অবস্থা যখন খারাপ হইতে লাগিল, এত চেষ্টাতেও অরুণ যখন তাহাকে ভালোর পথে ফিরাইতে পারিল না, তখন তার বুকটা'ও যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে একবার রাত্রিরের দিকে চাহিয়া আর একবার বৌদিদির দিকে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল "ছেলেদের খবর দেবো বৌদি?"

আরক্ত চক্ষু অরুণের মুখের উপর তুলিয়া পাষাণী বলিল "কিছু না, তাদের

ব্যস্ত ক'রে লাভ কি! তিনি গিয়েছেন আমিও যাচ্ছি। কেবল তোমার মুখখানা দেখ্‌বার জন্ত মনটা বড় ব্যাকুল থাকতো তাই যাবার সময়ে যাত্রা-পথে ভগবান আমার সেই আশা পূর্ণ করলেন—এই রকম ভাবে——"

সহসা বাকশক্তি হ্রাস হইয়া আসিল, তারপর একটু বিশ্রাম লইয়া পাষাণী আবার ডাকিল "অরুণ—"

অরুণ আরো নিকটে আসিল পাষাণী ধীরে ধীরে তার মাথার উপর হাত দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

অরুণ বুঝিল, সব শেষ! সে কিছুক্ষণ কাল বৈশাখীর ঝড়-ভরা অন্তরে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিজেকে সংযত করিয়া যথারীতি বৌদিদির শেষ কাজ করিয়া যখন বাড়ীর পথে ফিরিল, তখন তার অন্তরাত্মা গভীর ভাবে অনুভব করিল 'জীবনের পথে আজ তার যে জিনিষ হারাইয়া গেল, সমস্ত পৃথিবী সন্ধান করিলেও এত বড় নিষ্কাম স্বার্থহীন স্নেহ আর সে কোথাও পাইবে না,—এতদূরে রহিয়াও যে স্নেহ সে প্রতিনিমেষে অনুভব করিয়াছে, আজ তাহা চিরদিনের জন্ত লুপ্ত হইয়া গেল।"

শিথিল কাতরভাবে সে বাড়ীর বারান্দার উপর উঠিয়া স্বর্গগতার উদ্দেশ্যে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া ধূলির উপরেই বসিয়া পড়িল,—একটা নিভৃত বেদনায় তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

---

* * *

যেচে 'মান' আর কেঁদে 'সোহাগ' যত সহজে পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশী সহজে ওদের হারানো যায়।

"পণ্ডিত"।

ছবি

—শ্রীইন্দুলেখা দেবী

বড় আনন্দে সে একদিন তাকে মৃদুস্বরে বল্লে "ছবি, প্রতিদিন যতই আমি তোমাকে দেখ্‌ছি ততই বুঝ্‌তে পার্‌ছি তুমি আমাকে বড় ভালবাস।"

সে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর কর্‌লে "সত্যি জীবন, তোমার মত আমি আর কাউকেই এত ভালবাসি না।"—

জীবন একজন নবীন চিত্রকর আর ছবি গ্রাম্য কুমারী মেয়ে। জীবন ছবির কাছ থেকে আশানুরূপ উত্তরটি পেয়ে আনন্দে তার সুকোমল কম্পিত ওষ্ঠে ধীরে ধীরে একটি চুমো দিল। তারপরে সুন্দর এক নিভৃত সন্ধ্যায় দুইজনে পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হয়ে আশৈশব পালিত পিতার স্নেহপূর্ণ গৃহখানি ছেড়ে তারা নূতন পথের যত্রী হল। যাত্রার দিনে জীবন বল্‌লে "ছবি, আমাদের এই শুভদিনে, শুভ মিলনে তোমাকে আমার কোনও উপহারই তো দেবার শক্তি নেই, আমি তোমাকে কি দেব ছবি? তোমার উপহারের উপযোগী হৃদয়পূর্ণ ভালবাসাই আমার একমাত্র সম্বল। আমি তোমাকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি ছবি। এ ভালবাসাই দিন দিন আমাদের দরিদ্রের কুটীরখানি আনন্দে পবিত্রতায় পূর্ণ ক'রে তুল্‌বে।"—

তারপরে কত বাগান, কত কুটীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড় বড় দুর্গ, প্রাসাদ তারা দেখ্‌তে পেল। চারিদিককার বন-কাননে বিহঙ্গ কুলের কল-কাকলী সমস্ত গ্রামটাকে যেন একটা বিশাল মায়াপুরীর মতই মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে।

হঠাৎ গভীর চিন্তা থেকে সচকিত হয়ে জীবন বল্‌লে "ছবি, চল আমরা এই সুন্দর বাড়ীগুলো ঘুরেফিরে দেখে আসি।" তাদের নিজেদের কুটীরে যাবার পথে যা কিছু সুন্দর সুন্দর বস্তু ছিল, সবই দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও প্রেমের রঙে রঙীন করে নিজেদের প্রাণের গভীর গোপন কথা বল্‌তে বল্‌তে দুজনে ক্রমে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো। নানা রকম গাছের বিচিত্র ছায়ায় বাগানগুলি কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। কত বৃহৎ বাড়ী, কতজন

নিজেদের ভোগের জন্য কত মনোহর আস্‌বাব পত্রে সাজিয়ে রেখেছে। যা কিছু জীবন দেখ্‌তে ভালবাসে সবই ছবিকে দেখালে। ছবি আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে তার ছোট্ট কুটীরখানির চিত্রই অনবরত চিত্রিত করে চলেছিল। ভাবছিল সেই কুটীরে তারা দুজনে একসঙ্গে কত আনন্দে নিরালা দিনগুলি অতিবাহিত করবে। সে তাকে বাস্তবিকই প্রাণদিয়ে ভালবাস্‌বে তার জীবনের জন্য তার দারিদ্রের কুটীরখানি কত প্রেমে কত আনন্দেই সে পূর্ণ করে তুল্‌বে, কেমন সুন্দর করে সে তার দারিদ্রের উপকরণ দিয়ে কুটীরখানি সাজিয়ে রাখ্‌বে!

কত আনন্দে এসব ভাব্‌তে ভাব্‌তে তারা বিশাল এক প্রাসাদের কাছে এসে উপস্থিত হল। সৌন্দর্য্যে এটা সকল প্রসাদকেই হার মানিয়েছে। দ্বারদেশে ভৃত্যগণ বিনীত বিনম্র শিরে প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য দণ্ডায়মান। জীবন দ্রুত পদক্ষেপে সমস্ত বাড়ী ঘু'রে ঘু'রে দেখ্‌তে লাগলো। হঠাৎ গর্ব্বিতভাবে জীবন ছবির দিকে ফিরে বল্‌লে—"ছবি, এ সবই যে তোমার।" সে এ রাজ্যের রাজা—সমস্ত দেশে যে তার মত বড়লোক আর কেউ নেই, আরো কত কি! মুহূর্ত্তেই ছবির মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আনন্দের পূণ্য জ্যোতিঃ অপহৃত হ'য়ে মৃত্যুর ছায়া যেন তার মুখখানি অধিকার ক'রে বস্‌লো। জীবন তাকে বড় আদরে জড়িয়ে ধর্‌লে। প্রাণের গভীর ভালবাসা দিয়ে আবার ছবির হৃদয়-পাত্র আনন্দ-সুধায় ভ'রে তুল্‌লে। ছবি তার মনের এই দুর্ব্বলতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ক্ষণে ক্ষণে তার প্রাণটি মর্ম্মান্তিক বেদনার ভারে নুয়ে পড়্‌তো। নারীর স্বভাব সুলভ সহিষ্ণুতায় তার হৃদয়টিকে সে তার পদ গৌরবের উপযোগী সকল কাজের জন্য প্রস্তুত করলে। তার প্রাণটি এমনই সুন্দর, এমনই মধুর যে কেউই তাকে ভাল না বেসে থাকতে পার্‌তো না। কিন্তু যে সম্ভ্রম যে সম্মানের ভিতর সে জন্ম গ্রহণ করেনি, যে গৌরব, যে আসন তার আজন্মলব্ধ নয় আজ আশার অতীত তা পেয়ে তার গুরুভার সে কিছুতেই যে সইতে পার্‌ছে না! রাত্রিদিন তার অশান্ত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার বোঝা তার জীবনকে অচল ক'রে তুল্‌ছে, সে বেদনার পাষাণ ভার দিনের পর দিন তার দেহকে শক্তিহীন করে তুল্‌ছে! প্রতিক্ষণেই আপন মনে সে বলে "আর একবার যদি জীবন আগের দিনের সামান্য একজন চিত্রকরের মত আমার পাশে এসে দাঁড়াতো ঠিক তেমনি ভাবে!

যে সামান্য চিত্রকরের বেশে এসে সে আমার হৃদয়টী চুরী করে নিয়ে গেছে, আজ একটিবার যদি তাকে সে ভাবে ধর্‌তে পাল্‌তাম!"

তার জীবন-সর্ব্বস্ব এত আদরের জীবনের পাশে থেকেও দিনের পর দিন সে ফুলের মতই শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। তারপর প্রিয়তম জীবনের জন্য তার নিদর্শণ স্বরূপ ফুলের মত তিনটী শিশু রেখে অকালেই সংসারের খেলা সব চুকিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিলে।

প্রথম মিলন-সন্ধ্যায় সে তার দরিদ্রের কুটীরখানি যে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্য মহিমায় মণ্ডিত ক'রে রঙের উপর রঙ দিয়ে আপনার প্রাণের মাঝখানটীতে নিপুন চিত্রকরের মত চিত্রিত ক'রে তুলেছিল সে চিত্রলেখা একটির পর একটি প্রতিদিন মুছ্‌তে মুছ্‌তে আজ যখন তার শেষ রেখাটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হল তখন সে আর সংসারে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে?

সে তো একা তার স্বামীর নয়। আজ তার অভাবে জীবনের গভীর দুঃখের সঙ্গে দুঃখ মিলিয়ে তার চোখের জলের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে দেশশুদ্ধ লোক কেঁদে উঠ্‌ল।

জীবন কত সোহাগে, কত যত্নে প্রথম মিলন-দিনের রঙীন শাড়ীটি পরিয়ে নানা আভরণে ছবিকে সাজিয়ে দিলে। তারপরে ধীরে ধীরে তার সুকোমল হাতটি তার নিজের হাতের ভিতর নিয়ে ছবির স্থির শীতল ওষ্ঠে বিদায়ের শেষ চুম্বন দিল।

সুখের দিনে, মিলনের দিনে সে তাকে যে বেশে বরণ করে নিয়েছিল আজ দুঃখের দিনে, বিদায়ের দিনে তাকে সে, সেই বেশেই বিদায় দিলে!

———

তৃষ্ণা কখনও মেটে না, ও শুধু বেড়েই চলে।

———

• টেনিসন্ হইতে

সরাইখানা

একদিন মধ্যাহ্নে দুইটী বড় বড় কুকুর সঙ্গে করিয়া একজন যুবক সরাইখানার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পায়ে ভ্রমণের চিহ্ন, ললাটে আকাঙ্ক্ষার রেখা, তাহার চক্ষুদুইটী উৎসুক, আগ্রহে পরিপূর্ণ।

যুবক পান্থনিবাসে কুকুর দুইটিকে লইয়া প্রবেশ করিতে চাহিল। দরজার কাছে প্রকাণ্ড পাগড়ী পরিয়া একটি খর্ব্বকায় মানুষ দরওয়ানী করিতেছিল। সে ঘুমাইতেছিল, যুবক, সদর পার হইতেই পায়ের শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে দ্রুতপদে যুবকের পিছনে ছুটিল। যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইতে দরওয়ান হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া জানাইল, কুকুর লইয়া এখানে প্রবেশ করা চলিবে না। যুবকটী তাহার কথায় একটু বিস্মিত হইল। তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এ কুকুর দুইটি তাহার নিজের পোষা কুকুর, কাহারও কিছু অনিষ্ট করিবে না। দরওয়ান যুবকের কোনও কথাই বুঝিল না, তাহার একটি কথারও উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর যুবক বুঝিল, লোকটি কানেও শোনে না, কথাও বলিতে পারে না। তাহাকে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মনে করিয়া কুকুর দুইটিকে লইয়া যুবক বাহিরে আসিল।

পথে নামিতেই একটি নবাগত আগন্তুকের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। লোকটি পান্থনিবাসের দরজার কাছেই আসিল। সেও যুবকের দিকে একবার তাকাইল। যুবক তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি এইখানেই থাকেন?

লোকটি পুনরায় যুবকের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া হাসিয়া উত্তর করিল,—কেন? তুমি কি সরাইতে থাকতে চাও?

যুবক তাহার কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হইল। তাহাকে বলিল—থাকতে ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যে আমার কুকুর দুটিকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে দেবে না। 'জোকার' আর 'কমরেড্' আমার বন্ধু, এরা ত কুকুর নয়!

আগন্তুকের সর্ব্বাঙ্গ একখানি কাল কাপড়ে ঢাকা ছিল। মাথায়ও কাল

কাপড়ের আচ্ছাদন; আর তার ভিতর দিয়া তার রক্তাভ গৌরবর্ণ মুখখানি অল্পমাত্র দেখা যাইতেছিল। যুবকের কথায় লোকটি হাসিয়া উঠিল। যুবক তাহাতে একটু বিরক্তি বোধ করিল। আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিল। যুবককে ডাকিয়া একপাশে লইয়া গিয়া বলিল,—কুকুর ছটো তোমার বন্ধু, তুমি ওদের জান, অন্য লোক তা বিশ্বাস করবে কেন? সে যাক্, সত্যিই যদি এখানে থাকতে চাও, রাত্রিতে এস, তখন এখানে আর কারুর হুঁস্ থাকে না। তারপর একবার ঢুকতে পারলে, আর কোনও ভাবনা থাকবে না। বুঝলে? রাত্রে এস, আমি এখানেই থাকি।

আগন্তুকের কথা শেষ হইতেই উপরের জানালা হইতে একটি রমণী মুখ বাড়াইল। রমণীর মুখে হাসি, চোখ দুটি অশ্রু ছল্ ছল্। কপালের উপর হইতে মাথাটি পর্য্যন্ত একখানি বাসন্তী রঙ্গের কাপড়ে আচ্ছাদিত। রমণী আগন্তুকের দিকে তাকাইয়া বলিল, ওটি কে তোমার সঙ্গে ভাই? কুকুর দুটি ত খুব তেজী দেখতে!

আগন্তুক যুবার দিকে চাহিয়া বলিল—ঐ দেখ মমতা তোমার কুকুরের প্রশংসা করছে! মমতা আমার বোন্। সরাইতে দিবারাত্রি লোক আসে যায়। পাগল বোনটি আমার তাদের রোগে সেবা করে, তাদের দুঃখে কাছে বসে থাকে, তারা যখন মাতাল হ'য়ে নিরুপায় হ'য়ে পড়ে, মমতা তাদের সুস্থ ক'রে তোলে। তবু এই মানুষগুলি ভাল হ'য়েই আবার মমতাকে দুঃখ দেয়, তাকে অপমান করে! আশ্চর্য্য!—না!

আগন্তুকের কথায় যুবক যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাহার মুখে কথা ফুটিল না। চোখ দুটি নিস্পন্দ হইয়া আগন্তুকের মুখের উপর পড়িয়া রহিল।

যুবকের এ ভাব দেখিয়া আগন্তুক একটু হাসিল। তাহার কাঁধে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—কি ভাবছ? মানুষের কথা? তোমার নিজের কথা, সরাইয়ের কথা, না মমতার কথা? কোন্‌টা? ভাব, ভাব, সারা জীবন ভেবেই মর। যাক্, এটুকু সময় বেড়িয়ে কাটিয়ে দাও, রাত্রে এসে, সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে। বুঝলে?

লোকটি আর একটুও দাঁড়াইল না। যতক্ষণ দেখা গেল যুবক তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার মনে পড়িল ঐ সরাইখানাতে তাহার দিনের আলোতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়!

জোরার ও কমরেড্‌কে লইয়া রাস্তায় আসিল। ভাবিতে লাগিল,—

মানুষ? মনুষ্যত্ব? সে কি? মানুষ মাত্রেরই ত মনুষ্যত্ব থাকবে! আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোন্‌টা? যৌবনের এই উৎসুক কৌতুহল না সারা জীবনের এই পাগলামীটা! পাগ্‌লামী? তার ভিতরে কি কিছু সত্য আছে? শিব আছে, সুন্দর আছে? ভাবিতে ভাবিতে সে একেবারে উন্মনা হইয়া গেল। মাতালের মত টলিতে লাগিল। চলার শক্তিও যেন কমিয়া আসিয়াছে। তাহার এ ভাব দেখিয়া জোকার তাহার গা ঘেঁসিয়া ধাকা দিতে লাগিল। কমরেড্ লাফাইতে লাফাইতে তাহার হাত চাটিতে লাগিল। তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে কুকুর দুটিকে আদর করিয়া একটু লজ্জিতস্বরে বলিল—কি? আমি কি খুব দমে গিয়েছি; মাঝে মাঝে নিজেকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না, তাই না?

জোকার ও কমরেড্ মুখ তুলিয়া ভক্ত শ্রোতার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সে বলিতে লাগিল, জন্মেছিলাম ত মানুষেরই মত। যতদূর মনে পড়ে কিছুরই অভাব ছিল না। তুমি ত জান জোকার, বাবা বেঁচে থাকৃতেই ত তুমি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলে। শৈশবটা একটু একটু মনে আছে। তারপর আর কিছু মনে নাই। ছাড়া ছাড়া, খাপ্‌ছাড়া কতগুলি ঘটনা, দু একটা কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তারপর হঠাৎ যেন দেখ্‌লাম, আমি প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি! কোথা থেকে এসেছি তার খোঁজ পাই না, কোথায় যেতে চাই তার সীমা পাই না। কমরেড্ তোমাকে পেলাম সেই রণক্ষেত্রের হাহাকারের মধ্যে। তারপর? কেন, কেন এমন হবে? আমি হ'তে দেব না এমন। একলা পার্‌ব না? যদি না পারি, এই নিরর্থক জীবন নিয়ে আমি কোথায় যাব? পার্‌ব না ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, যা অঙ্কুরন্ত হ'য়ে আমার বুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে?—

কুকুর দুটিকে লইয়া সে পথের ধারে একটা বাগানে গাছের নীচে বেঞ্চে গিয়া বসিল। জোকার ও কমরেড্ লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নরনারীর সমাগমে বাগান ভরিয়া উঠিল। শিশুরা একটু খেল্‌তে আরম্ভ করিয়াছিল, একজন বৃদ্ধ আসিয়া তাহাদের ধমক দিয়া বলিল,—তোমরা অত ছুটাছুটী করো না, পড়ে যাবে। বাধা পাইয়া শিশুরা নিরস্ত হইল। ক্ষণেকের ভয়ের ছায়া তাহাদের মুখে মিলাইয়া গেল। তাহারা ঘাসের উপর বসিয়া আবার গল্প জুড়িয়া দিল। গল্প শুনিয়া তাহারা মাঝে

মাঝে হাসিয়া উঠিতে লাগিল। এক বাড়ীর একজন ঝি তাহাদের ছোট মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল—অত জোরে চেঁচিয়ে হাসি কি? মেয়েগুলো ত আচ্ছা বেহায়া! ছেলেদের সঙ্গে বসে গল্প কি? নিজেরা একধারে বসে কথা বল্‌তে পারে না?

কথাগুলি যুবকের ভাল লাগিল না। সে বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। কিছু দূর যাইতেই দেখিল, একজন লোক হাত নাড়িয়া ভীষণ বক্তৃতা করিতেছে। লোকেরা ভীড় করিয়া তাহার চারি পাশে দাঁড়াইয়াছে। লোকটি বলিতেছে—এ জীবন মায়ামাত্র। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। পরপারের চিন্তা কর। পরজন্মের জন্য পুণ্য সঞ্চয় কর . . .

যুবক তাহাদের ছাড়িয়া আরেক দলের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। সেখানেও একজন অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—তোমরা যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছ তাতে পরিত্রাণ নাই। আমার ধর্ম্মে মানুষের সকল অশান্তি দূর হইয়া যায়, স্বয়ং দেবতা আসিয়া পাপক্লিষ্ট মানুষকে কোলে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া যান।

যুবকের কৌতুহল বাড়িয়া চলিল। সে যতই বাগানে ঘুরিতে লাগিল, ততই আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। মানুষ নানা আয়োজন করিয়া ভীড় জমাইতেছে, আর মানুষকেই তাহার পরিত্রাণের তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মের পথ বলিয়া দিতেছে। দেশ, জাতি, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভীকভাবে বলিয়া যাইতেছে, আর জনতা তাহাই অলসভাবে দাঁড়াইয়া সে সকল শুনিতেছে।

অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিল। যুবক সরাইয়ের দিকে অগ্রসর হইল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা সহস্র আলোর রশ্মিতে সোনার বাড়ীর মত দেখাইতেছে। দরজার কাছে, গাড়ী, জুড়ী, পাল্কী, মোটর ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরাইয়ে লোক আসিতেছে, যাইতেছে। বাহির হইতে গান, হাসি, কথা ও কোলাহল মিশ্রিত একটা বীভৎস চীৎকার শুনা যাইতেছে।

যুবক দেখিল, দরওয়ান এখন ভয়ানক ব্যস্ত। এখন আর তাহার সে গম্ভীর মূর্ত্তি নাই। বড়লোক দেখিয়া তাহাদের গাড়ী চড়াইয়া দিতেছে, ধনী আগন্তুক দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। তাহার হাতের থলিটা টাকা সিকিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

অবসর বুঝিয়া যুবক কুকুর দুইটাকে লইয়া খুব গম্ভীর ভাবে ঢুকিয়া পড়িল। দরওয়ান তাহাকে দেখিয়া আ-ভূমি নমস্কার করিল। যুবকের বড়

হাসি পাইল। সে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

সরাইয়ে প্রবেশ করিবার গলি পথের দুই ধারে বড় বড় ঘর। ঘরে ঘরে হট্টগোল। অযুত আলোকরশ্মিতে ঘর ও বাহির যেন আলোক সাগরে ভাসিতেছে! কোনও ঘরে লোকে বসিয়া খেলিতেছে, কোনও ঘরে গল্প চলিতেছে, কোনও ঘরে আলোচনা, কোনও ঘরে মদমত্ত মানুষ আহারে বসিয়াছে, কোনও ঘরে বা সুরা, কলহ ও বিরূপ সঙ্গীতে একটা অশ্রাব্য বেসুর গর্জ্জন করিতেছে। এই লোকের ভীড়ে সে অনেককেই চিনিল। কিছু পূর্ব্বে তাহাদেরই অনেককে সেই বাগানে শ্রোতা বা বক্তারূপে দেখিয়া আসিয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া তাহার দেহ মন জ্বলিয়া উঠিল। সে বারান্দার পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইতেই একেবারে একটা অন্ধকার ঘরের কাছে আসিয়া পড়িল। একটু দাঁড়াইতেই একজন তাহাকে হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। ঘর অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকারটা জুড়িয়া ফুলের তীব্র গন্ধ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ সে নিস্তব্ধতার মধ্যে সাপের মুখের শাঁ শাঁ শব্দের মত শুনাইতেছিল! সেই অভেদ্য অন্ধকারের ভিতর তাহার কুকুর দুইটীর চক্ষুগুলি আকাশের গায়ে নিঃসঙ্গ তারার মত জ্বলিতেছিল।

নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল,—ও কিসের আলো, সরাও—সরাও . . . . .

যুবকের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। সে অনুভব করিল কতকগুলি মনুষ্য দেহ ঘরের কোণের দিকে সরিয়া যাইতেছে। সে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, —তোমরা কে? এ ঘরে আলো নাই কেন?

একজন আসিয়া যুবকের হাত ধরিয়া বলিল,—আলো দিয়ে কি হবে? আলোতে তোমরা যে রূপ দেখে মুগ্ধ হও, অন্ধকারে তোমাদের সে রূপের তৃষ্ণা মিটে যায়। অন্ধকারের ভিতর অন্ধের মত তোমরা সে রূপ ভোগ কর। তারপর উপভোগের ভিতর দিয়ে শরীর মনের উপর যে অবসাদটুকু আসে তাতে তোমাদের আবার 'মানুষ' ক'রে তুলতে চায়। তাই তাকে তোমরা ছাড়িয়ে যেতে চাও। তোমরা আবার আলোর রাজ্যে ছুটে চল। সেই আলোতে তোমরা আমাদের ভুল দেখ, আমরাও তোমাদের ভুল দোখ। তাই আমাদের ভালর জন্যই আলো জ্বলে না এ ঘরে।

যুবক কথাগুলি শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর্ত্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল,—কে তোমরা? কে তোমরা এই অন্ধকারে নিজেদের হারাতে এসেছ?

একটা তরল হাসির তরঙ্গ অন্ধকারের গায়ে কুল্ কুল্ করিয়া উঠিল!

যুবক হাঁকিল,—বল কে তোমরা? তোমাদের কে আন্‌ল এখানে?

এবার অন্ধকারে অন্ধকারে যেন ধাক্কা লাগিল। সমস্ত নারীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, আর তারই আলোর ধারা বিদ্যুতের মত সর্প গ'ততে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। একজন বলিল,—শুনবে আমরা কে? যাদের তোমরা চাও, পাও না আমরা সবাই তারা। হয়ত এ অন্ধকারে তাকে পাবে, তুমি যাকে আলোতে চেয়েছি'ল, হয়ত সে না-ও হতে পারে। যে চাওয়ার জন্য আমরা তোমাদের চাই, যে চাওয়ার মোহে তোমরা আমাদের ঠেলে ফেল্‌তে পার না, সেই চাওয়ার শেষ নাই। তাই অন্ধকার করে রাখি. এখানে চাওয়া আর পাওয়াটাই চরম। তোমরা আমাদের জান না, আমরা তোমাদের জানি না, তাই ভাল না?—'

যুবক উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে নিয়ে এল এখানে তোমাদের?

নারী এবার হাসিয়া উঠিল। অন্ধকারের তরলতা ঠেলিয়া যুবকের হাত ধরিয়া তাহার অনাচ্ছাদিত বুকের উপর রাখিয়া বলিল—এখানে কে আছে জানি না, এইখান থেকে কেবল আর্ত্তনাদ ওঠে,—চল, চল . . . সমস্ত শরীর তখন পুলকে পঙ্গু হয়ে যায়। জড়ের মত জীবনের লক্ষণগুলি পৃথিবীর পথে ফেলে রেখে আসি। রাত্রির অন্ধকারকে আশ্রয় করে ছুটে আসি যাকে চাই তাকে পাবার জন্য। কিন্তু পাই কাকে তা আজও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

এই বলিয়া নারী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার মুখের উষ্ণশ্বাসে যুবকের মুখ যেন পুড়িয়া যাইতেছিল! যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—কমরেড্, জোকার—!'

শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই জোকার ও কমরেড্ অন্ধকারে লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত পরেই একটু ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শুনা গেল। তারপর সব নীরব, নিস্তব্ধ।

একটু স্থির হইয়াই যুবক ডাকিল,—জোকার!

জোকার ফিরিয়া আসিয়া যুবকের হাত চাটিতে লাগিল।

যুবক শিহরিয়া উঠিল। উষ্ণ সদ্য রক্তের বিন্দুতে হাত পড়িতেই অস্ফুটস্বরে বলিল—কি করেছিস্ জোকার? এ রক্ত নয় ত?

এমন সময় ঘরের দরজায় আলো দেখা দিল। যুবক ফিরিয়া দেখিল, মমতা আলো হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে!

যুবক দাঁড়াইয়া উঠিল। মমতা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঘরের সেই প্রান্তে চলিয়া গেল। আলোর শিখাটি তাহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ছায়াটি ফেলিয়া বাতাসে কাঁপিতেছিল।

সেই স্বল্পালোকে যুবক দেখিল, দুইটী রমণী মূর্চ্ছিত হইয়া একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের শরীরের কয়েকস্থানে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! আর অন্যস্থানে আরও কয়েকজন রমণী ভয়ে ত্রাসে মৃতপ্রায় অবস্থায় একে অপরের গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সকলেই বিবস্ত্রা। কেবলমাত্র দেহের লাবণ্য ও সৌষ্ঠবকে ঢাকিয়া কতগুল গহনা গায়ে রহিয়াছে। তাহারা সকলেই যুবতী নহে, রূপসী নহে। কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ অল্পবয়স্কা কেহ সুন্দরী, কেহ বা কুরূপা। তাহাদের সকলকে আড়াল করিয়া দুই পায়ের উপর ভর করিয়া কমরেড্ মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখে রোষের আগুন জ্বালা, মুখের উপর দুঃখ ও করুণার শীতলতা ঢালা . . .

আহতা নারীদের একজনকে কোলে তুলিয়া মমতা ডাকিয়া বলিল,—তোমার পিছনের কোণে জল আছে, একটু নিয়ে এস ত।

যুবক উঠিয়া জল লইয়া গেল। কমরেড্ তাহার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল। আর তাহার দুটী চক্ষু ভরিয়া একটী প্রশ্ন প্রতীক্ষা করিতেছিল,—কেন করলে এমন?

যুবক তাহার উত্তরে মিনতি করিয়া বলিল,—একলা জোকারের দোষ নাই। দোষ আমারও আছে। কিন্তু আমি আর এমন হব না। তুমি আর জোকার এখন একটু বাইরে গিয়ে বস।

কমরেড্ উঠিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইল বটে কিন্তু নড়িল না।

যুবক বলিল,—না কমরেড্, ওদের আর কেউ কিছু বল্‌বে না। তুমি জোকারকে নিয়ে বাইরে যাও, আমি এখনই যাচ্ছি।

মমতা আলো নিভাইয়া দিল।

যুবক বলিল, আলো!

মমতা বলিল, থাক্, এই ভাল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, খুব বেশী কি ঘা হয়েছে?

মমতা তেমনি সরল হাস্যে জড়িত করিয়া কথা বলিল, না বেশী কিছু না,

ওরা বোধ হয় ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন এমন কর্‌ল তোমার কুকুর ?

যুবক মার্জ্জনা চাহিয়া বলিল,—ওরা ত কুকুর নয়। আমারই মন প্রাণ, এ বন্ধুর জগতে এরা আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমিই এদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যুবক আর বলিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলিতে চেষ্টা করিল, সকল বেদনা, সমস্ত অনুভূতি তাহার চোখের জলে ভাসিয়া নামিল।

মমতা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—বুঝেছি তুমি সহ্য কর্‌তে পারনি ওদের এই ব্যবহার। কিন্তু যদি জান্‌তে ওদেরও কত দুঃখ।—তার পর কথা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতক্ষণ এসেছ ? তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

এতক্ষণে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে উত্তর করিল—আমি এসেছি অনেকক্ষণ। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এখানে এসে পড়েছিলাম। কিন্তু কি করে এখানে লোকেরা থাকে ? কি বীভৎস এই স্থান !

মমতা তাহাকে বলিল—তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আস্‌ছি।

যুবক বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। মমতা বাহিরে আসিয়া বলিল,—চল তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিই।

একটু দূর আসিতেই একটা থামের আড়াল হইতে কয়েকজন লোক আসিয়া যুবককে আক্রমণ করিল। মমতা ছুটিয়া চলিয়া গেল। লোকগুলি নিমেষের মধ্যে যুবকের মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। জোকার ততক্ষণে একজন লোকের পিঠের উপর কামড় বসাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কমরেড্ আরেকজনের হাতের কব্জিতে কামড়াইয়া ধরিল। গভীর অন্ধকার, তাহার মধ্যে এত লোকের গর্জ্জন ও পায়ের শব্দে বারান্দাটা যেন মড়্ মড়্ করিয়া উঠিল। মনে হইল এই মুহূর্ত্তে বুঝি সব ভাঙ্গিয়া পড়িবে !

তাহারা যুবককে টানিয়া আনিয়া একটী বড় ঘরে উপস্থিত করিল। পূর্ব্ব হইতেই সে ঘরে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই মুখ কাল কাপড়ে ঢাকা। কাহাকেও চিনিবার সাধ্য নাই। সকলের মাঝখানে একজন বসিয়া ছিলেন, তাঁহার স্থূলদেহ, চোখে লাল কাঁচের এক জোড়া চশ্‌মা, গলায় কণ্ঠির মালা, কিন্তু কপালে সিন্দুরের তিলক, হাতের কাছে একখানি অতি পুরাতন জীর্ণ শাস্ত্র গ্রন্থ।

যুবককে ঘরে আনিয়া তাহারা সকলে তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। জোকার ও কমরেডের চীৎকার শুনিয়া যুবক বাহিরে ছুটিয়া গেল। তার পরেই মরণাহতের আর্ত্তনাদ শুনা গেল। সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল, যুবক এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুই জন লোককে গলা টিপিয়া ধরিয়া প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চাপিয়া ধরিয়াছে। কুকুর দুটী আদেশের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে!

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহার দিকে অগ্রসর হইল না। কেহ কেহ আগেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া বসিল।

যুবক ঘরে গিয়া বলিল,—ভয় করো না, আমি আর কিছু কর্‌ব না। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই এত বড় একটা প্রকাণ্ড বাড়ী আলো ফুল দিয়ে সাজিয়ে এ তোমরা কি কর? আর দেখ্‌তে চাই কে সেই বর্ণশূন্য, বিকাশশূন্য, আশাহীন, স্বেচ্ছাচারী মানুষ যে এই মানুষগুলিকে এমন ক'রে ধ্বংস কর্‌বার জন্য সরাই সাজিয়ে বসেছে। . . .

কেহ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। কন্তির মালাটী একবার ঘুরাইয়া লইয়া সেই বিশিষ্ট মানুষটী একটু হাসিল। তাহা দেখিয়া কাহারও কাহারও যেন সাহস ফিরিয়া আসিল। দুই এক জন উঠিয়া গিয়া যুবকের বুকে আঙ্গুল দিয়া খোঁচা দিয়া হাসিয়া উঠিল।

জোকার ও কমরেড্ গোঁ গোঁ করিয়া উঠিল।

যুবক আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ঘরের প্রকাণ্ড ফরাসের এক পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল। কুকুর দুইটীও ফরাসে উঠিয়া বসিল।

এই সময়ে মমতা মধ্যাহ্নের সেই আগন্তুককে লইয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইল। আগন্তুকের হাতে একখানি শাণিত ছোরা, আলোকের মুখে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

যুবক তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এক জন আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিল,—কি সত্যবাদী, তুমি এমন সময় এখানে? সত্যবাদীর সমস্ত শরীর একবার নড়িয়া উঠিল। চোখের তারার উপর ছোরার গায়ের আলো শতধান হইয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মমতা সত্যবাদীর বুকের উপর একখানি হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সত্যবাদী হাসিল। মমতাও হাসিয়া মুখ নামাইল।

সত্যবাদী অগ্রসর হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই যুবকের অপরাধ কি? তোমরা একে এমন ক'রে গোপনে আক্রমণ করেছিলে কেন?

একজন বলিল—এর অপরাধ? অপরাধ, একে মেয়েদের সেই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখা গিয়েছে। আরও কিছু জান্‌তে চাও?

সত্যবাদী এবার মেঘের ডাকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল—ওকে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখেছ এই ওর অপরাধ? এই যদি ওর অপরাধ হয়, তা হ'লে তোমাদের কুকীর্ত্তির বিচার করে কে? তোমরা জাননা ঐ ঘরের কথা? তোমরা জাননা ঐ ঘরে প্রতি রাত্রে কি বিভীষিকার দুঃখের নিশ্বাস হেঁকে ওঠে? তোমরা জাননা যে সে ঘর অন্ধকার ক'রে রাখা হয় কেন? তোমরা কি জান, ওরা তোমাদের কেউ কি না? এক দিন মুখের ঐ ঢাকাগুলি খুলে ঐ মেয়েদের সাম্‌নে আলোতে এসে মুখোমুখি দাঁড়াও দেখি। চোখের জল সেদিন উজান বইবে, শরীরের রক্ত জল হয়ে যাবে, হাহাকারে আর্ত্তনাদে ঐ বিচারের আসন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে থাক্‌বে?

এ সকল কথা শুনিয়া যুবক আরও আশ্চর্য্য হইল। একেবারে তন্ময় হইয়া সে সত্যবাদীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সত্যবাদী যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মমতা তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধরিয়া রহিল।

সত্যবাদী বলিল,—আজই খোল তোমাদের ঐ মুখের আবরণ, ঐ সনাতন মুখোস। আজ একদিন নিজের চোখে দেখ তোমরা কি? তোমরা কি বল, তোমরা কি কর? আজ তাদেরও ডাকি তোমাদের সমুখে, তারাও জানুক নিজেদের। ধরা পড়ুক আজ সকলের প্রবঞ্চনা। কোনও লজ্জা নাই তাতে। কোনও ভয় নাই। আজ থেকেই আবার জীবন সুরু হ'তে পারে। আজ থেকেই। . . .

সত্যবাদী মমতাকে রমণীদের লইয়া আসিতে বলিল।

এতক্ষণ সকলে যেন মন্ত্রাহত হইয়াছিল। মমতা চলিয়া যাইতেই তাহারা পলাইবার উপক্রম করিতে ছিল, বাধা দিয়া কোমল মিনতি স্বরে সত্যবাদী বলিল,—যেও না, তোমাদের সব লজ্জা, সব অপযশ আমি নিলাম। চিরকাল এমনি করে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছ। একবার নিজেদের চেন। অনেক কাল কেটে গেছে এমনি ক'রে। মোহ আসে, প্রলোভন আসে, সব সত্যি, সব সম্ভব। কিন্তু কাপুরুষের মত আনন্দকে উপভোগের পাত্রে ঢেলে পান

করো না। তাতে তৃপ্তি হয় না, ভয় ছাড়ে না, মনুষ্যত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না। খোল, খোল আজ মুখের আবরণ। . . .

এক জন বস্ত্রাচ্ছাদন খুলিল। তাহাকে দেখিয়া সকলে মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল।

যুবক তাহাদের মুখ দেখিয়াই চোখ বুঁজিল? একি দৃশ্য, বুঝি না দেখিলেই ভাল ছিল। এই সেই তারা, যারা সন্ধ্যার পরিচ্ছন্ন বাতাসের গায়ে বাগানে দাঁড়াইয়া আজই এতগুলি মিথ্যা কথার বিষ ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছে। তাই বুঝি সন্ধ্যার মুখ এত শীঘ্র বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল!

অনাবৃত মুখগুলির দিকে চাহিয়া সত্যবাদীর মুখে চোখে আনন্দের উল্লাস উঠিল। তাহাদের মুখে তখন যে জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সমস্ত ঘরখানি যেন ছায়া-শীতল বনতলের সূর্য্যাস্তের মত স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। জোকার ও কমরেড্ তাহাদের গা ঘেঁষিয়া বসিল।

মমতা রমণীদের লইয়া উপস্থিত হইল। কেহ আর বিবস্ত্রা নাই। মমতা তাহাদের মুখাবরণও খুলিয়া দিল। আর এক সঙ্গে শত কণ্ঠে ঘরময় ধ্বনিয়া উঠিল,—তুমি? . . .

রমণীরা বলিয়া উঠিল—তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি ভাই, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু,—তুমি এখানে?

পুরুষেরা কাতর কণ্ঠে উত্তর করিল—জান্‌তাম না তুমি আছ। তুমি এখানে? তুমি? তুমি? তুমি? . .

যুবক আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল।

একজন নারী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—আমরা ভালবাসি এক জনকে, বিবাহ করি আরেকজনকে। আমরা যা চাই তা' আমরা সত্যি করে চাই না। চাই, যা নিরাপদ, যা সুবিধার মত। তাই গোপন প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে বিষপান করাতে নিয়ে আসি এখানে। কিছু বাধা নাই। ঐশ্বর্য্য, উচ্চপদ সব বাধা দূর করে দেয়। তোমরা যেমন করে দরওয়ানকে সহস্র মুদ্রা দান করে তাকে অবসন্ন করে ফেল, আমরাও তাই করি। কিন্তু জান্‌তাম না, তুমিও— ?

চারিদিকে থামে থামে, প্রাচীরে, দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইল—তুমিও! . . .

মমতার হাত ধরিয়া সত্যবাদী তাহাদের বলিল,—আজ তোমরা এই ঘরেই থাক। একরাত্রি মাত্র—এক রাত্রি . . . তোমাদের এই নিজের গড়া যতু গৃহে

বসে দেখ কি আগুন জালিয়েছ। সেই আলোতে আজ বহুদিনের অচেনাকে চিনে নাও।

যুবকের চোখে জল, মুখে হাসি। সে প্রশান্ত উদার সুরে প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া বলিল,—আমার দুঃখ সার্থক, আমার নির্ব্বাসন সার্থক।

সত্যবাদী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কি থাক্‌বে এখানে?

যুবক বলিল—সাধ্য নাই, কোথাও একদণ্ড থাকি। আমাকে কে পাগল করে নিয়ে বেড়ায়! আমাকে বিদায় দাও তোমরা।

সত্যবাদী ও মমতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে আসিল।

দারওয়ান একবার চোখ খুলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যুবক সরাইখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল,—এ সরাইখানার নাম কি? বাইরে ত কিছু লেখা নাই!

সত্যবাদী হাসিয়া উত্তর দিল—এর অন্য নাম নাই, এর নাম শুধু সরাইখানা।

যুবক অন্ধকার পথে মিলাইয়া গেল। তাহার অস্পষ্ট ছায়া কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে কিছুই দেখা যায় না। মমতা তবুও দাড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মার রোদনের মধ্যে শুনিতেছিল—অন্ধকারের একক যাত্রীর পায়ের শব্দ ঠক্‌, ঠক্‌, ঠক্‌ . . .

———

* * *

পুরুষ যখন বিনয়ী, নারী তাকে বলে—'ন্যাকা'। সে যখন সংযত, নারী বলে—'কাঠ্‌ খোট্টা'। সে যখন প্রেমপ্রার্থী, নারী বলে—'অসহ্য'।

বেচারী পুরুষ কেঁদে বলে—বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

"কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়"।

———

রক্তের বাণ

—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

শিকারের নাম শুন্‌লে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে উঠ্‌ত। কিন্তু এখন আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি না, এ নির্ম্মম নিষ্ঠুর নেশাটা ছেলেবেলা থেকে কেন আমায় এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। আমার বাবা মাঝে মাঝে শিকারে যেতেন বটে, কিন্তু তিনি খুবই অনভিজ্ঞ ছিলেন এ বিষয়ে। কিন্তু আমি যে কেমন ক'রে এ বিষয়ে এতটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌লুম সেটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। আমার হাতে খড়ি বাবার কাছে। ছ সাত বছর থেকে আমার এই সব রক্তমাখানো পশু পক্ষী দেখ্‌তে খুবই ভালো লাগ্‌তো। এই রকমে যখন দশ বারো বছর কাট্‌লো, তখন মাঝে মাঝে মিথ্যে একটা ওজর দেখিয়ে পাঠশালা পালিয়ে পাড়ার কতকগুলো ছেলের সঙ্গে শিকার কর্‌তে যেতুম। কোন কোন দিন বাড়ীতে কেউ না থাক্‌লে, সুবিধে ক'রে বাবার ছোট বন্দুকটাও নিয়ে যেতুম। একদিন এই সব ব্যাপার জান্‌তে পেরে বাড়ীতে খুবই উত্তম মধ্যম হল। তবু আমার সে রোগ থাম্‌লো না। সকলে যতই আমাকে ও বিষয় থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য বল্‌তো ততই আমি কেমন জড়িয়ে পড়্‌তুম।

একদিন শিকার কর্‌তে গেলুম, দুচার জন ছেলের সঙ্গে জমীদারদের বাগানে। কিন্তু সেদিন একটা বন্দুকের ছট্‌রাতে, জমীদার বাবুর পোষা ময়ূরটা, যেটা গাছের উপর পেখম খেলিয়ে নাচ্‌ছিল, একটা করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে পড়ে গেল। মালী ছুটে এল। সকলের মধ্যে ছোট আমি, ধরা ত পড়লুম। মালী একেবারে আমাকে বাবার কাছে সটান হাজির কর্‌লে। তিরস্কার খুবই হল। সেইদিন থেকেই আমার পাঠশালা বন্ধ হল। রাতদিন ঘরের মধ্যে রুদ্ধ থাক্‌তুম। ঘরের ভিতর থেকেও নিস্তার নেই, কেবলই মনে পড়্‌তো বনের মাঝ, ঝোপের ফাঁক ডালের পাশ! চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদাই দেখ্‌তুম রক্তাক্ত পশু পক্ষী কানে সর্ব্বদাই বাজ্‌তো তাদের করুণ চিৎকার! শিকারের নেশা আমায় পাগল ক'রে তুলেছিল।

যে পাখীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, রক্তাক্ত দেহ, অপরের প্রাণে করুণ সুরের

রেশ জাগাত, সেই সব দৃশ্য আমার প্রাণে আনন্দ রসের ঢেউ উঠাতো। কেউ কেউ বল্‌তো "আমি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর পশুর সমান—আমার প্রাণ পাষাণ।" কিন্তু তাতে আমার প্রাণ একটুও গল্‌তো না, মন একটুও টল্‌তো না।

বাবা মর্‌বার সময় বলে গিয়েছিলেন "মনু এই শিকারের জন্য তুমি কত তিরস্কার খেয়েছ এতে তোমার বড় সখ আমি আমার সাধের বন্দুকটা তোমাকে দিয়ে গেলুম এটা আমার স্থির বিশ্বাস যে এ বন্দুকের কদর তুমি ভাল রকমেই বুঝ্‌বে।" তারপর সেই বন্দুকটা পেয়ে আমার সুবিধা আরও বেড়ে গেল। আগে দুচার জন ছেলের সঙ্গে বাগানে গিয়ে পাখী মার্‌তুম, এখন বড় বড় শিকারীদের সঙ্গে গভীর অরণ্যে গিয়ে হরিণ, এমন কি ছোট খাটো বরাহ পেলেও ছাড়্‌তুম না। এই রকমে ক্রমেই একজন পাকা শিকারী হয়ে উঠলুম।

কিন্তু আজ প্রায় বছর দশ বারো হতে চল্‌লো আমি সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি, যে শিকারের নেশায় আমি পাগল ছিলুম। সে ব্যবসা কেন ছেড়ে দিয়েছি সেই মর্ম্মভেদী অভিশপ্তের কাহিনী আজ বল্‌বো। সে কথা ভাবতেও আমার চোখে জল আসে—বুক ব্যথায় ভরে উঠে—যে শিকারের জন্য ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ ক'রে শত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে যেতুম সে শীকারে এখন আমি সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত! এখন একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুন্‌লে বুকখানা পুড়ে যায়—এক ফোঁটা রক্ত দেখ্‌লে গা শিউরে উঠে!

যখন আমি "শিকারি" ব'লে চার্‌দিকে খুবই পরিচিত, সেই সময় আমার মামাতো ভাই তারাপদ আমাকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে সেখনে একটা "সুটিং পার্টি" আছে, আমাকে সেখানে যোগদান দিতে হবে। আহ্লাদের সহিত বন্দুক নিয়ে মামার বাড়ী গেলুম। আর দুচার জন বন্ধু জুটেছিল সেখানে। সে দিন পার্টিটা খুব আমোদেই কাট্‌লো। অনেক পশু হত্যা করা হল। রাত্রিতে 'ফিষ্টের' ব্যাপারটাও নেহাৎ মন্দ হল না। যে যার বাড়ী চলে গেলেন। র'য়ে গেলুম কেবল আমি তারাপদর একান্ত অনুরোধে। তারপর দিন একা আমি বেশ ক'রে বন্দুক গুলি ভরে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়্‌লুম। ইচ্ছে ছিল বাহাদুরিটা একাই নেবো। তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছিল চারিদিক নিরব নিস্তব্ধ! কেবল পাখীর কলধ্বনি বনটাকে মুখরিত কর্‌ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারময় কালো পর্দ্দা বনের উপর ধীরে ধীরে নাম্‌ছিল মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে শ্রান্ত অরুণের স্নিগ্ধ রশ্মি যে খানটায় পড়্‌ছিল সেই খানটাই রঙ্গিন হয়ে উঠ্‌ছিল। আমি তখন ও একটা শিকার যোগাড় করতে পার্‌লুম না। সমস্ত দিন বনে

ঘুরে ঘুরে শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তবু একটা শিকার না ক'রে বাড়ী ফিরবো না, এই পণে বুক বেঁধে, চারদিক চাইতে চাইতে বন ভেঙ্গে চলতে লাগলুম।

যেতে যেতে একটা নেবু গাছের কাছে এসে দাড়ালুম। সন্ধ্যার ঝির্ ঝিরে বাতাস গাছের পাতা কাঁপিয়ে নেবু ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে, সেই খানটা আমোদ ক'রে তুলেছিল। অদূরে চেয়ে দেখলুম ঘন বাঁশবনের পাশ দিয়ে একটা ঝরণা ঝর্ ঝর্ করে বয়ে যাচ্ছে, আর তার উপর ম্লান তপনের স্নিগ্ধ রশ্মি পড়ে ঝক্ ঝক্ করছিল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম, একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলুম। হঠাৎ সেই ঝরণার পাশে একটা বরাহের ভীষণ গর্জ্জন শুনলুম। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে স্বর লক্ষ্য করে আমি বন্দুক ছুড়লুম। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে "মা-রে গেলুম রে" বলে একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনলুম। আর্ত্তনাদ শুনে আমি স্তব্ধ বিস্মিত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলুম, ঝর্নার ধারে গাছের পাশে একটি নীলাম্বরী কাপড় পরা দশ বারো বছরের মেয়ে ছটফট করছে! তার কাঁধে গুলি বিঁধেছিল, আর তারই রক্তের ধারায়; তার সোনারঅঙ্গ ভেসে যাচ্ছিল! পাশে একটা কলসী গড়াগড়ি যাচ্ছিল, বুঝলুম ঝরণার জল নিতে এসেছিল।

আমার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল। কে যেন গর্জ্জে সমস্ত বনকে কাঁপিয়ে বলে উঠল "কি করলি হতভাগা! সোনার প্রতিমা আছড়ে ভেঙ্গে ফেললি" ।—চুলগুলো তার মুখের উপর এসে পড়েছিল, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছিল আর ছটপট করতে করতে করুণ স্বরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছিল "মা-রে গেলুম রে"। অনুতাপের অনলে আমার বুকখানা পুড়ে যাচ্ছিল। বন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বালিকাকে দুই হাতে কোলে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম "তোমার কোথায় লেগেছে গো!" বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল "কে? কে এসেছো? আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও আমি মার কাছে যাব" দূরে চেয়ে দেখলুম একটী ক্ষুদ্র কুটীর, সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, সেই জীর্ণ কুটীরের দীপশিখা সেই স্থানটা আলোকিত ক'রেছিল। বালিকাকে কোলে তুলে পাগলের মত কুটীরের দিকে ছুটে গেলুম। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে এক প্রৌঢ়া কুটীর থেকে এসে বললে "কে? সরি এলি?" প্রৌঢ়ার কথা শুনে আমার বুক দুরু দুরু করে উঠল। তার সাধের কমল 'সরিকে' রক্তের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছি!

কেঁদে বলে উঠলুম "ওগো তোমার সরিকে আমি যে খুন করেছি—আমায় শাস্তি দাও।' প্রৌঢ়া সরমার মূর্চ্ছিত দেহ কোলে নিয়ে তার করুণ আর্ত্তনাদে পাগল ক'রে তুললে আমায়।

আমি সরমাকে স্থানীয় হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম। কিন্তু সব নিশ্চল! সরমা সেই রাত্রেই মারা গেল। আমি বুকের আগুন চেপে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে যখন ফির্‌লুম তখন রাত একটা। তারাপদর কাছে বিদায় নিয়ে তার পর দিনই বাড়ী ফিরে এলুম।

সেই আমার শেষ শিকার! চরম শিকার! হাঁসপাতালে গিয়ে নিজের পাপ গোপন করে বলেছিলুম "এ বালিকাকে কে মেরেছে জানি না—বনের মাঝে এই রকম ভাবে পড়ে থাকৃতে দেখেছি"। কিন্তু এখন মনে হয় দোষ স্বীকার কর্‌লেই ছিল ভালো। তাহ'লে এমন ভাবে কষ্ট পেতে হ'ত না আমায়। হত্যা অপরাধে আমার ফাঁসী হত, সেও যে ছিল ভালো! ফির্‌বার সময় সেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম তাকে বাঁচিয়ে রেখে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। কিন্তু তাও হোল না। প্রৌঢ়ার চোখের জলের ফোঁটাগুলি দেখে মনে হোত, সরমারই ক্ষতের মুখের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা এখনও চুঁইয়ে পড়ছে!

সরমার দেহ আমার হাতের যে বাণ গিয়ে বিদ্ধ করেছিল, আজও তা বারে বারে রক্তমাখা 'রক্তবাণ' হয়ে ফিরে আসে আমার বুকের উপর!

—

* * *

মানুষ সব চেয়ে বেশী যাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে আজ পর্য্যন্ত তা হচ্ছে নারী, কিন্তু সৃষ্টির প্রথমে সে যে ভাবে দেখা দিয়েছিল, আজ তার কিছু বদল হয়েছে কি?—কেন তবে মানুষ আজও চীৎকার কর্‌ছে—'নারীকে বিশ্বাস করিতে নাই?'

"নারীর কথা"।

—



পথিক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৯

মিসেস্ কে, কে, দত্তের 'এট্ হোম্' পত্র পাইয়া মনীষা যখন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—খুকি তুই যাচ্ছিস্ ত ?

কল্যাণী একখানি চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করিয়া ধীরে সুস্থে সেখানি খামে বন্ধ করিয়া জিহ্বা দ্বারা আঠা লাগান স্থানটি একবার লেহন করিয়া লইয়া মনীষার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—উঁ— ?

মনীষা। তুই পার্টিতে যাবি ত ?

কল্যাণী চক্ষু আনত করিয়া একবার ঠোঁটের দুই পাশ সঙ্কুচিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঈষৎ নীলাভ কপালটির উপর কয়েকটি অতি ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

মনীষা উত্তরের আশায় এতক্ষণ চুপ করিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বিরক্ত হইয়া বলিলেন—মুখ ভ্যাঙাচ্ছিস্ কেন ? যা হয় একটা ঠিক কর।

কল্যাণী বিশেষ বিচলিত না হইয়া তেমনি ভাবে ধীরে ধীরে কলমটি উঠাইয়া লইয়া দোয়াতে ডুবাইল, অতিরিক্ত কালি উঠিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিল, ঠিকানা লেখা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—তাই ত কর্‌ছি, বাবা, যা খিট্‌খিটে হচ্ছ তুমি দিন দিন !—

মনীষা হাসিয়া বলিলেন—কি ঠিক কর্‌লি শুনি ?

কল্যাণী। মুনি বাবুকে লিখে দিলাম, মিসেস্ কে, কে, দত্তের পার্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। Let us celebrate it—

মনীষা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কল্যাণী চাকরকে ডাকিয়া চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া মনীষার কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল—মামণি, শনিবার দিন আমরা এখানে চড়িভাতি কর্‌ব ; তুই রাগ কর্‌তে পাবি না, বারণ কর্‌তে পাবি না- সব আমরা ঠিক করেছি মামণি, তোর নেমন্তন্ন, বাবার নেমন্তন্ন, করুণা মাসীদের আর এদের ওদের, তাদের, বুঝেছিস্ মামণি ?—

মনীষা। আঃ নাব্, বুড়ো হাতী আমার লাগে না ?—

কল্যাণী। আগে বল্—নইলে হাতী বসেই রইল!

মনীষা হাসিয়া ফেলিলেন। কল্যাণী তাঁহার মুখে চুমা দিয়া বলিল—লক্ষী মামণি। সে উঠিয়া কিছুক্ষণ, Swan danceএর অনুকরণে শরীর দুলাইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল তাহার পর একটা কলম লইয়া ফর্দ্দ করিতে বসিয়া গেল।

মনীষা বলিলেন—করুণাদিদের ত ডাক্‌বি, সোণাদিও আস্‌বেন, মায়া দীপ্তি কমলা উমাও বাদ যাবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু 'এরা ওরা তারা'টা কারা ?

কল্যাণী চটিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা, তোমার সঙ্গে বক্‌তে বক্‌তে মুখের জল ছাতু হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। ওদের যেন চেন না!

মনীষা। ঘাট হয়েছে বাবা! মেয়ে নয় ত যেন তাড়কা রাক্ষুসী! তাহার পর উঠিয়া কল্যাণীর পাশে বসিয়া বলিলেন—তা হ'লে তোরাই সব কর্‌বি ত? আমাদের কিছু কর্‌তে দিবি না ?

কল্যাণী। কিছু না, সুপ্রকাশ বাবু নাকি পাকা রাঁধুনী, শ্রীশদা বল্‌ছিল। আমাদের plan' সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল—শান্তাটারও 'রাঁধ্‌ব খাওয়াব' রোগ আছে, দুটোকে ছেড়ে দিয়ে—

মনীষা। তবেই হয়েছে! সে রান্না ঠাকুর আর কুকুর ছাড়া আর কারো মুখে তোল্‌বার জো থাক্‌বে না।

মনীষার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কল্যাণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—জানিস্ মামণি, শান্তাটা—

মনীষা ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিলেন—ছি, অমন ভাবে এ সব কথা বল্‌তে নেই—

কল্যাণী। কিন্তু সত্যি মামণি।

মনীষা। তাহ'লে এ নিয়ে কোন দিন আলোচনা করিস্‌নি, কাকেও কর্‌তে দিস্‌নি।

কল্যাণী। এটা অন্যায় মামণি ?

মনীষা। না সে জন্যে বলিনি, পৃথিবীতে বেশীর ভাগ মানুষই ভাল বাসাটাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে, যারা সত্যি ভালবাসে তাদের সেটা বড় আঘাত করে কিনা, তাই তোকে বারণ করছিলাম।

কল্যাণী মনীষার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—শান্তা বলছিল—ওকে পাই আর না পাই, ওর দেখা যে পেয়েছি এই ঢের।

মনীষা। সুপ্রকাশের কি মত শান্তার সম্বন্ধে জানিস্ ?

কল্যাণী। শান্তা বলছিল—ও সর্ব্বদা আমাকে তফাতে রাখ্‌তে চেষ্টা করে।—তা ছাড়া আমি নিজে ওর কথা শুনে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় কোথাও ওর মন ভেঙ্গেছে মা। মেয়েদের সম্বন্ধে ও বড় বেশী Stiff! আর সব বিষয়ে এমন মিষ্টি, কি বল্‌ব! আমি শান্তাকে বলছিলাম—তুই একটু চেষ্টা করলেও ত ওর Stiffness সরিয়ে নিতে পারিস্ ?

—ও বল্‌ল—হৃদয় জয় কর্‌বার বাসনা আমার আছে, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই। আচ্ছা মা, ওটা বোকার মত কথা নয় ?

মনীষা হাসিয়া বলিলেন—তার মানে ?

কল্যাণী। ভাল যদি বাসি—তাহ'লে ছলে বলে কৌশলে কেঁদে কোকিয়ে যেমন ক'রে পারি ভালবাসা আদায় ক'রে নেবো।—বারে! আমি ভালবেসে মর্‌ব, আর সে বাসবে না ? কি আব্দার!—

মনীষা। আচ্ছা খুকি, তুই মামণিকে একটা কথা বল্‌বি ?—

কল্যাণীর মুখে যেন জগতের সমস্ত দুষ্টু মেয়ে আসিয়া উঁকি মারিল। মনীষার কথায় সে চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া গলার স্বর বদলাইয়া কি যে বলিতে চাহিল তাহা সেই জানে। মনীষা কল্যাণীর কাণ্ড দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—কি জিগ্‌গেস কর্‌বি কর্ না, অমন কর্‌ছিস্ কেন ?

মনীষা। আমার ধারণা সত্যি ?—

কল্যাণী। তুই ডাইনী-মা হ'তে পারিস, আমি ত আর ডাইনী-মেয়ে নই, তুই কি ভেবেছিস তা কি জানি ? আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কল্যাণী চলিয়া যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া মনীষাকে তখনও হাসিতে দেখিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া মুখ লুকাইল। মনীষা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—কেন আমায় এতদিন লুকোলি খুকি ?—

কল্যাণী কোন কথা না বলিয়া মনীষার গলায় একটি চুম্বন করিল। মনীষা দেখিলেন কল্যাণীর চোখে দুই ফোঁটা জল টল্ টল্ করিতেছে!

* * *

তখন বেলা প্রায় ১টা হইবে। মুনি তাহার ঘরে পায়চারী সুরু করিয়া দিয়াছে। ঘরের মধ্যে দুইখানি বড় বড় আয়না, সাম্না-সাম্নি ভাবে ঝুলানো রহিয়াছে। প্রতিবার তাঁহাদের নিকটে আসিলেই সে আপনার মুখ দেখিয়া লইতেছে,—বিড়্ বিড়্ করিয়া কি সব যেন বকিতেছে, মাথা নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া হাত নাড়িয়া যেন সে কোন অদৃশ্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অভিনয় করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি ঘড়ির উপর পড়িল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চিন্তাক্লিষ্টভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া সে যেন কিসের হিসাব করিয়া লইল, তাহার পর আবার ঘড়ির দিকে চাহিল—১টা ২৩ মিনিট্!

সাম্নের আয়নার দিকে চাহিয়া বেশ নিশ্চিন্তভাবে বলিল—ওঃ এতক্ষণ?—এতক্ষণ নিশ্চয়ই সবাই এসে গেছে, নিশ্চয়ই এসেছে। এ সব ক্ষেত্রে যত দেরী করে যাওয়া যায় ততই ভাল, কেউ না ভাবে আমারই তাড়া বেশী—বেশ সহজ ভাবে ধীরে সুস্থে সবার শেষে যাব—তাতে অবশ্য একটা রাগের চাউনি যদিও পাব, তবু—নাঃ, আর দেরী করা নয় সবাই যখন এসেই গেছে, তখন—

সে তাড়াতাড়ি কাপড় জামা বাহির করিয়া সাজিতে সুরু করিয়া দিল। তাহার পর ঘরের বাহিরে আসিয়া একবার পিতার ঘরের দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাইয়া কিছু শব্দ শুনিতে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর দরজার দিকে কয়েকপদ অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেই অত্যন্ত সরু গলায় মুনির ছোট বোন চারু বলিয়া উঠিল—বাঃ ঠিক যেন কার্ত্তিকটি!—

মুখ বিকৃত করিয়া মুনি ইসারায় তাহাকে মারিবার জন্য ঘুসি দেখাইল। তাহাতে খানিকটা হাসির শব্দ উপহার পাইয়া মুনি যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। বলিল—পোড়ারমুখী দুপুর বেলা টো টো করে বেড়াচ্ছিস্ বাবাকে বলে দেবো?—

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পোড়ারমুখী বলিল—তুমি কোথা যাচ্ছ দাদ?—বাবারে! 'সেন্টে'র গন্ধ যে ভর্ ভর্ কর্‌ছে! সব শিশিটাই গায়ে ঢেলে দিয়েছ নাকি?—

নিরুপায় হইয়া মুনি বলিল—কোথা যাচ্ছি জানিস্? তোর একটা বরের সন্ধান পেয়েছি, তাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি।

চারু। ওঃ কি উদার অন্তঃকরণ গো!—আচ্ছা দাদু, ঐ সোজা সোজা অক্ষর, মোটা মোটা চিঠি তোমায় কে লেখে রোজ রোজ?—

মুনি। ও আমার একজন 'ক্লায়েন্ট'।

চারু মুখখানি বাঁকাইয়া বলিল—ক্লায়েন্ট মানে কি দাদু?—

মুনি রাগিয়া বলিল—'ক্লায়েন্ট মানে কি দাদু'—বাঁদরি, ইস্কুলে যাও কি কর্‌তে?

চারু। পড়্‌তে।—কিন্তু তোমার মত ক্লায়েন্টের খোঁজ কর্‌তে নয়। তোমার ক্লায়েন্ট তোমায় ডেকেছে বুঝি?—খুব জরুরী কোন মকর্দ্দমার কাগজ পত্র দেখাবে বুঝি? তা বেশ যাও, বাবা উঠ্‌লে আমি বল্‌ব অখন—দাদু তার ক্লায়েন্টের বাড়ী গেছে।

মুনি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে বলিল,—ফিরে এসে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌ব।

উত্তরে সে শুধু একটু তীব্র অথচ চাপা হাসির শব্দ শুনিতে পাইল।

কিন্তু এত হিসাব এত সাবধানতা সত্ত্বেও ৯৯ নম্বরে আসিয়া মুনি দেখিল, তখনও কেহ আসে নাই! তাহার পর রণজিৎ প্রশ্ন করিল—আপনি একা যে?—ওঁরা কেউ এখনও এলেন না?—

মুনি ভিতরে ভিতরে ঘামিয়া উঠিল। রণজিৎকেই যেন কৈফিয়ৎ দিবার জন্য সে বলিল—তাই ত কি আশ্চর্য্য! অথচ আমাকে ওরা বল্‌ল যে ১টার মধ্যেই সবাই আস্‌বে!

মনীষা বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনার বন্ধুদের তা'হলে ত বড় অন্যায়! তা আর কি হবে, আপনি ত আর জলে পড়েন নি?—তা ছাড়া কাজও ত আপনাদের ঢের রয়েছে, যান না ও ঘরে খুকি আর শান্তা কি সব কর্‌ছে তাদের সাহায্য করুন। আমাকে ওরা কিসীনায় যেতে দেবে না বলেছে। কিন্তু রান্না যদি খারাপ হয় এমন নিন্দে কর্‌ব যে টের পাবেন সবাই।

মুনি ডাইনিং রুমে আসিয়া দেখিল একরাশ কিস্‌মিস, বাদাম, পেস্তা লইয়া শান্তা এবং কল্যাণী বসিয়া আছে, কিন্তু সেগুলি যে কতদূর 'বাছা' হইতেছে, তাহার বিষয় বলিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে। কথা কহিতে কহিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া একটি একটি করিয়া বাদাম বা পেস্তা লইয়া উভয়ে নাড়া চাড়া করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখেও যে উঠিতেছে না, তাহাও বলা যায় না।

মুনিকে দেখিয়া একরাশ পেস্তা মুখে পুরিয়া কল্যাণী হুকুম করিল—ঐ চাল গুলো শি ্গির বেছে দিন, একটি যদি কাঁকর থাকে বুঝ্বেন। '

শান্তা হাসিয়া বলিল—'পড়েছেন যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' নিন্ বসে পড়ুন।

মুনিও বিনা আপত্তিতে কল্যাণীর পাশে বসিয়া একটি বড় থালায় চালগুলি ঢালিয়া বাছিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

অনেক বিষয়ে মুনি যে বিশেষ দক্ষ এই তথ্যটি সে কল্যাণীর সহিত আলাপ হইবার পর হইতেই আবিষ্কার করিয়াছিল কিন্তু চাল ডালও যে সে এমন তৎপরতার সহিত বাছিতে পারে তাহা এই প্রথম জানিল।

শান্তা বলিল—আপনি পার্বেন দেখ্ছি!

মুনি হাসিয়া শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি শান্তাদি? শান্তা দুষ্টামি করিয়া কল্যাণীর দিকে তাকাইয়া বলিল—কল্যাণীর ভাঁড়ার ঘর গুছিয়ে দিতে—এই কথাটি শেষ না হইতেই তাহার গালে যাহা আসিয়া আঘাত দিল তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া কিস্মিসের অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও একেবারেই মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয় নাই!

শান্তা হাসিতে হাসিতে মুখ মুছিতে লাগিল। এই অবসরে মুনি এবং কল্যাণী একবার চকিতভাবে পরস্পরকে দেখিয়া লইল। এই সময়ে মনীষা আসিয়া বলিলেন—ওরে খুকি, তা হ'লে 'বয়'কে এ বেলা ছুটি দিয়ে দিই? তোরা ওকে চাস্ না ত?—

কল্যাণী। এখুনি ওকে বিদেয় করে দাও মা, আজ আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে ও যেন না আসে।

মনীষা। বেশ, ও সব যোগাড় ক'রে ক'রে রেখে যাচ্ছে রান্না ঘরে, সব হাতে কাছে পাবি, আমাকেও তোরা চাস্ না ত?

কল্যাণী 'এপ্রিকট্' লইয়া মনীষার মুখে পুরিয়া দিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—বেরো এ ঘর থেকে।

তিনজনে আপন আপন কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য যখন মাতিয়া উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের কথার স্রোতও বন্ধ হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে মহা কলরব করিতে করিতে উমা কমলা শ্রীশ দীপ্তি ও মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিকে তদবস্থায় দেখিয়া মায়ার হাসি আর থামে না! বলিল—হ্যাঁরে কল্যাণী, এমন faithful slave কোথায় পেলি?—এই কমলি,

মুনিবাবু কেমন পা ছড়িয়ে চাল বাছ্‌ছেন দেখ! শুপুরি কাটতে পারেন মুনিবাব?—

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—তোমার অত হাস্‌বার দরকার নেই, আমাদের পাচক ঠাকুরটিকে দেখ্‌লে তোমার চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে যাবে। কিন্তু সে ভদ্রলোকের হ'ল কি! শ্রীশদা শেষটা সব পণ্ড হবে নাকি?

শ্রীশ। আসবার সময় একবার ভেবেছিলাম ওকে তুলে নিয়ে আসি, মায়া বারণ কর্‌ল, বল্‌ল—হাঁ এতক্ষণ তিনি বাড়ীতে আছেন কি না? নিশ্চয়ই 'নাইন্‌টি নাইনে' গেছেন।

কল্যাণী। এখুনি যাও, তোমার গাড়ী ত রয়েছে তাঁকে নিয়ে এস।

শ্রীশ বেশ আরাম করিয়া বসিয়া বলিল—সেও ত বড় হাঙ্গাম! তা এক কাজ কর না কেন, আমাদের গাড়ীটা নিয়ে মুনিকে পাঠিয়ে দাও।

কল্যাণী ফোঁস্‌ করিয়া উঠিল—তোমার কি আক্কেল শ্রীশদা! উনি না, আমাদের 'গেষ্ট'?—

মায়া। আহা এর বেলায়ই গেষ্টের ওপর যত টান পড়্‌ল! আর এতক্ষণ যে এক কাঁড়ি চাল বাছিয়ে নিলেন, তখন গেষ্ট বলে মনে ছিল না?—চড়িভাতিতে আবার গেষ্ট কি? মুনি বাবু must go—

মুনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিল—যদি অভয় দেন একটা কথা আপনাকে বলি মায়াদি,—আমার মনে হয় এই ছুটো ছুটির কোনই দরকার নেই, সময় হ'লেই সে আস্‌বে। আমাদের ব্যস্ত হওয়া না-হওয়া এ ক্ষেত্রে সমান কথা। যদি যাই হয়ত সেখানে গিয়ে দেখ্‌ব সে বাড়ীতে নেই। তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে যদি soul force প্রয়োগ করি।—'

কিন্তু আর soul force প্রয়োগের প্রয়োজন হইল না, সুপ্রকাশ, জীবন, বিকাশ আসিয়া হলের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইল।

সকলের এই বিলম্বের জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সকলকে ঘরে আনিয়া বসাইতেই শ্রীশ বলিল—আমরা সবাই বোধ হয় এসেছি?—

মায়া বহুক্ষণ হইতেই চারিদিকে তাকাইতেছিল, সে জীবনকে বলিল—সহকারী মহাশয় আপনি একাই এসেছেন নাকি? কিন্তু চিঠি খানাতে সম্পাদক মহাশয়কেও সমান একাগ্রতার সঙ্গে আমরা আহ্বান করেছিলাম।

জীবন। তার আসবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে তার

শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না, তাই বল্‌ল—আমার Companyটা হয়ত ওঁদের পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়তে পারে।

কল্যাণী। Just like a man !—আমাদের সহ্য অসহ্য নিয়ে তাঁর মাথা ধরাবার কোন দরকার নেই।

কল্যাণী ঘরের কোণে যেখানে টেলিফোন বসান আছে তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একটি নম্বর খুঁজিয়া বাহির করিল তাহার পর বিপুল বেগে 'রিং' করিয়া বলিল—Six naught nine naught Regent, please—তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যালো! আপনি নিশ্চয়ই—ভয়ানক রাগ করেছি আপনার ওপর বিমলবাবু, কেন এলেন না?—না কোন explanation শুনতে চাই না বিমলবাবু—এই শুনুন, আপনি না এলে আমাদের ভয়ানক খারাপ লাগ্‌বে। শরীর কি খুব খারাপ?—না? তবে আসুন লক্ষীটি, কেমন? আমি শ্রীশদার গাড়ী পাঠাচ্ছি. আপনি ততক্ষণ 'রেডি' হয়ে নিন্ কেমন?—আচ্ছা।

'রিসিভার'টি নামাইয়া রাখিয়া সে শ্রীশকে বলিল—তোমার ড্রাইভারকে বলে দাও বিমলবাবুকে এখানে নিয়ে আস্‌তে।—

শ্রীশ কল্যাণীর আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ওহে প্রকাশ রন্ধন-সমুদ্র মন্থনে তুমিই আমাদের আশা ভরসা যা কিছু বল সবই কিন্তু বেড়ি খুন্তি হাতে তোমাকে রান্নাঘরে পাঠাবার পূর্ব্বে 'সূপকার্য্যের গুহ্যরহস্য' সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই।—কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সহায়তা কর্‌তে পারে।

সুপ্রকাশ হাত জোড় করিয়া ব্যাকুলভাবে শ্রীশের মুখের দিকে তাকাইয়া অভিনয়ের সুরে বলিল :—

কহ বন্ধু, কহ শুনি কেমনে উঠিবে
ফুটি ডেক্‌চি ভিতরে কোর্ম্মা-পোলাও
টগ্‌বগ্, ছ্যাঁক্ ছোঁক্ ছনন ছনন
গানে,—গন্ধে পথিকের পথ হবে ভুল
ম্লানমুখে যেতে যেতে আঘ্রানি বাতাস
লেহন করিয়া নিজ লালাসিক্ত আবেশ-
বিহ্বল ওষ্ঠ দুটি, কহিবে কাতরকণ্ঠে—
হায়, কেগো তুমি সীমন্তিনী! মোর ঘরে
কেন তব হল নাক ঠাঁই—

সকলে হাসিয়া অস্থির হইল। কল্যাণী বলিল—শ্রীশদা, তোমার শিষ্যটি উপযুক্ত, তোমার উপদেশ বৃথা হবে না।

শ্রীশ। একেবারে গুরুমারা চেলা, অতএব উপদেশটা উপস্থিত মুলতুবি থাক্।

উমা। বটে আর কি, তা হচ্ছে না, নাও আরম্ভ কর, আর দাম বাড়াতে হবে না।

শ্রীশ বলিল—এক ভদ্রলোক এক দিন তাঁর রান্না কর্‌বার জন্যে একটি পাকা রাঁধুনীর সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন। অনেক খোঁজাখুজির পর যাকে নিয়ে ঘরে ফির্‌লেন আর রাঁধ্‌বার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে স্নান কর্‌তে যাবেন বলে তেল মাখ্‌তে বস্‌লেন, সেই পাকা রাঁধুনী বেশ বিনয় সহকারে বল্‌ল—আজ্ঞে আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু আপনি এক বার না দেখিয়ে দিলে—

ভদ্রলোকটি ত অবাক! বল্‌লেন—সে কিরে! এই না আমায় বল্‌লি সব পারব?

—আজ্ঞে কিছু মিথ্যে বলিনি কর্ত্তা—দেখিয়ে দিলেই সব পার্‌ব।

—ভদ্রলোকটি ত মহা চটে গেলেন। কিন্তু কি আর করেন? বেলাও ঢের হ'য়ে গেছে, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছে, বল্‌লেন—আচ্ছা আমি যা বলি তা কর্ রান্না ঘরে ঢুকে দেখ্ উনানে আঁচ্ আছে ত?

—আজ্ঞে হাঁ কর্ত্তা।

—আচ্ছা, হাঁড়িটা বসা—বসিয়েছিস্?—

—হাঁ হুজুর।

—জল ঢাল্,—ঢেলেছিস্?

—হাঁ কর্ত্তা।

—আচ্ছা, এবার ঐ গাম্‌লায় যে চালগুলো ধোয়া আছে, তা ঢেলে দে,—দিয়েছিস্?—

—হাঁ হুজুর।

—যা ব্যাটা এবার সরাটা মুখে চাপা দিয়ে ঘুমোগে যা, আমি এসে তরকারী রাঁধ্‌ব।

ভদ্রলোকটি স্নান করতে গেলেন—ফিরে এসে দেখেন—উনান নিভে গেছে, হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে বসান আছে, ঘরের মেঝেতে চাল ঢালা! আর জলের ওপর মুখে সরা চাপা দিয়ে পাকা রাঁধুনী মশাই ঘুমাচ্ছেন!

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—এটা চিমটি কাটা হ'ল! আচ্ছা সুপ্রকাশ বাবু, আপনি এটা সহ্য করবেন?

সুপ্রকাশ। কখনই না।—আমাকে বলে দিন ত রান্না ঘরে যাবার পথটা কোন দিকে, তার পর সব দেখে নিচ্ছি।

মনীষার সহিত প্রবোধ এই সময়ে ঘরে আসিয়া বলিলেন—শ্রীশ আমি তোমাদের পাকা রাঁধুনী মশাইয়ের উৎসাহের প্রশংসা করি কিন্তু এক কাজ করলে হয় না, তোমরা যত দূর সম্ভব রাঁধাবাড়া কর আমরা পার্টি থেকে ফিরবার পথে 'ফার্পো' থেকে কিছু—

কল্যাণী। এ অসহ্য সুপ্রকাশ বাবু—

সুপ্রকাশ দাঁড়াইয়া বলিল—আমি প্রস্তুত শুধু এক জন এসিস্‌টান্ট চাই।

কল্যাণী শান্তার দিকে চাহিয়া বলিল—শান্তা—

তাহার পর মহা কলরবে সকলে সুপ্রকাশকে লইয়া রান্নাঘরে আসিয়া হাজির হইল।

একটা 'ন্যাপ্‌কিন্‌' কোমরে জড়াইয়া জামার হাত গুটাইয়া ডেক্‌চিটাকে 'ওভ্‌ন্‌'এ বসাইয়া দিল তাহার পর দধি হলুদ আদাবাটা পেঁয়াজবাটার ভাগ মাংসের পরিমাণে কতটা করিয়া দিতে হয় তাহা সকলকে দেখাইয়া মাংস কষিতে আরম্ভ করিল মনীষা এবং প্রবোধ অবাক হইয়া গেলেন!

কল্যাণী চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—এবার হয়েছে ত?

মনীষা সুপ্রকাশের অভ্যস্থ হাতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—হয়েছে—কিন্তু এখানে এত লোকে ভিড় করলে ত চলবে না। রান্না ঘরে দুজনের বেশী মানুষ থাকা শাস্ত্রের বারন।

কল্যাণী। আমিও ত তাই বলছি।—এই উমি, কমলি বেরো এ ঘর থেকে—মায়া বেশ যা হোক! জীবন আর বিকাশ বাবু, ও ঘরে চলে গেলেন, যা ওঁদের কাছে।—শ্রীশদা, তোমারই বা কি আক্কেল! আর এই রণজিৎ তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস্‌?—যা দশ নম্বরে এনা বীণার সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্টন্‌ খেলগে যা।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে রান্না ঘর হইতে সকলকে তাড়াইয়া দিয়া মুনিকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল—বাবা মা বেরিয়ে গেলে, আর ঐ ছেলে মেয়েগুলো কথাবার্ত্তায় জমে উঠ্‌লে আমি একবার হাঁচ্‌ব ঠিক তার তিন মিনিট পরে তুমি৺বেশ সহজভাবে—মানে carelessly উঠে এটা ওটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিঁড়ি দিয়ে আমার ছাদের ঘরে চলে যাবে—বুঝেছ?

মুনি একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল—সে সমস্তই বুঝিয়াছে এবং এই আদেশ পালন করিতে অন্যথা করিবে না।

কল্যাণী বলিল এখন ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ জমাও—আমি আজ খালি চর্ক পাক খেয়ে বেড়াব কোথাও ধরা দিচ্ছি না।

রান্না ঘর হইতে সকলে বাহির হইয়া যাইতেই সুপ্রকাশের মুখের সরলতার ভাবটি সরিয়া গেল। শান্তা যে তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে পলকহীন চোখে দেখিতেছে তাহা যেন সে জানে না; তাহার অস্তিত্বও যেন সুপ্রকাশ ভুলিয়া গিয়াছে।

নিস্তব্ধ ঘরে ডেকৃচির মধ্যে মাংস ফোটার শব্দ উঠিতেছে সুপ্রকাশ মাঝে মাঝে তাহা খুন্তি দিয়া নাড়িয়া ডেকৃচির মুখ চাপা দিতেছে ওভ্নের তেজ কম বেশী করিতেছে, কিম্বা কোন কিছু লইয়া আপনার মনে নাড়া চাড়া করিতেছে।

হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের ওভ্নের গ্যাস খুলিয়া দিয়াশালাই দিয়া জ্বালিল, তাহার পর একটা কড়া চাপাইয়া দিয়া মাছের কোন একটা তরকারী রাঁধিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। শান্তা সরিয়া আসিয়া বলিল—আমি রাঁধ্‌ব এ মাছটা ?—

সুপ্রকাশ একবার ভাবহীন চোখে শান্তার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—রাঁধুন।

দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আপনাদের কাজ করিয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই, মাঝে মাঝে নড়িতে চড়িতে পরস্পরের হাতের স্পর্শ পাইতেছে। শান্তা তাহার কড়া হইতে মুখ উঠাইয়া সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল—সুপ্রকাশবাবু—

সুপ্রকাশ তাহার ডেকৃচি হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—বলুন—

শান্তার বুকের মধ্যে যেন কি সব গুটি পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। গলা কাঁপিয়া যাইবার ভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমি কি আপনার জীবনে অশান্তি এনে দিচ্ছি সুপ্রকাশবাবু ?—

সুপ্রকাশ তাহার শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া শান্তার সাম্‌নে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চোখদুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য। এ সব কি বল্‌ছেন শান্তা দেবী ? না এমন কথা আমার মনে ওঠেনি কোন দিন, বিশ্বাস করুন। কেন ভাব্‌লেন ও কথা ?—

শান্তা মুখটি নামাইয়া ফুটন্ত মাছগুলির গায়ে ধীরে ধীরে খুন্তি ছোঁয়াইয়া

বলিল—সবার কাছে আপনি সহজ, সবার কাছেই আপনি হাসেন আর সে হাসিটা যে আপনাকে কত সুন্দর ক'রে তোলে—

শান্তা থামিয়া গিয়া আবার আরম্ভ করিল—কিন্তু আমি যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি, মনে হয় যেন আমি আপনার ঐ হাসির পথ বন্ধ ক'রে আছি। আপনার মধ্যে সবাই যেটাকে পেয়ে তৃপ্ত হয় সে টুকুও আমি পাব না কেন?—

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—সে দোষ আপনারই কেন সবার থেকে আলাদা হ'য়ে আমার কাছে এলেন?—

শান্তা। ওঃ এই অপরাধ? তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমায় অমন ভাবে অপমান ক'রে চলে এলেন?—

সুপ্রকাশ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—অপমান?—

শান্তা সুপ্রকাশের মুখের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—অপমানই ত সুপ্রকাশ বাবু, মনে আছে, আপনি আমায় কি বলেছিলেন?

সুপ্রকাশ। না, কিছু মনে নেই কি বলেছি। তবে 'আপনাকে অপমান করব বলেই বলেছি' এ ধারণাটা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারেন না?

শান্তা। আপনি মুছিয়ে দিন।

সুপ্রকাশ নীরবে কিছুক্ষণ শান্তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চোখের তারা দুটির উপর বাষ্পের অত্যন্ত পাত্‌লা একটা আবরণ আসিয়া দেখা দিল। ধীরে ধীরে আপনার বুকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিতে লাগিল—আমার এই বুকটার ভিতর একটা আগুন্ জ্বল্‌ছে, তারই জ্বালায় আমি তিল তিল ক'রে মর্‌ছি—আমি আজ বহু দিন অসুস্থ। আমার এই অসুস্থতা, হাসি আর হাল্কা ভাব দিয়ে সবার চোখের দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে রাখি। আপনার কাছে এ ভণ্ডামি আমার ধরা প'ড়ে গেছে। তাই প্রতি কথা, প্রতি কাজে আপনি আপনার সান্ত্বনার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে চান—কিন্তু যাদের হাতে এ আগুন জ্বলেছে, এ জ্বালার শান্তির জন্যে তাদেরই কাছে এসে দাঁড়াতে হবে, শুধু এই কথাটা ভেবেই এমন একটা দুর্ব্বলতার কান্না মনে জাগে, যাকে সব সময় থামান দুষ্কর হ'য়ে ওঠে শান্তা দেবী।

শান্তা গ্যাস কমাইয়া দিয়া মাছগুলিকে টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সুপ্রকাশের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি আমায় নির্লজ্জ বা যা কিছু ভাব্‌তে পার প্রকাশ, আমি তোমাকে আজ বলে যেতে চাই, যে তোমাকে আমি আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি, আমার নিজের চোখে দেখা তোমার

লুকান রূপে আমার চোখ ভ'রে উঠেছে, মনটার ত কথাই নেই!—তাই এত দিন নানা ছলে তোমায় কাছে ডেকেছি, কথা বলেছি, সব দিক দিয়ে তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে কত রকমের আয়োজন করেছি; কিন্তু এইটাই যদি তোমার সব চেয়ে বড় অশান্তির কারণ হয়, তাহ'লে এখানে, আজই সব শেষ ক'রে দেবো প্রকাশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কোন দিন কোন দিক দিয়ে তুমি আমায় অনুভব করতে পারবে না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেও দেখবে, এ সে শান্তা নয়।—

সুপ্রকাশ শান্তার একখানি হাত আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—আজ আমায় আর কিছু ব'ল না, থাক্ সইতে পারব না শান্তা।

শান্তা সুপ্রকাশের চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—যদি অনুমতি দাও তোমার বোঝা আমি নামিয়ে নিই—

ম্লান হাসিয়া সুপ্রকাশ বলিল—নামান যায় না।

শান্তা। ওর ভাগ ত নিতে পারি?

সুপ্রকাশ। এত বড় কাপুরুষ কি ক'রে হই?

শান্তা। কাপুরুষ?—

সুপ্রকাশ। ওটা কাপুরুষতা নয়?

শান্তা কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—তোমার কাছে হ'তে পারে, আমার কাছে নয়।—কাল আসবে একবার আমার কাছে?

সুপ্রকাশ শান্তার হাতের আঙ্গুলগুলি একবার ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল।

শান্তা। আসবে না?—

সুপ্রকাশ। আসব।

শান্তা। অমন অন্যমনস্কভাবে বললে কেন?

সুপ্রকাশ। আর একটা কথাও ঐ সময় ভাবছিলাম।

শান্তা। কি কথা?—

সুপ্রকাশ শান্তাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—শান্তিকে বুকের এত কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।—

শান্তা। কেন?—

সুপ্রকাশ। কাল সব জানবে। তোমার মাছের ঢাকাটা তোল, বোধ হয় হ'য়ে গেছে।

ইহার পর দুই জনে ভাগাভাগি করিয়া রান্না আরম্ভ করিয়া দিল, তেল নুন বা মশলার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় ছাড়া আর কোন কথা কহিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই জনে দুই জনকে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া লইতে ছিল।

রান্না ঘর হইতে 'হলে' আসিয়া জীবনের সহিত কথা কহিতে গিয়া মায়া অবাক্ হইয়া গেল। যে মানুষ এক দিন স্পষ্টভাবে এক জনের কাছে স্বীকার করিয়াছে 'তোমায় ভালবাসি' তাহারই কাছে সে এমন সহজ এবং নির্লিপ্তভাবে বসিয়া কথা কহিতে পারে? হাব ভাব চাহনিতে জীবনের মনের সরলতা ছাড়া এমন কিছুই মায়া দেখিতে পাইল না যাহাকে সে ভয় করিতে পারে বা যাহা ভাবিয়া তাহার মনে সহানুভূতি জাগিতে পারে।

এক সময় জীবন মায়াকে বলিল—আচ্ছা আপনি বাঙ্গাল দেশে গেছেন?

মায়া হাসিয়া বলিল—বাঙ্গাল দেশ, মানে পূর্ব্ব বঙ্গে?—না যাইনি।

জীবন। আমি বিয়ে ক'রেই আমার দেশে আপনাদের সকলকে নিয়ে গিয়ে একটা পার্টি দেবো—শরৎ কালটা আমাদের দেশ ভারি সুন্দর দেখায়—জানেন, আমাদের বাড়ী ঘর সব জলে ঘেরা সে এক রকম প্রায় ভিনিস্ বললেই চলে।

মায়া। কবে নিয়ে যাবেন?

জীবন। বিয়ে হ'লেই।

মায়ার যেন আর দেরী সহ্য হইতেছিল না, বলিল—তা হ'লে শিগ্‌গির বিয়ে করুন, কবে করবেন?

জীবন। যে দিন বৌ খুঁজে পাব।

মায়া। একটু তাড়াতাড়ি বার করুন,—next autumn কেমন?

জীবন। দেখুন। আমার হাত যশ, আর আপনার বরাত।

মায়া। আমরাও খোঁজার ভার নেবো?

জীবন। I trust nobody—

মায়া। তাহ'লে খোঁজ আরম্ভ করেছেন?—পেলেই আমায় খবর দেবেন?

জীবন। সবার আগে।

মায়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল। কিন্তু তাহার এই শান্তি অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। ধীরে ধীরে বিমল আসিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া মায়াকে নমস্কার করিয়া একটি চেয়ারে বসিল।

বহু দিনের পরিচিত হইলেও দীপ্তি বিমলের সহিত গায়ে পড়িয়া কথা কহে না বা আলাপ করে না ; আজ বিমলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার চোখের অবাদে ভরা চাহনির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যে বেদনার উৎস লুকান ছিল তাহা সে যেন দেখিতে পাইল। সে উঠিয়া আসিয়া বিমলের পাশে বসিয়া বলিল—সত্যি সত্যি যে আপনার শরীর বড় খারাপ হয়েছে বিমল বাবু! দিন কতক কোথাও ঘুরে আসুন না ?

জীবন বলিল—বলুন ত মিস্ মিত্র, আমি হয়রাণ হয়ে গেছি।

বিমল হাসিয়া বলিল—না, এখন আমি অনেকটা ভাল আছি, মাঝে খুব দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিলাম অবশ্য কিন্তু তখন ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি। আমার জন্যে কিছু ভাব্‌বেন না, তা ছাড়া জীবন এখন আমায় আর কোন কাজই করতে দেয় না, আমার খাতা পত্তর সব ও 'বাজেয়াপ্ত' করেছে, শুধু তাই নয়, এক জোড়া মুগুর এনে ঘরে রেখেছে, বলে exercise কর্‌তে হবে !

দীপ্তি। বেশ করেছেন, আমি খুব খুসী হয়েছি। আজ সন্ধ্যায় মা ত এখানে আস্‌ছেন, এলেই আমি নালিস করব।

বিকাশ বলিল—মায়াদি, আপনি যে কিছুই বল্‌লেন না বিমল বাবুকে ?

মায়া বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিল—আমি ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি ওঁকে এ রকম দেখে, বল্‌বার কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না—আচ্ছা বিমল বাবু এতগুলি মানুষের স্নেহের কি কোন মূল্যই নেই ?

বিমলের মুখখানি ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল চীৎকার করিয়া বলে—পুরুষের কাছে স্নেহের কোন মূল্যই নেই, প্রেমই তার সব। নারীর সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য। নারীর পক্ষে স্নেহই যথেষ্ট। তাই নিয়ে তারা বেশ দিন কাটাতে পারে—কিন্তু পুরুষের তা অসহ্য।

বিমল কি বলিতে যাইতেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছোট একটি শব্দ হইল—হ্যা—চ্ছো—ও—এবং সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া কল্যাণী বলিল—বাবা ! ও হুটোতে কি রাঁধ্‌ছে ! ফোড়নের গন্ধে যে বাড়ী ভরে গেল !

কল্যাণী হল হইতে চলিয়া যাইবার পরই দেখা গেল মুনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, হাত আড়াল দিয়া দুইবার হাইও তুলিল, তাহার পর উঠিয়া হলের দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে দেখিতে দেখিতে একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া এক সঙ্গে দুই তিন ধাপ্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া কল্যাণীর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে আসিয়া একটি চেয়ারে অত্যন্ত শান্ত শিশুটির মত বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই কল্যাণী আসিয়া তাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার আর পোষাবে না।

মুনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি ?

কল্যাণী। পোষাবে না, ব্যস্‌।

মুনি। আমি কি করেছি ?

কল্যাণী। কিছু না, তাই ত তোমার সঙ্গে আমার পোষাবে না বলেছি.—আমিই সব কর্‌ব, আর উনি কিছু কর্‌বেন না, কি ক'রে পোষাবে ?—অন্য ছেলে হ'লে কত মৎলব খাটাত কত চিঠি লিখ্‌ত, কত উপায়ে দেখা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত—তুমি এ সবের কিছু করেছ ?

মুনি স্বীকার করিল সে কিছুই করে নাই। শেষে বলিল—দেখ, তুমি নিজে যে সব উপায় ঠিক কর তা এমন সহজ আর চমৎকার যে আমাকে কিছু ভাব্‌তেই হয় না। এই দেখ না, সেদিন তুমি লিখে পাঠালে—Come ands tudy in the fossil section, Indian Museum, 12th, noon, positively . . . আমি সাড়ে এগারোটা থেকে সেখানে গিয়ে সব study কর্‌তে লাগ্‌লাম—তুমি সকলের সঙ্গে এসে হঠাৎ আমায় খুঁজে পেলে।—তার পর এক দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একজিবিশনে আমি সেই রাশিয়ান আর্টিষ্টএর আঁকা ছবিখানা দেখ্‌ছি, তুমি accidentally আমায় খুঁজে পেলে।—চিড়িয়াখানায় সেই অশোক গাছের তলায় বিরহী যক্ষের মত বসে আছি হঠাৎ শুন্‌লাম—ওমা, এযে মুনি বাবু, কি আশ্চর্য্য !

কোন ঝঞ্ঝাটই আমায় পোহাতে হ'ল না। কোন 'স্কাণ্ডেল মঙ্গারে'র 'ফাদার্-ইন্‌-ল' ও কিছু বুঝতে পার্‌বে না, কারণ সর্ব্বদাই আমরা দলে ভারি থাক্‌তাম।

কল্যাণী। এমনি ক'রেই কি চিরদিন চল্‌বে নাকি ?

মুনি। নিশ্চয়ই না।

কল্যাণী। তার আয়োজন কি কর্‌ছ শুনি ?

মুনি। আয়োজন ?

কল্যাণী। হ্যাকা, propose কর্‌বে ত ?

মুনি। Propose ? আর তুমি যদি dispose ক'রে দাও ?—

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আচ্ছা আগে কর-ই ত তার পর দেখা যাবে।—

মুনি। Dispose কর্‌বে না ত ?

কল্যাণী রাগিয়া বলিল—তা যদি বলেই দেবো তাহ'লে তোমার propose করার ত দরকারই নেই?—আংটিটা এনেছ?

মুনি তাহার জামার ভিতর হইতে ছোট একটি বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীর হাতে দিল। কল্যাণী আংটি বাহির করিয়া মুনির হাতে দিয়া বলিল—আমার পায়ের কাছে বসে হাত জোড় ক'রে propose কর—

মুনি। কি বলতে হয়?

কল্যাণী। আচ্ছা এক আনাড়ীর পাল্লায় পড়েছি বাবা। জান না কিছু?

মুনি। বা! কি ক'রে জানব? আমি কি কখনও propose করেছি নাকি?

কল্যাণী একটু ভাবিয়া বলিল—তাও ত বটে! আচ্ছা আমার ওটা শোনা আছে, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—কেমন?—

মুনি খুসী হইয়া কল্যাণীর পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া propose করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কল্যাণী বলিল—বল—আমি, তুমি কি—তুমি কি আমাকে—আমাকে তুমি কি তোমার—বলছ না যে?—

মুনি। তুমি অমন সুন্দর ক'রে বলছিলে—তাই আর interrupt করিনি।

কল্যাণী। বটে?—ভাগো disposed—

মুনি ভীতভাবে বলিল—এই মজালে!—না কল্যাণী রাগ কোর না, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, ভয়ানক কষ্ট হবে। এমনিতেই বেশীক্ষণ না দেখলে অস্থির হ'য়ে উঠি তুমি জান না—

কল্যাণী। আচ্ছা তোমায় ক্ষমা করলাম। ওতেই propose করার কাজ হয়েছে।

মুনি। হয়েছে? তাহ'লে আংটিটা পরিয়ে দিই?

কল্যাণী। তোমার মা বাবার মত নিয়েছ?

মুনি মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল! মাথা নাড়িয়া জানাইল সে মত লয় নাই।

কল্যাণী। তাহ'লে ত হ'তে পারে না।

মুনি। বাঃ কিন্তু হ'তেই হবে যে!

কল্যাণী। তাঁদের না জানিয়ে কি ক'রে হবে, তুমি তাঁদের বল।

মুনি। ও বাবা!

কল্যাণী। কেন?

মুনি। বা! আমি বিয়ে করতে চাই, এ কথা কি ক'রে বল্‌ব? তা ছাড়া চারু বাঁদ্‌রীটা এমনিতেই যা করে, এ কথা শুন্‌লে ত আমার মাথা পাগল করে ছেড়ে দেবে?

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—তা হ'লে আমি গিয়ে তাঁদের বলি যে আপনার গুণধর ছেলে আমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আমাকে তাঁর বৈধ পত্নীরূপে সম্প্রদান করতে এসেছি—

মুনি। ধ্যেৎ।

কল্যাণী। যাই হোক এত দিনে আমার একটা কাজে তোমার অসম্মতি দেখে মনে হচ্ছে—পতি দেবতার আবির্ভাবের সূত্রপাত তোমার মধ্যে আরম্ভ হয়েছে।

মুনি কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ জগৎটা দুঃখ অশান্তি দিয়ে ভরা তা স্বীকার করি, কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের জীবন কি এমনি সহজ সুন্দর সরলতার ভিতর দিয়ে কেটে যেতে পারে না কল্যাণী? এতখানি সুখ আশা করা অন্যায় তা মানি কিন্তু তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাক আমার বুকটা যে কি খুসীতে ছাপিয়ে ওঠে কি বল্‌ব।—

কল্যাণী উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মুনির চেয়ারের 'আর্‌মে' বসিতেই মুনি তাহার গালে হাত দিয়া মুখখানি আপনার মুখের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া মুগ্ধভাবে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ডাকিল—কল্যাণী—

কল্যাণী সহসা উঠিয়া মুনির নাকে আঙ্গুল দিয়া আঘাত করিয়া বলিল—এই খবরদার অমন আদর ক'রে এখন কথা ব'ল না, ভয়ানক লোভ লাগে—

মুনি হাসিয়া বলিল—তবে কখন বল্‌ব?

কল্যাণী। আগে তোমার মা বাবাকে হাত করি, তার পর।

মুনি। কি ক'রে শুনি।

ক্যাণী। ভাব্‌ছি, একদিন রিলিফ ফণ্ডের চাঁদা আদায় কর্‌তে বেরুব। বাড়ীতে থেক কিন্তু খবরদার সাম্‌নে এসো না, আমায় চিন্‌তেও পেরো না, বুঝেছ? Next Wednesday কি বল?—

মুনি হাসিয়া বলিল—রাজী।

নীচে নামিয়া আসিয়া কল্যাণী মুনিকে বলিল—তুমি ওদের কাছে যাও আমি একবার রান্না ঘরে গিয়ে ও ছুটোকে দেখে আসি—শান্তাটা যে হাঁদা,

হয়ত কেবল খুন্তি নেড়েই সময় কাটিয়েছে—যেন ওদের রাঁধাবার জন্যেই ডেকেছি।

মুনি। আর যদি কিছু হ'য়ে গিয়ে থাকে ?

কল্যাণী। আজ আমাদের Engagementএর semifinal হ'ল ত ? Finalএর দিন একটা জিনিস দেবো।

মুনি। আজ হয় না ?

কল্যাণী। এর বেলায় ছেলের বুদ্ধি টন্‌টনে আছে দেখ্‌ছি।—Kiss me if you can—

কল্যাণী ছুটিয়া একেবারে রান্না ঘরে গিয়া হাজির হইল এবং নিবিষ্ট মনে দুজনকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ঠিক তাই !

শান্তা। তোকে ভূতে পেল নাকি ? কি ঠিক ?—

কল্যাণী। যা বলেছি।—আচ্ছা সুপ্রকাশ বাবু, আপনি কি ভাবেন, এই সব রাঁধবার জন্যেই আপনাকে এখানে এনেছি ?

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—তা একবারও ভাবিনি।

কল্যাণী। আপনি জানেন কেন এখানে আপনাকে এনেছি ?—

সুপ্রকাশ। হাঁ। কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে সে কৃতজ্ঞতা আমার প্রকাশ করতে চাই না।

কল্যাণী শান্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই হাস্‌ছিস্ না যে ?

শান্তা। কাল হাস্‌ব।

কল্যাণী। আর আজ কি করবি ?

শান্তা। আজ এই রান্নাগুলো যাতে বেশ ভাল হয় তার চেষ্টা করব।

কল্যাণী বলিল—তুই মর্। আহা এমন্ জান্‌লে বরকে আমি ছেড়ে দিতাম না। যা বেরো আমি এই চপগুলো ভাজি। তুই একটু বাইরে গিয়ে বস্।

কল্যাণীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বাইরেটা যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া জটলা পাকাইল।—

জীবন সুপ্রকাশের কাছে আসিয়া বলিল—আঃ তোফা গন্ধ বেরিয়েছে রে ! প্রকাশ, আমার বিরহ যে উথলে উঠ্‌ল ভাই !—কখন খাওয়া হবে ?

জীবনের কথায় কল্যাণীর প্রথম মনে হইল যে মা বাড়ী থাকিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই চা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সে বলিল—এই শান্তা,

এখন রান্না রাখ, ঐ কেট্‌লিটায় জল চাপিয়ে দে চল্ চা খাওয়া যাক আগে— সুপ্রকাশ বাবু, ছাড়ুন খুন্তি বেড়ি—

কল্যাণী সকলকে টানিয়া খাইবার ঘরে আনিয়া জড়ো করিল।

সন্ধ্যার পর প্রবোধ এবং মনীষার সহিত বীরেন্দ্র করুণা সুবর্ণ নগেন্দ্র প্রভৃতি সকলে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাত্রি বারোটা বাজিল না, তরকারী পুড়িল না, কাহারও হাতে একটা ফোস্কার চিহ্ন নাই! সজ্জিত টেবিলের দিকে তাকাইয়া নগেন্দ্র বলিলেন—ডিনার টাইমে চিড়িভাতি! ব্যাপারটার কিছু নূতনত্ব আছে।

করুণা বলিলেন—এ কি সব এক জনের রান্না?

কল্যাণী। না দুজনের।

খাওয়া আরম্ভ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রবোধ বলিয়া উঠিলেন— A walking stick to fish and a brooch to meat —

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—বাঃ চমৎকার হ'ল! শান্তা লাঠি হাতে ক'রে ঘুরে বেড়াবে আর সুপ্রকাশবাবু তাঁর পাঞ্জাবীতে ব্রোচ আট্‌কে—

প্রবোধ। যাই হোক, ওদের ইচ্ছে হ'লে ওরা ওদুটো অদল বদল ক'রে নিতে পারে—কি শান্তা, রাজী?

শান্তা। সত্যি এত ভাল রান্না হয়েছে?—

উমা। আহা নেকি! মুখে দিয়ে দেখ্‌না—বেড়ে ঝাল্ ঝাল্ হয়েছে, না রে কমলি?—

কমলার চোখের দৃষ্টি কিছু ক্ষীণ কিন্তু তাহার সুন্দর চোখ দুটির শোভা নষ্ট হইবার ভয়ে কোন দিন চশমা ব্যবহার করে না। সে একাগ্রমনে কাঁটা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—বাজার কাঁটা যেন এই কইমাছগুলোতে এসে জুটেছে! কেন রে বাপু তোরা যদি চিংড়ির মত নিষ্কণ্টকী হতিস্, কি ক্ষতি হ'ত?—

নগেন্দ্র প্রকাণ্ড একজোড়া ডিম বাহির করিয়া সজল চক্ষে গদগদকণ্ঠে বলিলেন—There lies the mystery কমল, there lies the mystery,—জীবনবাবু—

নগেন্দ্রের কথা শেষ হইলে একটি ভরাট মুখের অস্পষ্ট শব্দ হইল—ওলুন্—'

নগেন্দ্র। নাঃ এমন কিছুই নয়, এমন সুসময়ে আপনি আমার পাশে

আছেন জেনে বড় তৃপ্তি পেলাম।—শ্রীশ তোমার কি 'প্যাসিভ্ রিজিস্টান্স' চলেছে নাকি?

শ্রীশ সংক্ষেপে উত্তর দিল—আমার এখন মর্‌বার সময়ও নেই।

নগেন্দ্র। বেশ বেশ—ওহে বিকাশ—বিমলবাবু, আছ ত সবাই?—

নিরুপমা হাসিয়া বলিলেন—এগুলিকে তোমার চেলা ক'রে নিয়েছ নাকি?

নগেন্দ্র। জলেই জল বাঁধে। ওরা সকলে নিজগুণেই ধন্য হ'য়ে উঠেছেন আমাকে আর বিশেষ কিছু করতে হয় না।—ডাক্তার সাহেব, ছোড়্‌দি আর ওর-নাম-কি, যে যেখানে আছ সবাইকেই স্মরণ কর্‌ছি, আমার পাত্ বুঝি খালি হ'য়ে গেল!—

কল্যাণী। তুলে নাও না, সাম্‌নেই ত রয়েছে সব।

নগেন্দ্র। আবার তুলে নিতে হবে?

টেবিলের উপরে যখন এইভাবে হাসি কোলাহল চলিতেছে, টেবিলের নীচেও তখন একটি বড় চমৎকার মূক অভিনয় হইয়া যাইতেছিল। কল্যাণী এবং মুনির পা ছুটি পরস্পরের সঙ্গে কখনও জড়াইয়া কখনও চাপিয়া কখনও ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া কত কি ভাব যে ব্যক্ত করিতেছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হঠাৎ এক সময়ে কল্যাণী আপনার পা সরাইয়া লইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে খুঁজিতে খুঁজিতে যাহাকে ধরিয়া মুনি আবেগের সঙ্গে চাপ্ দিল, তাহা ঠিক কল্যাণীর বলিয়া মনে হইল না! এবং সঙ্গে সঙ্গেই নগেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—ওটা আমার মুনিবাবু কল্যাণীরটা একটু বাঁ দিকে। তাহার পর নির্ব্বিকারভাবে খাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মুনি রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বিষম খাইল।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'ল গো?—

নগেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন—ও আমাদের jurisdictionএর বাইরে।

স্বর্ণ সংস্তক্ষণই মায়াকে দেখিতেছিলেন তার হাব ভাব তাঁহার কাছে যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল'—এত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত তাহাকে বড় একটা দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সে বিমলের দিকে তাকাইতেছে বিমল কোন দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাইয়া চলিয়াছে। খাওয়াটা তাহার কাছে যেন শাস্তি বলিয়া মনে হইতেছে।

বিমল এবং মায়াকে দেখিতে দেখিতে সুবর্ণের মনে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বিমল বলিল—বড় মাসী আমার এই ডিসটাতে কিছু স্যালাড্ দিন না? এমন সুন্দর রান্না হয়েছে, কিন্তু খেতে পার্‌ছিনা, ভাল ক্ষিদে হয় না।

সুবর্ণের মন হাল্কা হইয়া গেল। বলিলেন—ক্ষিদের অপরাধ? রাতদিন অমন ক'রে খাট্‌লে শরীর থাকে?—আমি না হয় তোমার পর কিন্তু করুণার কাছে ত আজ চার বছর সমানে আছ, ওর কথাও কি শুন্‌তে নেই?—তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে ও পাগল হ'য়ে থাকে, আর ছেলে তুমি সময়ের ওজর দেখাও?

করুণা। না, আমি আর ওকে কিছু বল্‌তে চাই না দিদি—না বিমল, আমি তোমাকে কিছু বল্‌লাম না, তুমি আমাদের পর হ'তে পর।

করুণার অভিমানের সুর তুলিয়া লইয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—আমরা কেউ না তোমার, আমাদের প্রেস্‌টা দেখ্‌বার জন্যেই তুমি আছ, আর তার জন্যে তুমি—

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া পাতের ব্যঞ্জন ইত্যাদি লইয়া নাড়া চাড়া আরম্ভ করিলেন।

স্নেহ এবং প্রেম সম্বন্ধে যে না-বলা কথাটি বিমলের বুকে দিন রাত্রি অশান্তি জাগাইতেছিল, মায়াকে যাহা বলিতে গিয়া আজ সন্ধ্যাবেলা সে মনকে সংযত করিয়া লইয়াছে। প্রেমকে বড় করিয়া দেখিতে গিয়া যে স্নেহকে সে বুকে স্থান দিতে চাহে নাই, সেই স্নেহকে আজ চারিদিক হইতে এমনভাবে তাহাকে ঘিরিয়া মায়াজাল বিস্তার করিতে দেখিয়া বিমল মুগ্ধ হইয়া গেল। স্নেহ যে কত প্রবল, স্নেহ যে কত পবিত্র, স্নেহ যে মানুষের জীবনের কত বড় আশ্রয় আজ তাহা যেন সে বুঝিতে পারিল। অপরাধীর মত বলিল—আর কিছু আমায় বল্‌তে হবে না। আপনাদের এ স্নেহের অপমান আর আমি কর্‌ব না ছোট মাসী!

নগেন্দ্র আপনার মনে বলিলেন—আহা জুড়িয়ে গেল!

প্রবোধ। কি? কাণ না জিভ্?

নগেন্দ্র। খাবার সময় কাণ? আরে ছোঃ—জিভ জুড়িয়ে গেল! রসগোল্লার পায়েসে জিভটা কি রকম হ'য়ে যায় দেখেছ?—

২০

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের আলো না জ্বালিয়া শান্তা চুপ করিয়া একটা সোফায় বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি সাম্‌নের পথের দিকে নিবদ্ধ। সময় যেন আর কাটে না, মাঝে মাঝে মনে তাহার ভয় জন্মিতেছে—যদি সে না আসে? . . .

কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিতে সে পারিতেছিল না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে সে যেন অনুভব করিতেছিল। ইহারই নাম প্রতীক্ষা! এমন করিয়া জীবনে সে আর কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে নাই! সহসা একটি কালোছায়া পথ হইতে বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া হলের দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল!

আনন্দে শান্তার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও কয়েক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—এস আমার ঘরে চল।

সুপ্রকাশ বলিল—আপনি অন্ধকারে এমন একা বসে আছেন যে?

শান্তা। কাল বাড়ী ফিরে বৌদিকে বলেছিলাম, তুমি আজ আস্‌বে, তাই তার বায়স্কোপ দেখ্‌বার ঝোঁক চাপ্‌ল। দাদা আর মাকে টেনে নিয়ে গেছে! ফের্‌বার সময় 'মারকেট্'ও হ'য়ে আসবে। সম্ভবত ৯টার আগে ওদের ফের্‌বার আশা নেই আমাকে বলে গেছে তোমাকে ধরে রাখ্‌তে। সে এসে আজ রাতে এখানে খাবার জন্তে তোমায় নেমন্তন্ন কর্‌বে।—কিন্তু আবার আমাকে 'আপনি' বলে কথা বল্‌ছ যে?—

সুপ্রকাশ। কাল অনেক বার আপনাকে তুমি বলেছি, নাম ধরেও ডেকেছি কিন্তু পরে বড় অনুতাপ হয়েছে, আজ আমার কথা শেষ হ'লে যদি অনুমতি দেন তাহ'লে আবার শান্তা বলে ডাক্‌ব—কেমন?

শান্তা সুপ্রকাশকে তাহার ঘরে আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া বলিল—বল তোমার কথা।

সুপ্রকাশ। কিন্তু আলো জ্বাল্‌লেন না যে?

শান্তা। বিশেষ দরকার আছে কি?

সুপ্রকাশ। আছে।

শান্তা। কি?

সুপ্রকাশ। আমি আমার কথা বল্‌তে বল্‌তে আপনার মুখের দিকে তাকাব। আপনি আমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মুখের দিকে তাকাবেন। তাই আলোর দরকার আছে শান্তা দেবী।

শান্তা নিঃশব্দে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া পুনরায় সুপ্রকাশের পাশে বসিয়া বলিল—বলুন—

সুপ্রকাশ। আর একটি অনুরোধ শান্তা দেবী, আ নি দয়া ক'রে আমার কাছ থেকে কিছু দূরে বসুন। জানেন ত মানুষের দুর্ব্বলতার শেষ নেই, হয়ত আমার কথা সব না বলেই আপনার হাত খানা ধরে ওর মধ্যে আশ্রয় খুঁজ্‌ব।

শান্তা তাহার চেয়ার সরাইয়া লইয়া কিছু দূরে গিয়া বসিল।

সুপ্রকাশ শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল এমন ক'রে কারো সামনে বসে আমার কথা বল্‌তে হবে তা ভাবিনি কোন দিন শোন্‌বার মত, শোনাবার মত কোন মানুষ এ জগতে আছে তাহাও বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি আপনার বেশী সময় নেবো না। কিন্তু এসব কথা বলা এত শক্ত, কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ কর্‌লে নিজেকে ঠিক ক'রে প্রকাশ করতে পার্‌ব তা জানিনা তবুও আমি আরম্ভ করছি।

সুপ্রকাশ একবার তাহার কপালে হাত বুলাইয়া লইয়া বলিল—আমার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনা, কয়েক বছর পূর্ব্বে থেকে একটা সত্য বড় বেশী করে আমার সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল—আমি সাধারণত বিবাহিত মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয়! . . .

'প্রিয়' বল্‌লে হয়ত তাদের প্রতি অবিচার করা হয় তবু ওটা'ই, আমি বল্‌ছি। একটির পর একটি কি ক'রে যে আমার জীবনে এসে দেখা দিয়েছে তা আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, কারণ জানিনা।

তাদের সব চেয়ে বেশী ক'রে অনুভব করেছি তখনই, যখন তারা আবার ধীরে ধীরে আমার জীবনের পথ হ'তে দূরে সরে গেছে। তাদের আসা-যাওয়া আমার কাছে আজও প্রহেলিকাময় লাগে কিন্তু তাদের বিচার কর্‌বার ইচ্ছা কোন দিন আমার হয়নি, তাদের কথা, তাদের মুখ, আমার মনে আজও বেশ স্পষ্ট হ'য়ে আছে কিছু ভুলিনি,—হয়ত তা সম্ভবও হবে না।

তাদেরই মধ্যে একজনের কাছে আমার হার হ'ল,—সে আমায় জয় কর্‌ল, রূপ দিয়ে নয়, চোখের জলে।

মানুষ অমন ক'রে কাঁদতে পারে, আমারই জন্যে? এই কথাটা নিয়ে দিনের

পর দিন মাসের পর মাস আমার কেটে গেল। আর তারই সঙ্গে আমার মধ্যেকার প্রবল আমিত্বটুকুর একেবারে সমাপ্তি হ'য়ে গেল! . . .

এই সমাপ্তির কথাটা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, ওটা অনুভব কর্‌বার, বোঝাবার বা বল্‌বার নয়।

যেদিন জাগ্‌লাম, সেদিন বুকে আমার দারুণ তৃষ্ণা, চোখে আমার নেশার ঘোর, বিশ্বজগৎ আর যা-কিছু সব আমার মন থেকে মিলিয়ে গেছে . . .

তাকে বল্‌লাম এবার কি কর্‌বে?

সে বল্‌ল—ভাব্‌ছি।

আমি বল্‌লাম—ভাব্‌বার সময় নেই।—চলে এস।

সে বল্‌ল—তাও কি হয়, আমি যে চার দিক দিয়ে বাঁধা! ও ছেঁড়্‌বার আমার শক্তি নেই।

তবে এলে কেন?—

তোমাকে পাব বলে।

আমাকে অপমান কর্‌বে বলে।

না।

হয়েছে পাওয়া?

হয়েছে। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা রাখ্‌বার ঠাঁই আমার বুকে নেই।

আমার বুকে একটা ক্ষুধিত মানুষ পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—যে ভালবাসাকে পাবার জন্যে তোমার স্বামী, সমাজ, সন্তানকেও অস্বীকার কর্‌লে, সেই ভালবাসাকেই অপমান ক'রে চলে যাবে?—

সে কোন উত্তর দিল না।

আমি বল্‌লাম—'বন্ধু' বলে আমার বুকে চোখের জল ফেল্‌লে। 'বর' বলে আমার সেবা কর্‌লে। 'দেবতা' বলে আমার পূজা কর্‌লে, এ কথা এত সহজ ভুলে যাবে?

কোন উত্তর পেলাম না।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। শান্তা দেবী, এই আমি এই—আমার জীবন।

সুপ্রকাশ হঠাৎ থামিয়া গিয়া দেখিল শান্তা চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছে! তাহার মুখে যেন জীবনের কোন চিহ্নই নাই!

একটা দারুণ লজ্জা সুপ্রকাশের বুকে চাপিয়া বসিল। তাহার মনে হইল ঘৃণায় লজ্জায় শান্তা যেন ঐরূপ হইয়া গিয়াছে! সে শিহরিয়া উঠিল; তাহার

নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, অতি সন্তর্পণে উঠিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে যাইয়া সিঁড়ি দিয়া পথে নামিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সুপ্রকাশের কথা শুনিতে শুনিতে শান্তা কিসের আবেশে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার শক্তি ফিরিয়া আসিতেই, সে সাম্‌নের দিকে হাত বাড়াইয়া ডাকিল—প্রকাশ—

সহসা চোখ মেলিয়া ঘরে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে যেন কেমন হইয়া গেল! ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত ঘরের আলো জ্বালিয়া সুপ্রকাশকে খুঁজিল; পথে নামিয়া আসিয়া যত দূর দৃষ্টি চলে দেখিতে চেষ্টা করিল. শেষে ফিরিয়া আসিয়া সুপ্রকাশের পরিত্যক্ত চেয়ারে তাহার চাদর খানি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মা বৌদিদি এবং দাদা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শান্তা তাহার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া বিছানার শুইয়া আছে।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল। এমন ক'রে তুই শুয়ে যে?

শান্তা বলিল—আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তুই এখন আর আমায় জ্বালাস্‌নি, তোরা খেয়ে নে, আমি খাব না।

* * *

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ভোরের দিকে সুপ্রকাশ আলো জ্বালিয়া চিঠি লিখিতে বসিল, অনেকগুলি লিখিল। সবগুলি খামে বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিয়া টিকিট মারিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; সকালে ডাকে দিবে। তাহার পর বিছানায় আসিয়া শুইতেই তন্দ্রায় তাহার চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিল।

সে যখন জাগিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চাকরকে ডাকিয়া তাহার চা তৈয়ারী করিতে বলিয়া স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া একটি চামড়ার ট্রাঙ্কে তাহার কাপড় জামা গুছাইয়া লইতে লাগিল।

সে যখন এই সমস্ত ব্যাপারে ব্যস্ত তখন একজন মানুষ যে কখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই!

অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল—প্রকাশ—

সুপ্রকাশ হাতের কাজ ফেলিয়া ফিরিতেই শান্তাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বলিল—আপনি এত সকালে?—

শান্তা সুপ্রকাশকে দুই হাতে জড়াইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—কাল অমন ক'রে আমায় ফেলে এলে কেন ? . . . কান্নায় তাহার কথা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুপ্রকাশ কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে শান্তার মুখটিকে ধরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া শান্তার মুখের উপর পড়িতে ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রী—

তুমি প্রাণে

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

আজি প্রাণে, তুমি প্রাণে
তুমি এসেছ চিত্ত প্লাবিয়া পরশে ঘ্রাণে।
বহিছ বেদনে ঝরিয়া, দেহ ভরিয়া,
বাসনার ঘন বরষার অবসানে
এসেছ আঁধার লোহিয়', ব্যথা মোহিয়া
নির্ব্বাণে ঘেরা চেতনার মাঝখানে।

ঘাটের পথে

—শ্রীহরিপদ বসু

১১

পাঁচ মাস হ'তে চল্‌ল. তিনি আমাদের বাড়ী থেকে গেছেন। এর মধ্যে বাবা অনেক জায়গায় খোঁজ করেছেন, কিন্তু. কোথাও তাঁর সন্ধান মিল্‌ল না। তাঁদের দেশ—আমার শ্বশুর বাড়ী. সেখানেও লোক পাঠিয়েছেন কিন্তু, সেখানে তিনি নেই! যে লোকটা আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল, সে ফিরে এসে বল্‌লে,—গ্রামের লোকের কাছে সংবাদ পেয়েছিল, ক'দিন আগে নাকি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন. তখন তাঁর মায়ের অসুখ। কিন্তু আমার শাশুড়ী মর্‌বার পরদিন থেকে কেউ আর তাঁকে সে বাড়ীতে দেখ্‌তে পায়নি! এই সংবাদটুকু নিয়েই সে চলে এসেছিল।

যেদিন তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন, লোক যেতে তার দুদিন দেরী হ'য়েছিল। বাবা মনে করেছিলেন, হয়ত তিনি এই কল্‌কাতাতেই দুএকদিন দেরী কর্‌তে পারেন। তাঁর মায়ের অসুখটা তাঁকে যে এম্‌নি ক'রে বাড়ীতে টেনে নিয়ে যাবে, সে কথা বাবা একেবারেই ভাবেন নি।

আর কিসের মায়া? আপনার জন বল্‌তে জগতে এতদিন তাঁর যা কিছু ছিল. সব যে তিনি সেই গঙ্গার তীরে চিরদিনের মত রেখে এসেছেন। স্নেহ, আত্মার মমতার যেটুকু জায়গা ছিল, সে যে তিনি হারিয়ে বসেছেন, তবে আর কিসের জন্যে তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন? সংসারে তাঁর অত বড় ভালবাসার জিনিষটুকু ছিল ওই ক্ষুদ্র কুটীরখানি। আজ মনে হচ্ছে, যদি সেদিন আমি তাঁর সঙ্গে যেতুম, তাহ'লে কিছুতেই তিনি এমনভাবে যেতে পার্‌তেন না। সেই নির্জ্জন পুরীতে আমায় আর খোকাকে শুধু ফেলে রেখে যেতে. তাঁর প্রাণে একটুও মায়া হ'ত। কেনই বা সেদিন তাঁর সঙ্গে গেলুম না! তাঁর মায়ের মরণের দিন, তাঁর সেই তাপদগ্ধ মুখখানি আমি আমার চোখের সাম্‌নে এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আর যেন আমার মর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে। মানুষে এম্‌নি ক'রেই কি পদে পদে

ভুল ক'রে বসে ; তাঁর সেই বেদনাভরা হৃদয় আরও যে ব্যথা পেয়েছিল, তা ভেবে আজ আমি আকুল হ'য়ে যাই। মনে হয়, ছুটে গিয়ে চোখের জলে তাঁর পাদুখানি ভিজিয়ে দিই, কিন্তু কোথায় যাব? এত বড় সংসারের মাঝে এই বিরাট্ বিশ্বে কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাব?

তাঁর চলে যাওয়ার তিন দিন পর থেকে মার মাথার ভিতর যে কেমন ক'রে উঠ্‌ল, আর তারপর সেই যে তিনি বিছানা নিলেন, আজও পর্য্যন্ত উঠ্‌লেন না। তাঁর চলে যাবার পর থেকে বাবার মনও ভাল ছিল না কেমন যেন সব কাজেই তাঁর উদাস ভাব, এ আমি লক্ষ্য করেছিলুম।

সে দিন সকাল বেলা বাবা কি একখানা বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়্‌ছিলেন, আমি তখন সেখানে বসে। বাবা প্রথম পাতা পড়েই পরের পাতাখানা পড়্‌তে যাচ্ছেন, এমন সময় বড় বড় অক্ষরে "এম্, এ, পরীক্ষার ফল" এই হেডিং দেখ্‌তে পেয়ে, মনটা যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল। আজ তাঁরও এম্.এর খবর বেরুত ; আজ যদি তিনি আমাদের বাড়ী থাক্‌তেন, তাহ'লে তিনিও আজ সেবার-কার মত হাসিমুখে সবাইকে তাঁর পাশের খবর দিতেন, শুধু এই ছুটো কথা মনে হ'ল। আমি ত জগৎ ছাড়া নই। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এই যে এম, এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে ! তাই শুনে, বাবা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে পৃষ্ঠা বেশ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে, শেষে সেই নাম সেই কলেজ সবই দেখ্‌লেন ; কিন্তু সন্দেহ গেল না। সে নাম ত অনেকেরই আছে ! সে নামের আর একজনও ত সেই কলেজে থাক্‌তে পারে ! এবার বাবা তাঁর ক্রমিক নম্বর ও জান্‌তেন না যে, তা নিয়ে এর তদন্ত কর্‌বেন। তা ছাড়া তিনি পরীক্ষা দিয়েছেন কি না, এও এক সন্দেহ। এম্‌নি সন্দেহ দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে আমাদের সবারই দুদিন কেটে গেল।

আমি তখন একখানা বই নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়্‌ছি, আর খোকা সাম্‌নেই শুয়ে খেলা কর্‌ছে। এম্‌নি সময় পিয়ন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। মা চিঠিখানা পেয়ে আমায় ডেকে পড়্‌তে বল্‌লেন। মার তখন বড় অসুখ। যাহোক্, মা ডাক্‌তেই তাঁর কাছে গিয়ে যা দেখ্‌লুম, তাতে একেবারে চম্‌কে গেলুম।—একি! আমার নামে চিঠি! এমন সময় আমার নামে পত্র লিখ্‌বার সত্যিই আমি কাকেও খুঁজে পেলুম না। মা আমার বিস্মিত ভাবটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বল্‌লেন—কার চিঠি রে? আমি জড়িত কণ্ঠে শুধু বল্‌লুম—আমার। আজ এই 'আমার' কথাটা যে আমার কাছে কত মধুর,

কত আপনার. সেদিন তা বুঝিনি বটে, কিন্তু, আজ বুঝ্‌তে পারছি, তাতে কত প্রেম, কত ভালবাসা, কত জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ জড়িত হ'য়ে আছে। সেই 'আমার' কথাটি আজ যত প্রাণভরে আমি উপভোগ করতে পারি. এই তিনটি অক্ষরের ভিতর যা আছে, তা আজ যত প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারি, আগে তা সম্ভব হয়নি।

যাক্, এক মস্ত বড় সন্দেহ নিয়ে, আস্তে আস্তে চিঠিখানা খুলে ফেল্‌লুম। তারপর অবাক—তাঁরই হাতে লেখা। এতদিন পরে কেন যে আমাকে তাঁর মনে পড়্‌ল, তখন তাই শুধু আমার মনে হচ্ছিল। তারপর, মনে মনে পত্রখানা বেশ করে পড়্‌লুম। মা এর মধ্যে কতবার জিজ্ঞাসা করেছেন—কে লিখ্‌লে? কিন্তু সে কথা আমার মুখফুটে কিছুতেই বেরুল না। তারপর যখন পড়া শেষ হ'ল, তখন শুধু বল্‌লুম—এম, এ পাশের খবর, এবারও প্রথম। বলেই আর মার দিকে না তাকিয়ে, সেখান থেকে দৌড়ে খোকার কাছে পালিয়ে এলুম। বাড়ীময় সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়্‌তে বেশী দেরী হ'ল না।

খোকার কাছে এসে খোকাকে বারবার চুমু খেলুম, তারপর আর একবার সেখানা পড়্‌লুম। সে যে কি মধুমাখা লেখা, তা আমি বল্‌তে পারিনে। তাঁর সেই ভাব, সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা, এখনও তাঁর সেই আগেকার যা কিছু সবই যেন তেম্‌নিভাবে এখনও তাঁতে বর্ত্তমান। সেই বি, এ, পাশের দিন আমায় যেম্‌নিভাবে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, আজও এই চিঠি খানিতে যতটা সম্ভব তেমনিভাবে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিয়েছেন। তার প্রতি ছত্র এমন মধুর, প্রতি বাক্যবিন্যাস এমন স্নেহেভরা যে, আজও যখন মাঝে সেই চিঠিখানা পড়ি, তখনই যেন তাঁরই ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকি। সে চিঠিখানাতে রাগের একটুও লেশমাত্র নেই. একটুও অসন্তোষের ভাব তার একটা কথায়ও প্রকাশ করেন নি! সেই চিঠিখানা—আজ সে আমার বুকের রক্তের বাড়া, জগতে যা কিছু প্রিয়, যা কিছু মূল্যবান্, আজ সেই চিঠিখানা, এমন কি তার একটা কথাও সবচেয়ে আমার কাছে বেশী।

কপটতা, প্রতারণা কোনদিনই তাঁতে ছিল না, তাই তিনি অকপটে তাঁর জীবনের এই ছমাসের যা কিছু যতটা সম্ভব সব আমায় এই ক্ষুদ্র পত্রখানিতে জানিয়ে ছিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর ঠিকানাটি দিতেও ভুলে যান নি। মা তাঁর সংবাদ জান্‌তে পেরে যে কত সুখী হ'লেন, সে আর কি বল্‌ব। তখন মার প্রায় শেষ অবস্থা। জীবনের সব কাজ গুলো সেরে ফেলে মা বোধ হয়

মার দুদিনবাদে চিরবিশ্রাম নেবেন। এমনিভাবেই বোধ হয় সবারই জীবন গড়া। সবাইকে বোধ হয় এম্‌নি আস্তে আস্তে শান্তভাবে, সবকাজ সেরে ফেলে ঘুমিয়ে পড়্‌তে হয়, এই বুঝি জগতের রীতি। আমার মাও তখন তাঁর সেই যোগাড় কর্‌ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো শুধু পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকৃত, আর মাঝে মাঝে দু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস কি-জানি-কার অভাব জানিয়ে দিত। এমনি দেহের অবস্থা নিয়ে মা যখন তাঁর খবর জান্‌তে পেরে-ছিলেন, তখন কেমন একটা আনন্দের জ্যোতি তাঁর সেই রোগক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ-খানিতে ফুটে উঠেছিল; তা দেখে আমারও আনন্দ হচ্ছিল। মা তখনই উঠে একটা বালিশে ভর দিয়ে, তাঁকে আস্‌বার জন্যে, নিজে হাতে অতি কষ্টে দুছত্র লিখে দিয়ে বাবাকে একটা লোক পাঠাতে বল্‌লেন। মার স্নেহের আহ্বান তিনি উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না বলেই, তিনি নিজে হাতে লিখেছিলেন। তা না হ'লে, আজ কয়বৎসরের মধ্যে তাঁকে আমি লিখ্‌তে দেখিনি।

তাঁর এম, এ, পাশের খবর শুনে বাবাও খুব সুখী হ'য়েছিলেন, কিন্তু, সেবারকার মত আর তাঁর তেমন আনন্দ দেখ্‌তে পাইনি। কেমন যেন মনমরা ভাব তাঁর সেই ম্লান মুখখানা আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিত। আজ এই সব কথা গুলো মনে হ'লে আমার যেন আর একদণ্ড এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমনি লগ্নে এমন কপাল নিয়ে জন্মেছিলুম যে আমার বল্‌তে যা কিছু এ সংসারে আমার আছে, সবাই যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে শাপগ্রস্ত জীবন নিয়ে এই সারা দুনিয়াময় আমার মত এক বিষের জ্বালা বুকে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মার ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পার্‌লেন না। তিনি আমাদের বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু, তাঁকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম! আজ যেমন ভাবে নিঃসঙ্কোচে তাঁকে আমাদের বাড়ী ঢুকতে দেখ্‌লুম, তাতে আশ্চর্য্য না হ'য়ে কেউ থাকতে পারে না। যেন কোথাও কিছু হয় নি, হৃদয়ের মাঝে একটুও যেন কখনও কোনও দাগ পড়েনি আস্‌বার সময় বাইরে বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল, কাজেই তিনি বরাবর মার ঘরে—যেখানে মা শুয়েছিলেন একেবারেই সেখানে এসে হাজির হ'লেন। যেন ঠিক সেই আগেকার ভাব। কোথাও একটুও তার বাধ-বাধ ঠেক্‌লো না! সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে চিরদিনের মত যেন একখানি ছবি হ'য়ে আঁকা রয়েছে। সে কি সরল, কি যেন আমার চোখের সাম্‌নে ভাসছে। সুন্দর শান্ত সেই মুখখানা দেখ্‌লেই বোধ হয় যেন শত সহস্র ক্ষমার একমাত্র আধার ওই শান্ত স্থির মুখখানিতে প্রতিফলিত হ'য়ে আছে!

তিনি ঘরে ঢুক্‌তেই আমি ধুড়মুড়িয়ে উঠে, আমার কাপড় চোপড় এখানে ওখানে টানতে টানতে অন্ত দোর দিয়ে পালিয়ে গেলুম। মা তখন চোখ বুঁজেছিলেন। হঠাৎ, আমার এমন ব্যস্ততা বুঝ্‌তে পেরে, চোখ চেয়ে দেখ্‌লেন তিনি! আনন্দে মার ছুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। আমি দোরের আড়ালেই ছিলুম, শুন্‌তে পেলুম, মা ব'লছেন—এমন ক'রে বুড়ো মাকে ভুলে থাকৃতে হয় – ? মার অবস্থা দেখে তিনি অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মা তাঁকে কাপড় জামা খুলে হাত পা ধুতে বল্‌লেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর সেই আগেকার ঘরটীতে যেন অতি সঙ্কুচিতভাবে ঢুক্‌লেন। তাঁর সেই ঘর—আজও তেমনি আছে তাঁর সেই বইগুলো এলোমেলোভাবে আগেকার মত ছড়ান ছিল, একটুও এদিক্ ওদিক্ হয়নি। প্রথম, ঘরে পা দিতেই তাঁর সেদিকে নজর পড়্‌ল, আর চোখ দিয়ে টস্‌টস ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর ছুদিন কেটে গেল। ছুটো দিন তাঁকে একটিবারও চোখের পাতা বুঁজ্‌তে দেখিনি। সে যে কি স্থির শান্তভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছুটো দিন মার শিয়রে বসে তিনি তাঁর সেবা করেছিলেন, সে কথা বল্‌তে আমি ভাষা খুঁজে পাইনে। মানুষের এত ধৈর্য্যও থাকে। সেই যে সকাল থেকে একভাবে এক জায়গায় বসে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছেন, একটুও কি বিরক্তি আসে না, একটুও আলস্য হয় না, এই ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই! পুরুষ মানুষ যে এমনভাবে সেবা কর্‌তে পারে, তা আমার কোন দিনই বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু, সে দিন তাঁকে যা দেখেছিলুম, তাতে আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেছে।

তার পরের কথা মনে কর্‌তেও চোখে জল আসে। মার সেই কালীঢালা মুখখানা দেখে যখন আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বেগ শত চেষ্টাতেও দমন করতে পারিনি, তখন সে যে কি মধুমাখা ভাষা নিয়ে তিনি স্বহস্তে তাঁর কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে ছিলেন, আজ তাই ভেবে মুগ্ধ হ'য়ে যাই, আর কি-যেন্-কাকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুলনেত্রে উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। মুমূর্ষুর সেই ম্লান যন্ত্রণাময় মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মনে তখন যে কি হচ্ছিল, আজ ত আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু, সেই অল্পবয়সে—তখনও তাতে সংযমের চিহ্ন দেখা দেয়নি ধৈর্য্যের বাঁধ পড়েনি—সেই বয়েসে তিনি যে নিজের ছুঃখকে কত কষ্টে চেপে রেখে, আমায় আর বাবাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন,

আজ আমি বুঝ্তে পারছি। দেখ্তে দেখ্তে মার দেহের স্পন্দন থেমে গেল, চোখের পাতা শিথিল হ'য়ে বুঁজে গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সরিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘুমন্ত শিশুটীর মত তাঁর সবল বাহু দুটোর ওপর তুলে হরি-বোল দিতে দিতে তাঁকে তুলসীতলায় এনে শুইয়ে দিলেন। আত্মীয় স্বজন চাকর চাকরাণী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্ল। আমিও ছুটে তুলসীতলায় মার কাছে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ অত ভিড়ের মাঝে এক পাশ থেকে কার ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়্লুম, আর এক পাও বাড়াতে পার্লুম না। সেদিনকার তাঁর সেই স্বর—সেই 'মাধুরী' শব্দটা আমায় যেন একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। তাঁর সে আদেশ লঙ্ঘন কর্তে আর যেন আমার পা উঠ্ল না, কাঠের পুতুলের মত সেইখানে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তিনি আমার কাছে এসে অতি কোমল স্বরে বল্লেন—তুমি এমন কর্লে খোকাকে কে দেখ্বে মাধুরী?—

আমি আর থাক্তে পার্লুম না, তপ্ত অশ্রু আমার দুগণ্ড ভাসিয়ে শুধু তাঁর বাধ্যতা জানিয়ে দিলে। আমি নত মুখে খোকার কাছে ফিরে এলাম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ঘসে মেজে হয় নাক রূপ, ধরে বেঁধে হয় নাক প্রেম।

"ইঙ্গিত"

মায়া

—শ্রীভূপতি চৌধুরী

পঞ্চমে সুর ধরে, গান আরম্ভ ক'রে, সুরের জাল ছিঁড়ে ফেলাটা যেমন একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা, তেম্নি খুব উঁচু আদর্শে জীবন চালাতে গিয়ে, আদর্শ ভ্রষ্ট হ'য়ে বিয়ে ক'রে ফেলাটা তার চেয়ে কম বিশ্রী ব্যাপার নয়। এখন সব কথা মনে কর্‌তে গেলে মনে, সত্যিই দুঃখ হয়, আর নিজেরই বুদ্ধির উপর রাগ ধরে।

প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ বাঙালীর ঘরে বাইশ বছরে পড়্‌তেই, মা যখন ধরে বস্‌লেন যে এইবার তাঁকে একজন সাহায্য-কারিণী এনে দিতে হবে, তখন বাঙালীর ঘরের ছেলে আমি, কেমন ক'রে মার সে প্রস্তাবে অমত করি? কিন্তু আমার এক সর্ত্ত ছিল, যে বিয়ে কর্‌ব নিজের চোখে দেখে। কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে এইখানেই আমি সবচেয়ে বড় ভুল ক'রে ফেলেছিলাম। প্রথম প্রথম মা ও দিদির মুখে 'কনে'র রূপ-বর্ণনা শুনে নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ ক'রে খালাস পেতাম, কিন্তু অবশেষে যখন মা ও দিদির পীড়াপীড়িতে 'কনে-দেখা' রূপ ভীষণ কাজটা, নিজের ঘাড়ে নিতে হ'ল তখন প্রথম যাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, তাকেই পছন্দ ক'রে আসতে বাধ্য হ'লাম। কারণ— লোকের সাম্‌নে যাচাই হওয়া ব্যাপারটা যে কি ভীষণ, তা' সেই দিনই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হ'লো। যাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, তাঁর অবস্থা যে কি রকম হ'য়েছিল তা বোঝাবার জন্যে বোধ হয় এই কথা বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে তার বাবা পর্য্যন্ত এতটা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, যে নতুন দোকানদার তার প্রথম খরিদ্দারকে ঠকাবার সময়ও অতটা ভীত হ'য়ে পড়ে না। অথচ তাঁর মেয়ে দেখ্‌তে সুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী বলে ঘরে আন্‌লে বিশেষ ঠকা হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাপের ও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে পছন্দ হয় নি বলাটা পাশবিকতার চূড়ান্ত হবে ভেবে, পছন্দ হয়েছে বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলাম।

বিয়ে হয়ে গেল। বন্ধুরা আমার আনন্দিতও হ'ল, বন্ধুস্ত্রীকে উপহারও দিলে এবং সেই সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসিতে আমায় জ্বালাতেও কসুর করেনি। উত্তরে আমি শুধু একটু ম্লান হাসি হেসেছিলাম।

কিন্তু এ তথ্য আমার অজ্ঞাত ছিল না যে আদর্শ-ভ্রষ্ট আমার মত আমার বন্ধুদের মানসীও তাঁদের বাস্তব স্ত্রীদের চেয়ে বহুগুণে সুন্দরী, কিন্তু তখন সদা-ধৃত 'জয়-মি ত্তর' আমি, আমার কিছু বলা সাজে না। কাজেই চুপ ক'রে রইলাম।

দিন কয়েক বাদে একদিন এক বন্ধু আমায় প্রশ্ন করলেন—কি বন্ধু, কাটছে কেমন?

তার উত্তরে ব্যঙ্গ সুরে বলেছিলাম—যেমন আর সবার কাটছে।

'ভাল, তা হ'লে মশগুল হ'য়ে আছ, বেশ।' বলে বন্ধু আমার চলে গেল। বোধ হয় ব্যঙ্গটা তার গায়ে লেগেছিল।

২

মশগুল,—হ্যাঁ মশগুলই হয়েছিলাম বটে, কিন্তু প্রেমে নয়, আত্মগরিমায়। গর্ব্ব এই যে মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে আমি যে ত্যাগ-স্বীকার করেছি, তা পৃথিবীর আর যে কেউ ত্যাগ স্বীকার করেছে তার চেয়ে একটুও কম নয়। ফলে আমি নিজেকে সাধারণের দল থেকে একটু উঁচু ধাপের বলে মনে করতে সুরু করেছিলাম। এই আত্ম-গরিমার গরমে আমি আমার পত্নী উষাকে বেশ একটু কৃপার চক্ষে দেখতাম এবং ধরে নিতে কুণ্ঠিত হতাম না যে, সে যাই করে সবই আমার মনোরঞ্জন ক'রে আমায় সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায়। এই ধারণার ফলে আমি কোনদিন তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলাম না। মনে ভাবতাম বিয়ে যখন করেছি তখন ওকে অসুখী করবার প্রয়োজন কি? তাকে যেটুকু দেওয়া উচিত তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। ফলে আমার জন্যে তাকে কোনো কাজ করতে দেখলে হেসে তাকে কৃতার্থ করতাম। তার কেঁপে-যাওয়া হাত থেকে পড়ে-যাওয়া পান তুলে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলতাম—এই যে আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি, তোমায় আবার কষ্ট ক'রে আনতে হবে না। সে কিন্তু আমার কথায় যে আরও জড়সড় হ'য়ে পড়ত। প্রতিদিন আমি ঘুমোলে বা শুলে পর সে অতি সন্তর্পণে আমার খাটে উঠে একপাশে জড়সড় হ'য়ে শুয়ে পড়ত।

আমাকে সন্তুষ্ট করার সে যা চেষ্টা করত অর্থাৎ 'আঃ'—ব'লে চেয়ারটার উপর অলস ভাবে ঘাড় কাৎ ক'রে বসে পড়লেই ঠাণ্ডা জল ও লেমনেডের পাত্রের ব্যবস্থা, 'উঃ' বলে ঘরে ঢুকে জামা খুলতে সুরু করলে, ফ্যানটা খুলে দেওয়া ইত্যাদি

বিসর্গ অস্তিক ভিন্ন ভিন্ন কথার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষেধকের ব্যবস্থা হওয়ায় আমি মনে করতাম যে উষা এটা করে নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরে, না আমাকে তুষ্ট ক'রে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করতে। আমার ধারণা যে এইপথ ধরে চলছিল তার কারণ কোন দিন কথাবার্ত্তায় তার মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পারতাম না এবং এর মূলে ছিল আমার আত্মগরিমা। এছাড়া তার মনের ভাব বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব যদি না সে নিজে থেকে আমাকে তার ভাব জানায়, কারণ, এটা জানা কথা যে মেয়েরা তাদের মনের কথা নিজেরা না বললে অপরের পক্ষে তা জানা অসাধ্য।

কয়েক মাস বাদে উষা তার বাপের বাড়ী চলে গেল। যাবার আগে আমাকে একটা প্রণাম ক'রে গেল। এই কারণেই বা যে কারণেই হোক সে চলে যাওয়ার পর তার অনুপস্থিতটা মনের মধ্যে বেশ অনুভব করেছিলাম, এবং বিশেষ ভাবে রাতে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখতাম বিছানাটা খালি রয়েছে। আমার বুকের মধ্যে যেন চড়াৎ ক'রে উঠত। মনে হত কে যেন এক চুমুকে আমার হৃদয়সাগরটাকে নিঃশেষ ক'রে একটা শূন্যতায় ভরে দিয়েছে। বারে বারে রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হ'য়ে উঠতাম, মনকে বোঝাতাম ও কিছু নয়, ওটা হচ্ছে একটা সঙ্গ পাওয়ার ফল। বাড়ীর অনাহূতভাবে স্থায়ী বাসিন্দা কুকুরটা হঠাৎ চলে গেলে মনটা যে কারণে শূন্যতা দেখে ক্ষুন্ন হয়, এও সেই ব্যাপার, তার চেয়ে উঁচুদরের কিছু নয়। এ ভালবাসা নয়। কিন্তু তবুও মন ত শুনেও স্থির হ'তে পারে নি। তার চাঞ্চল্যটা একটা রহস্য বলে আমি ঠিক করলাম।

৩

উষা ফিরে আসার পর, এক দিন বিকালে বেড়িয়ে এসে ঘরে বেশ আরামে বসে একটা নভেল পড়ছি। পড়াটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় আমার সেই অখণ্ড মনোযোগ খণ্ড বিখণ্ড ক'রে দিদি এসে প্রশ্ন করলেন—হাঁ রে, ব্যাপার কি?

দিদির স্বর শুনে একেবারে চমকে গিয়েছিলাম। চট্ ক'রে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করলাম যে ব্যাপারটা কি হ'তে পারে? এই দিন তিনেক হ'ল দিদি শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরেছেন; আসার পর আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে, এবং

দিদির ছেলে মেয়েদের জন্য যে সব জিনিষ আন্‌বার কথা ছিল তাও এনেছি এবং দামেও ঠকে আসিনি; তার পর আজ সকালেও কলেজ যাবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুতরাং এই ক' ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ব্যাপার ঘটে গেল যার ফলে দিদি এমন স্বরে এমন প্রশ্ন করতে পারেন? কিছুই ভেবে স্থির না করতে পেরে বই থেকে চোখ তুলে, যেখানে পড়্‌ছিলাম সেখানে আঙ্গুল রেখে বই মুড়ে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকালাম।

দিদি এক ধমক দিয়ে বল্‌লেন, অমন ক'রে হবে না, আমার ঢের কথা আছে। সব ভাল ক'রে শুন্‌তে হবে। বই রেখে দে।

ছেলে বেলা থেকে দিদিকে যে ভয় করতাম, বড় হ'য়ে তা মাঝে দাঁড়ায় এবং ফলে আজ দিদির মুখে গম্ভীর স্বর শুনে সুবোধ শিশুর মত। বইখানি টেবিলে রেখে দিদির কথার প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম।

আমাকে বই রাখ্‌তে দেখে দিদি হঠাৎ তার স্বর বদলে কোমল কণ্ঠে বল্‌লেন—বোয়ের সঙ্গে কি হয়েছে বল্ ত?

যাক্ একটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অন্য কোনও ব্যাপার নয়। কিছু বল্‌লাম না।

দিদি বলে চল্‌লেন—চুপ ক'রে রইলি যে। কি হয়েছে বল্ না? বোয়ের সঙ্গে কথা কস্‌না, ভাল ব্যাভার করিস্ না কেন? এই যদি তোর মনে ছিল ত পরের মেয়ে ঘরে আন্‌লি কেন? নিজে দেখে শুনে করেছিস্, অপছন্দের ত কিছু নেই।

দিদির কথা শুনে আমার নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছা কর্‌ছিল যে কেন নিজে দেখে বিয়ে করব বলেছিলাম। কেন যে পছন্দ করেছিলাম তাই বা এখন কেমন ক'রে বোঝাব। কাজেই এ সম্বন্ধে আর উচ্চ বাচ্য না ক'রে চোখ দুটোকে যথা-সম্ভব বড় ক'রে বল্‌লাম—এ সব কি তোমাদের বৌ বলেছে নাকি—ভাল ব্যাভার করি না, কথা কই না! ভাল ব্যাভার না কর্‌লে, বকাবকি কর্‌লে মার কাণে নিশ্চয়ই যেত, মা পাশের ঘরে শোন মাকে জিগ্যেস কর। আর কথা কই না কে বল্‌লে এই ত কাল পান চেয়ে খেয়েছি, সার্টের বোতাম সেলাই করে—'

দিদি আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন—ও সব আবার কথা নাকি? দেখ্, আমার সঙ্গে ন্যাকামি করিস নি। পরের মেয়ে ঘরে এনে ও সব আবার কি?

দিদি বেশ মুরুব্বিয়ানা ভাবে কথাগুলো বলে চলে গেলেন। আমার কিন্তু কথাগুলো শুনে হাড়পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে উঠ্‌ল। অকৃতজ্ঞতা, ঘোর অকৃতজ্ঞতা! ভাবলাম সে আজ রাত্রে বেশ ভালো ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আর, ভাবা

হ'ল না দিদির ভয়ে। কি জানি যদি সব শোনেন। ঠিক করলাম—উষার মনের ভাব আজ জানতে হবে। আমি যে কতটা স্বার্থত্যাগ করেছি, তা ও বোঝে কি না জানতে হবে। কি ছলে, কেমন ক'রে, তবে মনের কথা জানব এই ভাবনাটা আমার মন জুড়ে বসল।

বইখানা তেম্‌নি টেবিলে পড়ে রইল তার কথা আর মনেই এল না। উষার প্রতীক্ষায় চেয়ারে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম কিন্তু উষা আর আসে না। ভাবতে ভাবতে চেয়ারে বসে বসে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানতে পারলাম না। হঠাৎ একটা মশার কামড়ে ঘুম ভাঙতে দেখি উষা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও তখন ঘুমের ঘোরে কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না। কাজেই যার হেস্তনেস্ত করব ভেবেছিলাম, তা ধামাচাপা দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম।

৪

দিন তিন চার পরের কথা। কোনো কাজ নেই, এবং পড়ারও কোনো বই কাছে ছিল না সুতরাং এ দুয়ের অভাবে এবং সন্ধ্যা বেলায়ই রাতের খাওয়া শেষ হ'য়ে যাওয়ায় শুয়ে পড়েছিলাম কিন্তু চোখে ঘুম আসছিল না। হঠাৎ সে দিনের চাপা-পড়া কথাগুলো মনে পড়ায় স্থির করলাম যে—আজই রাতে, তার মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে কথাটা উত্থাপন করব সেইটাই ভেবে স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। ইতিমধ্যে দেখি উষা এসে ঘরের কুঁজোটায় জল আছে কিনা দেখে, চেয়ারের উপর ফেলে-রাখা চুড়িদারটা আলনায় টাঙ্গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ ক'রে লাইট্ নিভিয়ে ধীরে ধীরে খাটে উঠে শুয়ে পড়্‌ল।

তখনও পর্য্যন্ত কোনো উপায় খুঁজে পাইনি; কিন্তু দেরী করলে উষা ঘুমিয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আর অপেক্ষা করা সমীচীন না ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে লাইট জ্বেলে, সরাসরি প্রশ্ন করলাম্—উষা, আমি কি তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যাভার করেছি?

উষা প্রথমে কোনো কথা কইলে না। জবাব না পাওয়ায় একটু চটে গিয়ে তার ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে বেশ ক'রে চেপে ধরে প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম। আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে উষা মৃদু স্বরে শুধু বল্‌লে—হাতে লাগে যে।

হাতটা তখনি ছেড়ে দিলাম। তার কথার ধাঁচে বুঝেছিলাম, যে উষা ও সম্বন্ধে ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না, কিন্তু আমার কেমন রোখ চেপেছিল, দৃঢ়-স্বরে বল্লাম—কবে তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যাভার করেছি, তোমায় বল্‌তেই হবে। দিদিকে যে তুমি বলেছ—

মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে উষা বল্লে—দিদিমণিকে আমি ত কিছু বলিনি।

তবে দিদি ও কথা বল্লে কেন? দিদি তোমাকে কি জিগ্যেস করে-ছিলেন, বল—। উত্তরের আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্‌লাম একবার মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তার পর চট ক'রে মুখে স্বাভাবিকতার ছাপ এনে কোনো প্রকার আবেগ প্রকাশ না ক'রে বেশ শান্ত সংযত কণ্ঠে উষা যে উত্তর দিলে, তার সারার্থ এই যে এতদিন আমার সঙ্গে উষার কি কথাবার্ত্তা হয়েছে, দিদি তা শুন্‌তে চেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরে—বোতাম সেলাই ও পান চাওয়া ইত্যাদি যে কথা হয়েছিল তা বলায় দিদি প্রথমে তাকে ধম্‌কে উঠেন; কিন্তু সে যখন জানালে সে সত্যসত্যই ও ছাড়া আর কোনো কথা আমাদের মধ্যে হয়নি, তখন দিদি আশ্চর্য্য হয়ে উঠে চলে গেলেন। তার-পর ও সম্বন্ধে দিদি যদি আমায় কিছু বলে থাকেন তো সে কিছু জানে না এবং এ কথাও জানাতে ক্রটী করেনি যে—সে ও সম্বন্ধে কোনো অনুযোগ করেনি।

সব কথা শুনে ধীর স্বরে উষাকে প্রশ্ন কর্‌লাম—আচ্ছা তোমার মত কি? তুমি কি মনে কর আমি তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যাভার করেছি?

উত্তর যা এল তা আশা করিনি। উষা বেশ স্পষ্টভাবে বল্লে—মন্দ না হ'লেও ভাল ব্যাভার করনি।

একটু আশ্চর্য্য হ'লাম, চম্‌কে গিয়ে আবার প্রশ্ন কর্‌লাম—ভাল ব্যাভার করিনি?

স্পষ্ট স্বরে ছোট্ট উত্তর এল—না। যা করা উচিত ছিল তা করনি।

এ ধরণের কথা শুন্‌তে প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ এমন কথা যে শুন্‌তে হবে তা প্রত্যাশাই করিনি। ফলে আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। তার দিকে চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলাম—যা উচিত ছিল করিনি?

তার উত্তরে উষা বেশ ধীর সংযত মৃদু অথচ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলে যে,—তাকে স্ত্রীর যা প্রাপ্য তা দিইনি। আমি তাকে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার ক'রে একটা মস্ত ত্যাগ করেছি, এই ভুল ধারণা একটা দৌর্ব্বল্য বই আর কিছু নয়। কিন্তু দৌর্ব্বল্য নিয়ে গর্ব্ব করা চলে না। বৃথা আত্মগরিমায় অন্ধ হ'য়ে আমি

তাকে কৃপা চক্ষে দেখেছি, ভাল বাসিনি। তার নারীত্বকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি।

ফশ্ ক'রে দিয়াশলাই জ্বলিলে যেমন ঘরের সব অন্ধকার ছুটে গিয়ে ঘরের সব কিছু স্পষ্ট ক'রে ধরে দেয়; উষার কথায় তেম্‌নি আমার সব ভুল-বোঝাগুলো আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। সব ত্রুটী স্বীকার ক'রে, এই প্রথম তাকে একটা আবেগের সঙ্গে কাছে টেনে নিলাম, আর সেও বেশ সহজভাবে অসঙ্কোচে আপনাকে আমার হাতে ছেড়ে দিলে।

ঘরের লাইটটা দীপ্তভাবে হাসতে লাগ্‌ল।

কান ত শুনে না; শোনে না মন। ও শুধু কথা গুলোকে মনের কাছে এনে জড়ো ক'রে দেয় মাত্র।

" সমাপ্তি "

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]



কণারক—(উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির)। কণারকে এখন আর কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে একটি অতীতের সমাধি-মন্দির – শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। * * * উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণ মন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। * * * জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুচ্চ অরুণ স্তম্ভ দেখা যায় তাহাও এই কণারকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু জগমোহনটুকু বিচিত্র ভাস্কর্য্যে ও অক্ষুন্ন-শিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিক জনের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলি...এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর ! * * * আর সেই অতুল্য শিল্প নবগ্রহ ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টী বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট।

—বিলাস কলার তথন ক্রটী ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তিপূর্ণ করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডোল গঠন অনেকস্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিৎ কল্পনায় শিল্প-গৌরব সঙ্কুচিত।

* * *

—রৌদ্রদীপ্ত নারিকেল তরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখা যায়। * * * সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিক-জন যথন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে * * * কণারক * * * যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত-প্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি রেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কণারক।

বিদ্রোহ

—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

আমার বিদ্রোহ নহে প্রখর মুখর ঘনঘটা,
রোষদীপ্তি বিদ্যুতের ছটা,
নয়ন ধাঁধিয়া দিয়া আঁধারেরে করা গাঢ়তর ;
আমার বিদ্রোহ নহে দৃষ্টিবিষ, বহ্নিমুখ শর,
অসহ অক্ষমা অক্ষমের ; কোপানলে
ঋষি দুর্ব্বাসার মতো দুর্ব্বার দাহনে উঠে জ্বলে'
করা আর হওয়া ভস্মশেষ।
অন্তরদীপ্তিতে তার পলকের পড়ে না নিমেষ
চির জন্মযুগ ধরি'। ঝড়-ঝঞ্ঝা, মৃত্যু-বিভীষিকা,
চঞ্চল করে না কভু নিভৃত সে প্রদীপের শিখা ;
দিকে দিকে, লোকে লোকে,
জ্বালাহীন প্রচণ্ড আলোকে
আঁধারের মর্ম্মমাঝে আপনি সে সঞ্চারিয়া বহে,
বিপুল বিদ্রোহে ;—
যে বিদ্রোহ যুগে যুগে যুগান্তের আঁধার মথিয়া
ফোটায় তারার রশ্মি আকাশেরে পুলকে ব্যথিয়া,
প্রণয়ের পরশ-পীড়নে, তারপর জাগাইয়া রাখি'
সেই স্মৃতি দীপমালা, নিদ্রাহীন আঁখি
আপনি জাগিয়া থাকে যুগান্তর ধরি
প্রশান্ত অন্তরে,—তুচ্ছ করি'
মরণেরে, আঁধারেরে, বিস্মৃতিরে, আপনারে তার,
আপনার হৃদয়ের হরষ-ব্যথার
উচ্ছৃঙ্খল
জ্যোতির্দ্দীপ্তি, নয়নের জল।

আমার বিদ্রোহ সে যে ললাটের পটে আঁকা মম
চির স্থির প্রশান্তির সম,
স্নিগ্ধ শ্বেত চন্দনের রসে।
বিশ্ব-চিত্ত-সরোবরে, কল্যাণের শতদল কোষে
আপনি সে করে বাস,
তাহার সুবাস
দিকে দিকে ধায় মৌনবেগে
অশুভ অশুচি যত শুভ শুচি হ'য়ে ফোটে তার স্পর্শ লেগে।
ধ্বংসের মীমাংসা সে ত দুর্ব্বলের তরে;
প্রাণ-পরিমাণ যার তরঙ্গে তরঙ্গে থরে থরে,
কাঁপে দূর আকাশের গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
গর্ভবেদনার মতো নিশিদিন, অটুট ধারায়
তাহারই হৃদয়স্তন্যে উৎসারিত সুধা-উৎস-ধারা
বহে শত লক্ষ স্রোতে বাধা-বন্ধ-হারা
মরণের মরু বক্ষতলে। দিনে দিনে
পাষাণ-সমাধি ভেদি' বাহিরায় নব শষ্প তৃণে
শ্যামলের নবোদ্গম প্রাণের বিজয়ধ্বজা বহি',
কোটি কোটি অমর বিদ্রোহী।
মুঞ্জরে নীরস তরু। আগাছার কণ্টক-সঙ্কট
ফল-ফুলে ছাওয়া হয়। গৃহশীর্ষে গৃহরিপু বট
আপনার রসভারে খসি' পড়ে ধরণীর ক্রোড়ে
লয়ে তার জটাজুট, শিকড়ের শতগ্রন্থি ডোরে
যেখানে যা আছে,
বাঁচায় গৃহেরে, আর আপনি সে বাঁচে।

আমার বিদ্রোহ সে যে প্রাচীমূলে স্বাতীর
অনাগত প্রভাতের বিজয়কেতন।
যুগরাত্রি ধরি'—
দিবসের চিরমুক্ত অনন্ত সম্ভব দ্বারে স্মিতমুখ প্রসন্ন প্রহরী।
একের উদ্গীর্ণ অন্ন অপরের তরে আহরণ,
ক্ষতিরে হানিয়া ক্ষতি, মরণেরে হানিয়া মরণ

দীনতার যে বিরোধ, চলেছে সে যুগ যুগ ব্যাপি'।
ন্যায়ের বিচার বিধি তুলাদণ্ডে তিলে তিলে মাপি'
একখানি নগ্ন জীর্ণ রিক্ততারে করেছে বণ্টন
জনে জনে সমারোহে। আমার বিদ্রোহ সে যে অজানার সমুদ্র মন্থন
দেবে ও দানবে।

তাহার অমৃত রবে
অন্যায় যে সহে তার তরে
অন্যায় যে করে
তারও তরে। অন্নমুষ্টি নাহি যার, তারে
দেবে সে অন্নের মুষ্টি, সে অন্ন যে কাড়ে
দেবে তারে বেশী কিছু। কিছুতে রবে না পরাভব,
অনন্ত এ বিশ্ব জুড়ি' যার তরে অনন্ত বৈভব
সে জানে হারায় যারা, তার চেয়ে হরণ যে করে,
প্রয়োজন কত বেশী তার।

আমি বিদ্রোহী,
কারও হ'তে ছোট নহি,
বড় আমি নহি কারও হ'তে।
জীবনের পথে
চাহিনি ভিক্ষার দান এ বিশ্বের দেবতারও কাছে।
আমার পরমতম, আমার চরমতম, জানি সে আমারই
মাঝে আছে
উৎসুক বিকাশ প্রতীক্ষায়
প্রতিটি নিমেষে। বুক যে ভরে না তবু হায়
আপন অর্জ্জন লয়ে? থেকে থেকে তবু হয় মনে,
আমা হ'তে আপনার কে যেন জাগিছে সঙ্গোপনে
নিশিদিন মোর মুখ চাহি'
নয়নে নিমেষ তার নাহি।
আপনারে বড় করি, আপনার হ'য়ে হয় বড়;
আপনি অর্জ্জন করি, আমার অঙ্গনে করে জড়

কোটিগুণ অজানা সম্পদ্; তার কাছে
আমার জয়ের মূল্য আছে,
আছে মোর আপনার পরিচয়।
লভি যবে জয়,
মালা সে পরাতে আসে নিজ হাতে, মাথা করি নত
আমার বিদ্রোহ হয় প্রণামের মত।

—*—

জীবনের পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্‌সা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফরমাসের নয়,—তাইত ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

"শচীশ"

——

পাগ্‌লা হাওয়া

—শ্রীসত্যরঞ্জন বসু।

আমি পাগল হ'য়ে ধাই ; আমি পাগল ক'রে বেড়াই !

পাগলামি করাই আমার স্বভাব ! . . .

বন উপবন, সবুজ প্রান্তর, অপার নীল জলধি, পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে আমার যাওয়া আসা , মাতামাতি ! বাধা নাই, বন্ধন নাই, সদা উদ্দাম, উৎফুল্ল আমি পাগ্‌লা হাওয়া !

আমার স্পর্শে কত তরুণ-তরুণীর প্রাণে সবুজ রঙীন নেশার উতরোল এনে দেয় ! কত বিগত-যৌবনের প্রাণে স্মৃতির দংশন লাগিয়ে দেয়, কত সুখ-সুপ্তির আবেশ এনে দেয়।

আমার এই বিরাম-হীন যাত্রার মধ্যে চলচ্চিত্রের মত কত মধুর কাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করে ; যার ক্ষণিক আবেশ আমাকেও মাঝে মাঝে মত্ত ক'রে তোলে ! আবার ভেসে বেড়াই সেই অনন্তের কোলে।

আমি টের পেলাম আমার প্রবাহের শক্তি আছে। কেবল ফুল-বনের গন্ধে বয়েই আমার জীবন নয়, আমার জীবনে আরও কিছু আছে যা বাইরে থেকে কেউ টের পায় না।

সে এক কাহিনী—

সে দিনটা কি ছিল ঠিক স্মরণে নেই। অনেক বন জঙ্গল পেরিয়ে যখন আমি উধাও হ'য়ে চল্‌ছিলাম শূন্য দিয়ে, তখন নীচে হঠাৎ চেয়ে দেখি—সবুজের ওপর সবুজ তার উপর সবুজ—এক দীর্ঘ প্রান্তর ; আর তারই মাঝখানে আলো ক'রে বসে আছে—এক বাগান-ভরা বেল ফুলের দল। ফস্‌ ক'রে নেমে এসে তাদের মধ্যে একটা নাড়া দিতেই—এ ওর গায়ে ঢলে' পড়্‌লো! . . .

আমি বল্‌লাম "যাই ?"

তারা বল্‌লে—"কোথায় ?"

"কে জানে কোথায় !" তারা আমার দিকে চেয়ে পাপড়ি দুলিয়ে মুচ্‌কি হাস্‌লে। তার পর যাবীর সময় তারা বল্‌লে "কি অম্‌নিই যাবে ?"

আমি বললাম "না, তাই কি হয় ?" তাই যখন তাদের প্রাণের সুবাস সারা গায়ে মাখিয়ে ভেসে পড়বার মতলব করেছি—তখন কোণ থেকে ফুটনোন্মুখ গোলাপ কুঁড়িটি বলে উঠ্‌লো "মনে থাক্‌বে কি ?" কানে কানে তার কথা বল্‌তেই তার সমস্ত পাপড়িগুলি গা ঝাড়া দিয়ে কোড়ক থেকে মুক্ত হ'তে চাইলো। সে আবীর রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো !

আমি আবার ভেসে পড়্‌লাম—শূন্যে !

আবার কত গুহা গহ্বর, চড়াই উৎরাই ক'রে, প্রান্তরের উপর দিয়ে, এসে পড়্‌লাম এক দেশে ;—সে দেশ কেবল নীল আর নীল। সেই নীলের মাতনে শুভ্র ফেনপুঞ্জ আমার মাঝে মাঝে চমক ভেঙ্গে দিচ্ছিল। অপার নীল, অপার জল—আমি বল্‌লাম "ওগো নীল—

'যাই তবে যাই—

বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।'—তখনই

নীলের কল্লোলে খল্ খল্ হাসি, তরুণীর চপল চটুল চরণে মঞ্জীরের মত ঝঙ্কার দিয়ে মিশিয়ে গেল।

* * *

—তরুণী ছিল উদাস নয়নে চেয়ে। তার কুঞ্চিত কেশ-পাশ বাতাসে বিভ্রান্ত ভাবে মুখে চোখে পড়েছিল। অনন্ত জলধি কূলে বালুর ওপরে বাম করে মাথা রেখে শূন্যে চেয়েছিল। কি ছিল তার মনে কে জানে ?

তার অবিন্যস্ত কেশ-পাশে ও বসনে নাড়া দিতেই তার তনু-মন চকিত চপল হ'য়ে স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

তরুণী বল্‌লে "কে গা ?"

আমি বল্‌লাম "পাগ্‌লা-হাওয়া।"—

তারপর, বেল ফুলের গন্ধ দিয়ে তাকে স্নান করিয়ে গোলাপের রঙীন নেশায় তাকে মস্‌গুল ক'রে দিলাম। সে বল্‌লে "ওগো তুমি ? আমায় তুমি বাঁচিয়েছ ; আমার প্রাণটাকে সজীব করেছ।"

তরুণী বালু নিয়ে পাহাড় গড়ে, ঘর তৈরী করে। আমি তা ভেঙ্গে চুরমার্ ক'রে দিই—একই মাতনে। বেচারা হয়ত মুস্‌ড়ে পড়ে মনঃক্ষোভে, আবার অমনি কানে কানে বলে যাই "সখি, ওঠ ! মুখ তুলে চাও।"

সে বলে "যাও ! তোমায় ধরে শাস্তি দেব ; ভারী দুষ্টু তুমি।"

আমি ফস্ ক'রে ছুটে পালাই, ধর্‌তে পারে না।

আবার ঢেউএর মাতনের সঙ্গে মিশে যখন ফিক ক'রে হেসে তাকে অর্দ্ধ-স্নাত ক'রে দিই—তখন সে শিশির-স্নাত সদ্য-ফোটা লাজুক ফুলটির মত দেহ-লাবণ্যে লালিমা ফুটিয়ে দ্রুত চরণে দৌড়ে পালায়। আমি চেয়ে থাকি তৃপ্তি-ভরা আঁখি নিয়ে;—অন্তরের অব্যক্ত আনন্দ তখন নেচে ওঠে। ইচ্ছে হয় সুখ স্বপ্ন হ'য়ে ওই নয়ন পল্লবে মিশে থাকি।

এমনি ক'রে দিন যায়। তরুণী বল্‌লে "তার পর যখন তোমার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে যাবে—নিজকে স্মরণ পথে পড়্‌বে, তখন তো—

"———গীতহীনা বীণা সম
আমি পড়ে' রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে। . . ."

সত্যি সত্যি একদিন প্রকৃতির নিয়মে আমি যখন ভেসে পড়েছি;—হঠাৎ ফিরে দেখি—তরুণী অন্ধকারের মধ্যে উপুড় হ'য়ে পড়ে রয়েছে বালু বেলার ওপরে। যেন বসন্তের ঝরা পুষ্প-মঞ্জরী। . . .

এমনই ক'রে নিত্য রস-রঙ্গের মধ্যে প্রাণে যে কত কামনা-ভরা উৎসবের উতরোল ওঠে, তার সমাপ্তি কোথায় কে জানে? তাই যখন হঠাৎ সখীর সন্ধান আর পেলাম না, তখন একটা উদ্দাম উৎসাহ আমাকে আশ্রয় ক'রে বস্‌লো। এই দুনিয়াটাকে ওলট পালট ক'রে পাগ্‌লা হাওয়ার পাগ্‌লা মাতনে উধাও হ'য়ে ছুটে চলেছি সেই তার সন্ধানে। কত রাজার রাজ্য, কত নদ নদী, সব দূরে ফেলে ছুটে চলেছি! . . .

চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক দুর্গ! ইঁট পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়ে, বড় বড় গম্বুজের পাশ দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে দেখি—এক জানালার পাশে বসে—তরুণী; বাতাসে তার ওড়না ছেড়ে দিয়েছে।

আমি বল্‌লাম "তুমি?" . . .

"হ্যাঁ! হ্যাঁ আমি।"—

তার সেই রঙ্-ভরা কুম্‌কুমের মত গাল দু'টিতে কে যেন কালির ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। তার আঙ্গুরের মত টস্‌টসে ঠোঁট দু'খানি কেন যেন চুম্‌সে গেছে। তার চকিত চপল ব্যাকুল চাহনির বদলে একটা স্থির অপলক দৃষ্টি এসে দাঁড়িয়েছে। তার সারা অঙ্গের লাবণ্য দূরে কোথায় সরে

দাঁড়িয়েছে। যেন বিনানো বেণী কেমন ক'রে খুলে গেছে—আর শক্তি নেই তাকে বাঁধ্‌বার।

আমি বললাম "একি ?"

তরুণী একটা চাপা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বল্‌লে "আমি যে বন্দী। আমাকে রাজা জয় ক'রে এনেছে।"

আমি বল্‌লাম "তবে আমি যাই—ভেসে যাই !"

তরুণী ফ্যাল্‌ ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো; যেন কত কি বল্‌বার আকাঙ্ক্ষা ! . . .

* * *

আমার পাগ্‌লা হাওয়া নাম আজই সার্থক হয়েছে;—সেই থেকে আমি ঘুরছি—অন্ত-হীন, বিরাম-হীন।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্‌ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া দিল।

"শচীশ"



পান্থবীণা

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

১

একদা এক শীত রাত্রির গভীর দ্বিপ্রহরে বাংলার এক তরুণ সহসা জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণ ধরিয়া সে তাহার মলিন শয্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘুমাইতেছিল। এমন অকস্মাৎ কে যে তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিল কে জানে? সেদিন সন্ধ্যার প্রারম্ভ হইতে নিবিড় ব্যথার মত আকাশে মেঘপুঞ্জ ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতে ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। অমানিশার গাঢ় আঁধার আকাশ এখনও সে মেঘাবরণ-মুক্ত হয় নাই। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন সেই বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া থম্ থম্ করিতেছে! কোথাও এতটুকু আলোকের রেখাপাত হয় নাই। আকাশে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ নাই,—নক্ষত্র নাই,—বাতাসের কোনও শব্দ নাই,—সমস্ত সহরের নরনারী চেতনাহীন, সুপ্ত! পৃথিবীর সকল আলোক, সকল জ্বালা, সকল শব্দ, সকল সুর, এ অন্ধকার যেন তাহার বিরাট বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মসী-গাঢ় নভোতলে স্তব্ধ-গম্ভীর ভাবে ধীর-অটল পদে দাঁড়াইয়া আছে! কোথাও এতটুকু ছিদ্রপথ না রাখিয়া অন্ধকার যেন পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে।—রূপ, বর্ণ, সমস্ত গ্রাস করিয়া এ কালো যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

যুবক জাগিয়া উঠিল। রাত্রি আছে কি না-আছে জানে না,—নবীন উষায় নব-জাগরণের মাঙ্গলিকী সুদূর হইতে তাহার কাণে আসিয়া পৌছিবে কি-না জানিতে চায় না,—নব-প্রভাতের সিংহদ্বার আর খুলিবে কিনা সে কথা জানিবার প্রয়োজন তাহার নাই। সে শুধু যেমন নিঃশব্দে জাগিয়া উঠিয়াছে, তেম্‌নি ভাবে নব চেতনা-জাগ্রত সন্থ-উন্মেষিত তাহার দুইটি চক্ষের অপলক দৃষ্টি বাহিরে অন্ধকারের দিকে স্থির-নিবদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। গভীর রাত্রির এই নিস্তব্ধ অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগে। চির-সুন্দর চির-জাগ্রত এই বিরাট অন্ধকারের রূপ যেন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। দিনের আলোকে সে যাহা দেখিতে পায় না, দিবসের কোলাহলে সে যাহা শুনিতে পায় না, রাত্রির এই পুঞ্জীভূত ঘোর আঁধারে সে যেন পথ দেখিতে পায়,—নিরবচ্ছিন্ন মরণের গর্জ্জন, ক্রন্দনের কলরোল ভেদ করিয়া নব-জীবনের আহ্বান-বাণী যেন তাহার কাণের কাছে ধ্বনিত হয়!—নবোদ্ভাসিত অরুণালোক তাহার চোখের কালোয় ঝিলিক্ দিয়া উঠে! নিজেকে প্রকাশ করিতে না পাইয়া দিবসালোকে সর্ব্ব দেহ-মনে যে ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে জমাট্ বাঁধিতে থাকে, এই নীরব মুহূর্ত্তে তাহা যেন নিমেষেই খসিয়া যায়।—সন্ধ্যার আকাশের মত রঙের নেশায় যাহার আশা মিটে না, রাত্রির এই অন্ধকার-কালো রঙে সে নেশার পেয়ালা যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে,—কোন্ দূর দুরান্ত হইতে নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত কাণে আসিয়া পশে, বুভুক্ষু হিয়ার সমস্ত ক্ষুধা-নিবৃত্তির পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কৃত হয়।—এই তিমির-ঘন অবগুণ্ঠনতলে সে যেন তাহার জন্ম-জন্মান্তরের প্রতীক্ষাকুল প্রেয়সীর নব-রূপ দেখিতে পায়!

যুবক একবার পাশ ফিরিয়া ভালো করিয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইল। সহসা এই স্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া অদূরে গাছের পাতাগুলা বাতাসে নড়িয়া উঠিল! নিমেষের জন্য এই নিশ্চলের অন্তরে যেন একবার চলিবার ইচ্ছা জাগিল! আলোকের ক্রন্দনে এই অন্ধকার যেন একবার শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আবার থামিয়া গেল। দিগন্তে যেন আবার অন্ধকারের ঢেউ উন্মত্ত আবেগে ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। মরণে-মরণে আলিঙ্গন আবার নিবিড় হইয়া উঠিল। সেই ঘন তিমির বিদীর্ণ করিয়া ক্ষীণ অস্পষ্ট পথ-রেখা নবজীবনের তোরণদ্বারে গিয়া পৌছিয়াছে! কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথিপার্শ্বে দুঃখ, দারিদ্র্য, পাপ, অহঙ্কার, দর্প, অত্যাচার, অনাচার মাথা

তুলিয়া আকাশকে বিদ্রূপ করে, পথযাত্রী পথিকের পায়ে পায়ে বাধা-বন্ধনের মত জড়াইয়া ধরে, কিন্তু কিছু করিতে পারে না। অন্ধকারে বিভীষিকার মত বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়।—তীব্র আলোক সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। একদিন প্রকাশের অসহ্য লজ্জায় তাহারা ভাঙিয়া পড়িবে।—আপনা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। দুঃখের সংগ্রামে সত্য তাহাকে জয়টীকা দিয়া স্বর্গ কিনিয়া দিবে! রাত্রির তপস্যা প্রভাত আনিবে। মৃত্যুর অন্তরে যে অমৃত আছে, তাহা তো অনাস্বাদিত থাকিতে পারে না! পথের বাধা-বন্ধ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অমৃতের অধিকারী সে,—তাহার জন্ম-অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইবে।

* * *

সে তিমির-রাত্রি প্রভাত হইল!

পিতা রত্নেশ্বর দরজায় আঘাত দিয়া বলিয়া গেলেন, বংশী, ওঠ। বলিয়া পুত্রের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি স্নানাহ্নিকের জন্য নগ্নগাত্রে কলতলার দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, বংশী এ-আহ্বানে সাড়া দিক্ আর না দিক্, সে জাগিয়াছে।

নিতান্ত বৃদ্ধ না হইলেও বয়স তাঁহার পঞ্চাশোর্দ্ধে গিয়াছে এবং গত কয়েক বৎসর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দুই সংসার। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুইজনেই এই দারিদ্র্য-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। প্রথমা রাখিয়া গিয়াছেন, একটী কন্যা; নাম—গায়ত্রী। বয়স সাতাশ কিংবা আটাশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের পরেই সে বিধবা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার এক পুত্র; নাম, বংশী। অবিবাহিত তরুণ,—বয়স প্রায় পঁচিশ।

বাড়ীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। কলিকাতার মত সহরে বেশী ভাড়া দিয়া ভাল বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার মত শক্তি-সামর্থ্য ছিল না বলিয়াই কোন রকমে তাহারা তিনটী প্রাণী বহুকাল যাবৎ এই বাড়ীতেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। দুইটী মাত্র ঘর,—একটী বড়, একটী ছোট। বড় ঘরটির মাঝে চটের পর্দ্দা টাঙাইয়া তাহাকেও আবার দুই সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাহিরে একটুখানি বারান্দা। তাহার মাথার উপরে কয়েকটা কেরোসিনের ভাঙা টিন এবং কাঠের চৌকা-বাক্সের ভিতর গোটাকতক

পায়রা থাকে। সন্তান-সন্ততি লইয়া তাহারা যে সংখ্যায় কত, সে সংবাদ এ বাড়ীর কেহই জানে না। পাখা ঝটুপট্ করিয়া অতি প্রত্যূষে তাহারা বাহির হইয়া যায়, নিজেদের আহার নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া এক সময় সকলের অলক্ষ্যে তাহাদের এই জীর্ণ আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। দক্ষিণদিকের প্রাচীর গাত্র হইতে ফুটা টিনের আচ্ছাদন দিয়া স্বল্প-পরিসর দুইটি ঘর বাহির করা হইয়াছে। একটী রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়, অপরটীতে জলের কল এবং একটী ছোট চৌবাচ্চা। সম্মুখে একটুখানি ছোট উঠান। তুলসীমঞ্চের চতুর্দ্দিকে কয়েকটী মরশুমি ফুলের গাছ বসানো হইয়াছে। গলিরাস্তার সম্মুখে সদর দরজা; তাহার একপার্শ্বে বৈঠকখানার নিমিত্ত মাটির খাপ্‌রা এবং বাঁশের বাঁকারি দিয়া যে ক্ষুদ্র ঘরখানি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, অতিরিক্ত স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া তাহা এখন মনুষ্যবাসের অযোগ্য। সম্প্রতি সদ্য-প্রসবা ভুলি কুকুরটা তাহার পাঁচ-ছয়টি সন্তানাদি লইয়া তাহারই এক কোণে পড়িয়া থাকে। শীতে তাহাদের কষ্ট হইবে বলিয়া, কে যেন নিকটবর্ত্তী আস্তাবল হইতে এক বোঝা শুক্‌নো ঘাস এবং তাহার উপর একখানা পুরু চট্, ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে বিছাইয়া দিয়াছেন। উঁচু না হইলেও উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি দুইটা প্রাচীর, পার্শ্বের ক্রিশ্চান এবং মুসলমান পরিবারের সংস্রব হইতে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর ভূমিকম্পের রাত্রিতে উত্তর দিকের প্রাচীরখানি আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই,—হুম্‌ড়ি খাইয়া উঠানের একপার্শ্বে পড়িয়া গেছে। ইঁটগুলা কিন্তু ও-ধারের ভাড়াটিয়ার উঠানেই পড়িয়াছিল বলিয়া রক্ষা, নচেৎ এ-পাশে পাড়লে, পরিষ্কার করিবার লোকের অভাবে হয়ত অপরিসর উঠানটুকু নোংরা হইয়া থাকিত!

অগ্রহায়ণের প্রথমেই এ বৎসর শীতের প্রকোপ একটুখানি বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। বেলা তখন প্রায় দশটা। শতচ্ছিন্ন মলিন বালাপোষখানি গায়ে দিয়া, রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া রত্নেশ্বর বারান্দার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একখানা বিষ্ণুপুরাণ ও একটা পুরাতন পঞ্জিকা পড়িয়াছিল এবং বহুক্ষণ হইতে আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া যে সব কথা উচ্চারণ করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেও তাহার একবর্ণ বুঝিবার উপায় কাহারও নাই।

গায়ত্রী ইহারই মধ্যে স্নান করিয়া একপিঠ ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া সেই ছোট রান্নাঘরটির ভিতর রাঁধিতেছিল। মাথার উপরে ভাঙা টিনের ছিদ্রপথে

সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া বিধবা-তরুণীর অনিন্দ্য-সুন্দর শান্তোজ্জ্বল মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বংশী ভাত খাইয়া এখনই বাহির হইয়া যাইবে, তাই সে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধনাদি সারিয়া লইতেছে।

টেবিলের উপর নামানো ছোট 'টাইম্‌পিস্‌' ঘড়িতে বহুক্ষন দশটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া ঘরের ভিতর হইতে বংশী ডাকিল, আর দেরী কত দিদি?

ডাক শুনিয়া গায়ত্রী তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন হাতে লইয়া বংশীর ঘরে প্রবেশ করিল। পরিষ্কার ঘরের মেঝের উপর আসনখানি পাতিয়া দিয়া বলিল, একটু দেরীই বা হলো বংশী, সাহেব তো তোকে গিলে ফেল্‌বে না?

গত বৎসর বি, এ, পাশ করিয়া অবধি বংশী যে কোম্পানীর ঘরে সামান্য কেরাণীর চাকুরিতে বহাল হইয়াছিল, দিন পঁচিশ ছাব্বিশ আগে সে কোম্পানীর বড় সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ জাল-জুয়াচুরির অপরাধে তিন বৎসরের জন্য শ্রীঘর বাসের হুকুম পাইয়াছেন, কাজেই এখন তাহার সে চাকুরীও নাই, সাহেবের গিলিয়া ফেলিবার ভয়ও নাই। অথচ বংশী পূর্ব্বের মত এখনও বেলা দশটার সময় আহারাদি করিয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়া রত্নেশ্বর কিংবা গায়ত্রী কেহই এ নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা জানে না।

সত্য গোপন করার অপরাধে বংশীর মুখের উপর বিষাদের ছায়া হঠাৎ ঘন হইয়া উঠিল; কিন্তু উপায় নাই। বলিল, না। তা বল্‌ছি নে দিদি, তোর যদি রান্না না হ'য়ে থাকে ত না হয় আর একটু বসি।

না, আর বস্‌তে হবে না। বলিয়া আসনের পাশে জলের গ্লাস নামাইয়া দিয়া গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরে ভাতের থালা লইয়া হাজির হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ত্রী দরজার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিল, বংশী, আর কিছু আন্‌ব কি?

না, আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে। বলিয়া বংশী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলতলা হইতে আঁচাইয়া ফিরিবার সময় বংশী দেখিল, গায়ত্রী পিতার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্যের আলোক-সম্পাতে এই নিরাভরণা বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণীর মুখখানির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বংশী মনে মনে হঠাৎ একটা বড় তীব্র বেদনা অনুভব করিল। কাল একাদশী গিয়াছে—সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাসের পর, গায়ত্রী আজ এখনও হয়ত কিছু মুখে দেয়

নাই। কি একটা কথা সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু বংশীর মুখ দিয়া সে কথাটা যেন আর বাহির হইল না! কোথায় যেন বাধা পাইয়া আটকাইয়া গেল।

গায়ত্রী বলিল, বাবা, একটুখানি সরে বসো না, জায়গাটা পরিষ্কার করে দি। খাবার ঠাঁই করে দেব।

রত্নেশ্বর আপন মনে কি যেন বলিতেছিলেন; গায়ত্রীর কথাটা শুনিতে পাইলেন না, একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন মাত্র।

বংশী বলিল, বাবা, একটু স'রে বসুন।

তিনি মুখে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। কম্বলের যে আসন-খানির উপর বসিয়াছিলেন, সেখানি হাতে করিয়া তুলিতে যাইতেছিলেন, গায়ত্রী তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া লইয়া একটু দূরে পাতিয়া দিল এবং পুরাণ ও পঞ্জিকা দুইটী তাঁহার চোখের সুমুখে নামাইয়া রাখিল।

রত্নেশ্বর আসনের উপর চাপিয়া বসিয়া ডাকিলেন, বংশী, শোন্। এইখানে বোস্।

বংশী পিতার সম্মুখে হেঁট মুখে বসিল। রত্নেশ্বর পুনরায় একটুখানি অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িলেন। বিড়্ বিড়্ করিয়া কতকগুলো কি বলিয়া বংশীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরাণ পড়েছিস্?—বিষ্ণু পুরাণ? না? তবে বি, এ, পাশ কর্‌লি কি ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে? বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া পুরাণখানি পুত্রের আনত মস্তকে একবার স্পর্শ করাইয়া পুনরায় নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, রজি রাজার উপাখ্যান পড়্‌ছিলুম। এই পৃথিবীর মানুষ,—সেও একদিন স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার করেছিল। রেখে দে তোর পৃথিবীর সম্রাট! স্বর্গ! স্বর্গ! যেখানে ইন্দ্রদেব রাজত্ব করেন। বৃহস্পতির কূটচক্রে যেই তাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘট্‌লো, আবার তারা পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীতেই ফিরে এলো। চরিত্র! চরিত্র-বল! বুঝ্‌লি কিছু? না, ঘোড়ার ডিম?

বংশী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, বুঝ্‌লুম বাবা।

—তবে যা। দূর হ! বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি আবার বিড়্ বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন।

বংশী সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, বোস্, বোস্ বাবা, বোস্, অনেক বক্‌লুম। শোন্। বলিয়া তিনি

তাহার সম্মুখে পুরাতন পঞ্জিকাখানা খুলিয়া ধরিলেন। কোন্-এক নার্শারীর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় কপি, মুলা ও বেগুনের ছবির উপর নজর পড়িতেই বলিলেন, স্থাখ্ স্থাখ্, কেমন ছবি দেখেছিস্ ?

পিতা যেমন ক্রন্দন-রত অভিমানী ছোট ছেলেকে ছবি দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করেন, রত্নেশ্বর তেমনি ভাবে একটা ছবির উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, এটা কি বটে রে বাঁশী ? কিসের ছবি ?

বংশী তাহার পাগল্ পিতাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিত, তাই ধীরে ধীরে কহিল, ওটা ফুলকপির ছবি। কি হবে বাবা ওসব দেখে ?

—কি হবে ? এ পাগল ছেলে বলে কি মা ? বলিয়া বোধ করি গায়ত্রীর উদ্দেশে একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু গায়ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ওই যে ওখানে ফুলের গাছগুলো কি জন্যে পুতেছিস্ ? সিদ্ধ ক'রে খাবার জন্যে ? টান্ মেরে উঠিয়ে ফেলে দে না ওসব ? ওইখানে যদি বিশ-ত্রিশটা কপির চারা দিতিস্ তাহ'লে খেয়ে বাঁচ্তিস্। ভাগ্যিস্ আমি এই লঙ্কা গাছটা পুতেছিলুম, তাই লঙ্কা কিন্তে হয় না।—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি ! পড়িস্ নি মুখ্খু ? বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পিতাকে খাইতে দিবে বলিয়া গায়ত্রী এতক্ষণ কলের ঘরে বংশীর উচ্ছিষ্ট থালা বাটি ইত্যাদি মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতেছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বংশী তখনও পিতার নিকট বসিয়া আছে। তিনি অনর্থক পাগলামি করিয়া তাহার অফিসের সময় নষ্ট করিয়া দিতেছেন ভাবিয়া গায়ত্রী রান্নাঘরের দরজা হইতে বলিল, ওকে ছেড়ে দাও না বাবা ! বংশীর অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে !

—কার অফিস ? বলিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কন্যার মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, বংশী ছেলেমানুষ, ও অফিসের কি জানে মা ? চাক্‌রীর খাটুনী ওর কচি হাড়ে সইবে কেন ? যদি বলিস, সংসার চল্‌ছে কিসে থেকে ? কেন, আমার পেন্‌সনের টাকা। বলিয়া তিনি পুনরায় বংশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁরে বংশী, সাহেব মাসে মাসে আমার টাকা দিচ্ছে ত ? —হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আবার দেবে না ? এণ্ডারসন্ যে আমার প্রাণের বন্ধু,— মাই ডিয়ার লোক। আমি কম উপকার করেছি তার।

বস্তুতঃ গত একটি বৎসর বংশী যে চাক্‌রী করিয়া সংসারের খরচ চালাইয়া

আসিতেছে সে কথা রত্নেশ্বর বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন, তাঁহার পেন্‌সেনের টাকা হইতেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। তাহারও একটা কারণ আছে। একচল্লিশ বৎসর ধরিয়া এণ্ডারসন্ কোম্পানীর অফিসে চাকরী করিবার পর রত্নেশ্বরের যখন মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল এবং তিনি একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন, তখন পিতার আদেশ অনুসারে বংশী তাহার পিতৃবন্ধু এবং প্রভু এণ্ডারসন্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একদা তাহাদের দুস্থ পরিবারের সাহায্যের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ মাসহারার দাবী করিল। সাহেব স্পষ্ট জবাব দিলেন, এটা গভর্ণমেণ্টের অফিস নয়, সুতরাং এখানে কাহারও পেন্‌সনের ব্যবস্থা নাই। পরে, নিরুপায় হইয়া বংশী নিজেই তাহার পিতার পদে বহাল্ হইবার জন্য সাহেবকে বহু অনুনয় বিনয় করিতেও ছাড়িল না। পুরা একটি মাস হাঁটাহাটি করাইয়া অবশেষে সাহেব বলিলেন, বহু পূর্ব্বেই সেস্থানে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইয়াছে, এ সময় বরং অন্য কোন অফিসে তুমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

কিন্তু বংশী যেদিন তাহার পিতাকে এ-সব কথা শুনাইল, তিনি কোন প্রকারেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, অসম্ভব বংশী, তা হ'তে পারে না। এণ্ডারসন্ আমার প্রাণের বন্ধু। আমি তার যে উপকার করেছি, সে কথা সে জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে না। মানুষে তা পারে না। পেন্‌সন তাকে দিতেই হবে।

যাহা হউক, শুধু এই সব কথা বলিয়াই যদি রত্নেশ্বর নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলেও বা পথ ছিল, কিন্তু সাহেবের নিকট বংশী যতই নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিল, রত্নেশ্বরের বিকার ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া পিতাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বংশীকে মিথ্যা বলিতে হইল। অন্য অঁফিসে চাকরী করিয়া টাকা আনিয়া বংশী বলিল, সাহেব আপনার পেন্‌সন্ মঞ্জুর করিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার কিছু কমিল, অধিকন্তু তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর উদ্দেশে অজস্র ধন্যবাদ এবং ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া সেইদিন হইতে সকলের সহিত হাসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতার আহারের স্থানটা বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া গায়ত্রী যখন ভাতের থালাটা আনিয়া ধরিয়া দিল, তখন বংশীকে নিষ্কৃতি দিয়া কহিলেন, যা বাপু, কোথায় যাচ্ছিস্ যা তুই।

ছাড়া পাইয়া বংশী জামা জুতা পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই গায়ত্রী

চুপি-চুপি বলিল, ছি, ছি, তুইও যেমন!—হ্যাঁরে, দেরী কর্‌লি, সাহেব কিছু বল্‌বে না ত? তুই ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত আজ আর আমার স্বস্তি নেই।

—না রে না। বংশী বাহির হইয়া গেল।

গায়ত্রীর অনাগত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া যে একটা বিশাল মরুপ্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে তাহা সে মাত্র এই নিরালা দুপুর বেলাটায় বেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে। চিন্তাটাকে তত বেশী আমল না দিয়া তাই সে কোন কোনদিন একখানা শতচ্ছিন্ন পুরাতন মহাভারত খুলিয়া পড়িতে বসে, আর কোনদিন বা পিতার নিকট বিষ্ণু পুরাণের গল্প শুনিয়া কাটাইয়া দেয়।

আজ খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেলে, তাহার ভিজা চুলগুলা শুকাইয়া লইবে ভাবিয়া গায়ত্রী উঠানের রৌদ্রে গিয়া বসিল। আহারাদির পর, ভুলি তাহার বাচ্ছাগুলিকে লইয়া ভাঙা প্রাচীরের ধারে শুইয়া আছে। গাঁয়ত্রী ভাবিতেছিল, বংশীর অফিসে যাইতে আজ দেরী হইয়া গেছে। আগামী কল্য তাহার মাহিনা পাইবার দিন,—কি হইবে কে জানে? এ-বয়সে বংশীর কি এই সংসারের বোঝা মাথায় লইবার কথা! না জানি তাহার কত কষ্টই না হয়। কিন্তু সেও তো কোনদিন কাহাকেও কিছু মুখ ফুটিয়া বলিবে না,—তাহার বেদনার অংশ কাহাকেও দিতে সে রাজী নয়। ভার?—সে যত গুরুই হোক্ একাকী বহন করিয়াই যেন তাহার আনন্দ! গায়ত্রী তাহার ব্যথায় প্রলেপ দিতে চায়, তাহার বেদনায় হাত বুলাইয়া গায়ত্রী তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ, নিরাময় করিয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টায় সদা সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া আছে, কিন্তু এই দুর্জ্জেয় ভ্রাতাটির বেদনা যে বুকের তলায় কোথায় লুকাইয়া থাকে, এত করিয়াও সে তাহা টের পায় না।

সম্মুখের গলি রাস্তা দিয়া মহা সমারোহে বিবাহ ফেরত বর-কন্যার একটা শোভাযাত্রা পার হইয়া যাইতেছিল। দেখিবার জন্য কৌতুহল জাগিতেই গায়ত্রী ছুটিয়া দরজার নিকট অগ্রসর হইতে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বঞ্চিত হিয়ার সঞ্চিত ব্যথা-বেদনা হঠাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল,—কোথায় যেন ঘা খাইয়া সেদিক হইতে গায়ত্রী তাহার প্রলুব্ধ দৃষ্টি সংযত করিয়া ফিরাইয়া লইল।

এমন সময় পাশের বাড়ীর কালো বিড়ালটা তাহাদের ঘরের ভিতর পাগলিনীর মত কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। তাহার ছোট বাচ্ছাটি প্রায়ই ওধারের ভাঙা প্রাচীর ডিঙাইয়া গায়ত্রীর রান্নাঘরে আসিয়া প্রবেশ করে, আর তার মা

এমনি করিয়া প্রায় প্রত্যহই কাঁদিয়া বেড়ায়! আজ যেন এই মাতৃত্বের বেদনা, বিড়ালটার এই আকুল ক্রন্দন তাহার নিজের বলিয়া মনে হইল। ছুটিয়া গিয়া রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দেখিল, ছোট বাচ্ছাটি উনানের ধারে মিউমিউ করিয়া মায়ের কাছে যাইবার জন্য ছট্ফট্ করিতেছে। একমুঠা ফুলের মত গায়ত্রী তাহাকে আকুল আগ্রহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কতগুলা যে চুমু খাইল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার মা তখন বংশীর ঘরে ঢুকিয়াছে। গায়ত্রী তাহার নিকট ছানাটি নামাইয়া দিতেই, সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোল দিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল। গায়ত্রী প্রাণ ভরিয়া এ দৃশ্য দেখিবার জন্য বংশীর খাটের উপর বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাচ্ছাটিকে মুখে তুলিয়া লইয়া বিড়ালটা অন্যত্র চলিয়া গেল। সে কিন্তু সেখান হইতে উঠিতে পারিল না। একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। শোভা-যাত্রার ব্যাণ্ড-ব্যাগ্‌পাইপ যেন কোন্ সুদূর হইতে তখনও তাহার কাণে আসিয়া বাজিতেছিল। তাহার প্রাণে আজ এ বঞ্চিত মাতৃত্বের ক্ষুধা, ব্যর্থ জীবন যৌবনের ক্ষুব্ধ হাহাকার, এমন নিরুপায় নিষ্করুণভাবে কেন জাগিল? তাহার চোখ দুইটা আপনা হইতে জলে ভরিয়া আসিতেছিল। মাথা নত করিয়া, চোখ বুঁজিয়া গায়ত্রী আত্মসমাহিতভাবে কত কথা ভাবিতে লাগিল।

বংশী অফিস যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আবার যে কোন্ সময় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে গায়ত্রী সেকথা জানিতে পারে নাই।

ঘরে ঢুকিয়াই বংশী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঝড়-তুফান এবং উত্তাল তরঙ্গমালা লইয়া গায়ত্রীর বুকের তলে সিন্ধু যে আজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ তাহার নিকট অবিদিত রহিল না। তবুও দরজার নিকট যেমনভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেইখানে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া, অথচ যেন দিদির কত কাছে আসিয়া কহিল, কি ভাব ছিস্ দিদি?

ভ্রাতার সহানুভূতি-করুণ এই দুটি কথায় যেন বিশ্বের মমতা ঝরিয়া পড়িল!

হঠাৎ তাহার অতর্কিত প্রশ্নে গায়ত্রী চমকিয়া মুখ ফিরাইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোর বৌএর কথা ভাব্‌ছি।—বংশী, তুই বিয়ে কর্।

—সেজন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না। আমি নিজেই ভাব্‌ছি। বলিয়া জামা জুতা খুলিয়া বংশী শয্যার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

—তুই যে অফিস গেলিনে বংশী?

—না।

—অসুখ-বিসুখ করে নি ত? শুয়ে পড়্‌লি যে? বলিয়া গায়ত্রী তাহার শিয়রের নিকট সরিয়া গিয়া মাথায় গায়ে হাত দিয়া বলিল, ও। এম্‌নি দেরী হ'য়ে গেল বলে গেলিনে, নয়?—কাল ত মাইনে পাবি?

হাসিতে হাসিতে বংশী বলিল, হ্যাঁ। কেন?

বংশীর চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে গায়ত্রী বলিল, কাল ফের্‌বার সময় বাবার ওষুধ আনিস্‌। চায়ের কেট্‌লিটা ফুটো হ'য়ে গেছে, একটা কেট্‌লিও আন্‌বি। এদিকে রান্নার সব জিনিষই ত কিন্‌তে হবে।

বংশী আবার হাসিল। বলিল, তারপর?

—এ মাসে তোর গায়ের একটা র‍্যাপার কিনে ফেল্‌ না? খদ্দরের চাদরটা বড় পাৎলা।

বংশী এবারেও হাসিল।

গায়ত্রী একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—না, হাসি নয় লক্ষ্মীটি, কিনো।

বংশী ঈষৎ হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, কিন্তু এক মাস হোলো আমার চাক্‌রীটি গেছে,—তোদের বলিনি।

ভাল। বলিয়া গায়ত্রী একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

মাথা-গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে যে সে সকল গণনার অতীত।

"জ্যাঠামশায়"

অশোক

—শ্রীঅনুপম গুপ্ত।

শীতের রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই সবাই ঘরে যায়, শীতের রাত্রে বেশীক্ষণ কেউ বাহিরে থাকে না। তখন রাত্রির মুখে সাড়া নাই, সে স্বপ্নের নিস্তব্ধতায় এলিয়ে পড়েছে। আকাশের তারাগুলিও চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে অন্ধকারে চোখ বুঁজেছে, কেবল তন্দ্রালস দৃষ্টিতে একটি চাঁদ মায়ের মত পৃথিবীর মাথার কাছে জেগে বসে আছে।

এম্‌নি ধারা গভীর রাত্রে একজন পথিক রাজপথের নির্জ্জনতা মুখরিত ক'রে ধীরে ধীরে পথ চলেছে। তার যেন কোথাও যাবার তাড়া নাই, সমস্ত রাত্রি-টাকে চল্‌তে চল্‌তে শেষ ক'রে দেবে বলেই যেন সে বিরামহীন জাগরণকে চোখে ক'রে চলেছে। বুঝি এত অলস, এত নিষ্কর্ম্ম সে। . . .

উষার আলো যখন পাখীর চোখের ঘুম ভেঙ্গে দিল, তখন অশোক দেখ্‌ল সে তার বিছানার উপর বসে আছে। কখন যে সে ঘরে ফিরেছে, কখন এসে সে বিছানায় বসেছে কিছুই তার মনে পড়্‌ল না।

অশোক, হাঁ তার নাম অশোক। তার মনে পড়্‌ল, দিনের পর দিন বহু কাল ধরে সে এ নাম শুনে এসেছে। তবু তার আজ আবার নতুন ক'রে মনে পড়্‌ল তার নাম অশোক। অশোক—দুর্জ্জয় অশান্ত নিষ্ঠুর অশোক! কোনও আঘাতকে সে ফিরিয়ে দেয় নি, কোনও ব্যথাকে সে এড়িয়ে থাকে নি, কোনও শূন্যতাকে সে তাড়িয়ে দিতে চায় নি। হাঁ, এই সেই অশোক বুঝি? . . .

ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হ'ল একটু বিশ্রাম করবে। একটু গা এলিয়ে দিয়ে মাথাটি রাখ্‌তে যাবে এমন সময় তার মুখ দিয়ে শব্দ উঠ্‌ল—মাগো!

রাত্রি শেষের দিকেই অশোকের মার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি এম্‌নি ধারা একটি অসহ্য যাতনার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে পুত্রের ঘরে গিয়ে বল্‌লেন, অশোক কি হ'য়েছে?

অশোক হেসে বল্‌ল, কিছু ত না মা। ডাক্‌তে বড় ইচ্ছে কর্‌ছিল, তাই ডাকছিলাম।

মা গিয়ে ছেলের কপালে হাত দিলেন। অশোক পাগলের মত মাথা দোলাতে দোলাতে বলে উঠ্‌ল—না মা। হাত দিও না। আমাকে বুঝ্‌তে দাও, আমার কেউ থাক্‌বে না। তুমি যদি চলে যাও—পৃথিবী ছেড়ে, আর আমি যদি বেঁচে থাকি, আমার অসুখও থাক্‌বে, আমার সুখও থাক্‌বে। তখন? তখন কি কর্‌ব? কিছু কোরো না আমাকে। আমাকে যত্ন কোরো না, আমাকে আদর কোরো না। স্নেহের মাধুরী দিয়ে আমার বাস্তবকে স্বপ্নের জাল দিয়ে আড়াল ক'রে রেখ না। আমার জীবনকে, আমাকে স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে দাও, আমাকে জান্‌তে দাও আমার দুঃখ কতখানি, আর তা সইবার মত শক্তি কতখানি।

শীতের প্রভাতের কুহেলি-ঘেরা শিশির ফোঁটার মত মায়ের চোখের পল্লবের উপর অশ্রুর বিন্দু টল্ টল্ কর্‌তে লাগ্‌ল। মায়ের কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল। তিনি প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই বল্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু অশোক, কেমন ক'রে জান্‌লি কেউ থাক্‌বে না? এ তোর নিজকে অপমান করা, এ তোর অন্যায় বিদ্রোহ।

মা, মা,—অশোক চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, জানি, জানি, আমি শতবার ক'রে জেনেছি। দুঃখকে দেখেছি সে সারা দিনরাত আমাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখেছি, আমার জীবনের গ্রীষ্মে, বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে, মরণ-জয়ের বীজ বুনে গেছে। সমস্ত জীবন ধরে অশ্রু ফেলে ফেলে যে ফসল ফল্‌বে, তাকে কি সুখের হাতে মূর্খের মত তুলে দিতে বল? সুখ? সে ত রাজার মত আমার দুঃখের শস্য লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে! তারপর? আমার আর কোন্ ধন আছে যা দিয়ে আমি পৃথিবীর কাছ থেকে কিছু চাইতে পার্‌ব?

মা ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন, সারা রাত বুঝি জেগে আছ, একটু শোও অশোক। আস্‌বে সে, যে তার সকল বিত্ত দিয়ে তোমার দুঃখকে কিনে নেবে। সে এলে তাকে কি ফিরিয়ে দেবে?

অশোক উঠে জানালাটা খুলে দিল। তারপর আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখিয়ে বল্‌ল, ঐ চেয়ে দেখ মা, ঐ যে শীতের বাতাসে রক্ত করবীটা শির্ শির্ ক'রে কাঁপ্‌ছে তুমি কি বল্‌তে চাও, ঐ ফুলটাও চায় না প্রকাণ্ড পৃথিবীর মাটীটার উপর একটু খানি ঠাঁই পায়, যার উপর সে একবার নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়্‌তে পারে?

মায়ের প্রাণে যে ব্যথা গিয়ে নীরবে আঘাত কর্‌ল তারই শব্দে, তারই যাতনায় মা ডেকে উঠ্‌লেন—অশোক, জানিস্ তুই কি বল্‌ছিস্?

অশোক তার ভারী ভারী চোখের পাতা তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—জানি মা। জানি মা, আমি যা বল্‌ছি, তা ভয়ানক সত্যি। এর চাইতে সত্যি বুঝি কিছু হ'তে পারে না। তাই তোমার কাছে বল্‌তেও আমার একটু কষ্ট হয় নি।

কে একলা থাকৃতে চায়। এমন যে নিরালা রাত্রি সেও তার দোসর খুঁজে বেড়ায়। সে বিনিদ্র পথিকের চোখের পাতার উপর উঁকি মেরে বলে, আছ? জেগে আছ? বন্ধু।—পথিক কেঁপে উঠে বলে—কে বন্ধু? ডেকো না, ডেকো না অমন ক'রে। রাত্রি বলে, বিশ্বাস কর আমাকে। তুমি গাইবে ঘুম ভাঙ্গানি সুর, আমি পাশে দাঁড়িয়ে নিত্য শুন্‌ব সে গান। পথিক অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বলে, তুমি কি দরদী? কই দেখি তোমার বুক। . . . অন্ধকার তার নিবিড় কৃষ্ণ নিস্তব্ধতার উপর পথিকের মাথাখানি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে বলে, এই যে আছ বুকে।

* * *

মা ডেকে উঠ্‌লেন, অশোক, অশোক!

সূর্য্যালোকের একটা সোনালি তীর অশোকের বুকের উপর প'ড়ে বল্‌ল, অশোক, শোকাতীত, মাটীর বুকে সে মাথা রেখেছে।

আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

"শচীশ"

ভবিতব্য

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী

১

অনেক দিন আগে,—যে দিন মনোরমার সহিত অবনীশের বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, সেদিন পাড়ার অনেকগুলি হিতাকাঙ্ক্ষী অবনীশের মঙ্গল-কামনায় এ প্রসঙ্গে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আরে ছিঃ—তাও কি হয়? মেয়ের মায়ের যে বড় বিষম রোগ,—ও যে যক্ষ্মা, ওই পেটের মেয়ে এনে কি শেষে বংশটা নষ্ট করবে।"

অবনীশের জননী সত্যই এত বড় কথাটাকে একদম তাচ্ছিল্য করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ তিনি দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ্য ভাবেই বলিলেন, "তা কি ক'রে হবে? আর অবনী আমার এখন মানুষ হয়েছে, তার যেখানে ইচ্ছে হবে দেখে শুনে বিয়ে করবে।"

মনোরমার পিতৃব্য এ কথার উপর আর কোন যুক্তি চলে না বুঝিয়া মেঘাচ্ছন্ন মুখেই ফিরিতে বাধ্য হইলেন। বাড়ীতে গিয়া শুষ্ক মুখে মনোরমার মাকে বৃত্তান্তটী জানাইয়া একবার সস্নেহে মনোরমার শান্ত সুন্দর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হতাশ ভাবে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন।

কিন্তু ভবিতব্যের অখণ্ড নিয়ম প্রতিরোধ করিবার মত সামর্থ্য লইয়া পৃথিবীতে কেহ জন্মায় নাই। মাস ছয়েকের ভিতরেই মনোরমার ভাগ্যে অবনীশের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর একটী সুপাত্র জুটিল এবং দিন পনের'র মধ্যে যথা নিয়মে শুভকার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঁচ রঙে রঙীন করিয়া পাঁচ জনায় কথাটা অবনীশের জননী শ্যামাসুন্দরীর কাণের কাছে আনিয়া ধরিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিল না। শ্যামাসুন্দরীও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে।"

প্রতিবেশিনীর দলও স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া বিজ্ঞের মত কাজের অছিলা জানাইয়া আপন আপন গৃহে ফিরিল।

তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর তিনিও হাতের অসমাপ্ত কাজটুকু ফেলিয়া রাখিয়াই একবার অবনীশের উদ্দেশ্যে গৃহের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অবনীশ তখন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন একটা বিষয় বড় একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতেছিল,—শ্যামাসুন্দরী তাহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মনোর বিয়ে হ'য়ে গেল রে অবনী।"

মাতার কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে সঙ্গে অবনীশের চিন্তাসূত্র অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িল, সে শান্ত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "তা আমি জানি—আরো জানি কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল; কারুর অভাবে কারুর কিছু আট্‌কায় না মা।"

২

"আজ আর যাওয়া হ'ল না দেখ্‌ছি।"

"না পারলে আর কি ক'রে যাবে?" বলিয়া মনোরমা শান্ত চোখ দুটী স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। সুশান্ত একটু কি ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু কাজটা যেন একটু অন্যায় বোধ হচ্ছে।"

"তবে পার যাও।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়া মনোরমা নীরব হইয়া রহিল।

"তাকে না হয় এখানে নিয়ে আসা যাক,—সত্যি মনো, একলাটী সে মেসে পড়ে আছে,—আর বাড়ী, সেখানেই বা যাবে সে কার কাছে! সেখানে ত কেবল তার শূন্য বাড়ীখানা চাবি বন্ধ পড়ে রয়েছে মাত্র। আপনার ব্যথার ব্যথী বল্‌তে জগতে যে তার কেউ নেই, ওকে দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।"

কথা কয়টী শেষ করিয়া সুশান্ত নীরব হইল। মনোরমাও কি জানি কেন কোন উত্তরই করিল না। খানিক পরে সুশান্ত আপনিই আবার বলিল—"একটু ভাব্‌ছি কি জান মনো, এক রুগী এনে তোমাকে আবার বিব্রত ক'রে ফেল্‌ব।"

মনোরমা ঈষৎ গম্ভীর মুখে উত্তর দিল "আমি বিব্রত হব, এই ভাবনায় তুমি কর্ত্তব্য ছাড়্‌বে! তোমার বিবেক যা তোমাকে ভাল বল্‌ছে তা তুমি কর্‌বে না, এটা যে বড় অসঙ্গত রকম লাগ্‌ছে!"

"অসঙ্গত লাগ্‌ছে তোমার, তবে আন্‌ব তাকে? অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম সত্যি মনো আজ তোমার মুখে একথা শুনে।" বলিয়া সুশান্ত একবার উৎসুক দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের দিকে চাহিল।

মনোরমা সহজ সুরে বলিল "তোমার কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে তার উপরে উঠ্‌তে মনোরমা আদৌ রাজী নয়, ছি—তা ভাব্‌তেও যে নিজের লজ্জা করে।"

"তবে যাই—অবনীশকে নিয়ে আসিগে, আর দেরী কর্‌ব না।" কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সুশান্ত আর উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেল।

দূর আকাশের দিকে অনেক ক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া মনোরমা আজ অতীতের কথা বড় গভীর ভাবেই ভাবিল। তার বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ আট বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামীর অসীম প্রীতিতে তার অন্তরের কোন স্থান বিন্দুমাত্র অপূর্ণ নাই, কোন ব্যথা নাই,—তবু তার মনে পড়িতে বাকী রহিল না। অবনীশের মায়ের নিকট তার পিতৃব্যের সেই অপমান। তারপর কাল-স্রোতে কোথায় কি ভাসিয়া গিয়াছে,—তিনি স্বর্গগামিনী হইয়াছেন, তার পিতৃব্যও এখন স্বর্গে। কিন্তু সে স্মৃতির একটুও ত কই তার অন্তরে মলিন হয় নাই। আরো মনে পড়িল, বিবাহের বৎসর যখন সে অবনীশকে বিজয়ার প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অবনীশ একটু উদাস হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমাকে প্রণাম কর্‌তে হবে মনো! তা ওই দূর থেকে সেরে নিলেই চল্‌বে।" কি যেন একটা সুর সেদিন সেই কথা কয়টীর মধ্যে মিশ্রিত ছিল, যাহা সে এতদিনেও বুঝিতে পারে নাই।

৩

শ্রান্ত শীর্ণ শরীরটাকে শয্যার উপর বিছাইয়া দিয়া, সম্মুখের উদার আকাশের বুকে আপনার দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া অবনীশ তখন কি যেন একটা বিষয় ভাবিতেছিল। প্রাচীর বুকে তখন প্রভাত তপন নব জাগরণের বাণী ঘোষণা করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখনো দূর্ব্বাসংলগ্ন নীহার কণিকা সম্পূর্ণরূপে শুখায় নাই।

সুশান্ত ঘরের ভিতর আসিয়া প্রশ্ন করিল "শরীরটা এখন ক্রমে ক্রমে সুস্থ বোধ হচ্ছে, কেমন অবনীশ?"

অবনীশ দৃষ্টি ফিরাইয়া উত্তর দিল "হাঁ আজ-কাল ভালই আছি, অনেক দিন তোমাদের বিব্রত কর্‌লাম, এইবার আমার যাবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দাও সুশান্ত!"

"সে উপায় গায়ে আর একটু শক্তি হ'লেই হবে তার জন্যে তোমাকে

একটুও ভাব্‌তে হবে না।" বলিতে বলিতে সুশান্ত হাতের সংবাদপত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। অবনীশ আর কোন প্রতিবাদ করিল না, নীরব স্তব্ধভাবে বিছানার উপর চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। সমস্ত ঘরখানি আবার পূর্ব্বের মতই স্থির নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল।

বেশ কিছুক্ষণ এই রকম ভাবে কাটিবার পর সুশান্ত সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আর ত আমার দেরী কর্‌লে চল্‌বে না, যা হোক্ দুটো খেয়ে নিয়ে ছুট্‌তে হবে,—তোমার যখন যা দরকার হবে মনোরমাকে জানিও, বুঝেছ ?"

অবনীশ স্থিরভাবে একবার সুশান্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমার জন্যে আর তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, এখন আর আট্‌কে থাক্‌বে না !"

"পরের বাড়ী ভেবো না, এইটুকুই আমার অনুরোধ।" কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইয়া গেল।

নির্জ্জন গৃহের ভিতর একলা থাকিয়া অবনীশের চিন্তা বাধাহীন ভাবে বহিয়া চলিল। কতদিনের কত কথা তার অন্তরের ভিতর আসিয়া অশান্ত শিশুর মতই ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল।—মনে পড়িল—সুদীর্ঘ আট বৎসরের ইতিহাস,—ইহার ভিতর তার জননী স্বর্গগতা হইয়াছেন, তারপর তিনি যাহাকে আনিয়া তাহার জীবন-পথের সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলেন—সেও বৎসর অতীত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত দেনা-পাওনা শোধ করিবার আগেই চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। বিবাহের সেই কয়দিন ব্যতীত তাহাকে চিনিবারও সে সুযোগ পায় নাই। তারপর,—তারপর সে নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবেই দিনের পর দিন কাটাইয়াছে,—একি স্পন্দন-হীন অসাড় জীবন সে বহন করিতেছে, তার অন্তরের এই বিরাট দৈন্য বহন করিয়া দিন কাটাইতে আর বুঝি সে পারিবে না! সে যে এখন বড় শ্রান্ত! একটু স্নেহ প্রীতির জন্য তার সমস্ত প্রাণটা যে আজ বড় উন্মুখ!

খানিকটা গরম দুধ হাতে করিয়া আনিয়া এই সময়ে মনোরমা ডাকিল "অবনীশদা দুধটা খেয়ে নিন।"

এই একটী মাত্র ডাকে তার সমস্ত প্রাণটা আজ বড় উতলা হইয়া উঠিল, সহসা উভয় চোখ জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। মনোরমার অলক্ষ্যে ব্যস্তভাবে সে তাহা রুমালে মুছিয়া হাত বাড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "দাও মনো।"

"এতদিন যা হোক্ এক জায়গায় এক দেশে ছিলাম। তবু তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের আশাটাও ছিল, এবার অনেকখানি দূরে যেতে হ'ল মনো।"

কথা কয়টী শেষ করিয়া অবনীশ উদাস দৃষ্টিতে অপরাহ্নের উদাস আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাহ'লে আজই যাচ্ছ অবনীশদা, কেন আর দুদিন থাক্‌লেও তো পার্‌তে।" বলিয়া মনোরমা মুখখানা ঈষৎ নত করিয়া দাঁড়াইল।

"না—এম্‌নি অসুখে পড়ে অনেক দেরী হয়েছে, আর নয়,—তোমাদের উপর অনেক উপদ্রব করেছি।"

"আমাদের তো উপদ্রব বলে মনে হয়নি, অবনীশদা! আপনি কেন তা ভাবছেন!" দুঃখিতভাবে মনোরমা কথা কয়টী উচ্চারণ করিল।

"তা আমি নেহাত না জানি, তা নয় মনো, সুশান্তের মত বন্ধু যে খুব কম লোকের ভাগ্যে জোটে তাও বুঝি—"

বলিতে বলিতে অর্দ্ধ পথেই অবনীশ চুপ করিল। মনোরমা পূর্ব্বের মতই নীরবভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরেই হঠাৎ অবনীশ আবার বলিল,—

"তা হ'লে যাই মনো, সুশান্ত আমার জন্যে বাইরে বসে আছে, গাড়ী এসেছে দেখে এসেছি।"

তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া মনোরমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"একটু দাঁড়ান, প্রণামটা নিতেও কি আপনার সময় হবে না?"

একটু করুণ হাসি হাসিয়া অবনীশ উত্তর দিল, "প্রণাম নেবার অনেক আগে হ'তেই তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছি মনো,—এমন মহৎ অন্তকরণ নিয়ে এম্‌নি সুখেই তোমার দিন কেটে যাক্।"

উত্তরের আর প্রতীক্ষা না করিয়াই অবনীশ ব্যস্ত ভাবে গৃহত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারেই তার ভিতরটায় একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। আজ যেন সত্যই সে তার পিছনে তার বড় প্রিয়, বড় প্রয়োজনীয় কিছু রাখিয়া গেল! তার অন্তরের অন্তরালস্থিত অপরিসীম দৈন্য যেন আজ মূর্ত্তি ধরিয়া নিবিড় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

মা-হারা

—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়।

১

হরিপুর ছোট্ট একটী গ্রাম, অতি অল্প লোকেই বাস করে সেখানে। হরিপুরের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটী নদী কুল কুল ধ্বনিতে ছুটে চলেছে ; তার জলটী ঠিক যেন কাঁচের মত। গ্রামের উপান্তে নদীর ধারে একটী আম কাঁটালের বাগান ছোট্ট একটী কুটীর বুকে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কুটীরটীতে বাস করে তিনটী প্রাণী —স্বামী স্ত্রী আর তাদের বুক-জুড়ান ধন একটী ছোট্ট মেয়ে, যেন কচি ফুলের কুঁড়ি। পুরুষটীর নাম নরেন্দ্র। গ্রামের জমিদারের সেরেস্তাদারের কাজ ক'রে যা পায়, তাতেই তার আর তার স্ত্রীর অন্নসংস্থান হয়। বেশ সুখেই দিনাতিপাত করে ; এক বছর হ'ল এই শিশুটী তাদের সুখের সংসারে এসে তাদের সুখের মাত্রাটি খুব বাড়িয়ে দিয়েছে।

সূর্য্যদেব যখন পূর্ব্বাকাশে উঁকি ঝুঁকি মারেন, পাখীগুলি যখন শাখায় শাখায় গেয়ে ওঠে ফুলের ঘুমন্ত পাঁপড়িগুলি যখন সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে চোখ মেলে তাকিয়ে ওঠে, নিশাদেবী যখন আকাশের ভালে একটা বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে চলে যান, তখন নরেন্দ্র তার স্ত্রীকে সাদর সম্ভাষণ করে, আর তার বড় আদরের মেয়েটীকে চুমো খেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। আবার ঠিক দুপুর বেলা কাজ থেকে ফিরে আসে।

দিন যায়—দিন কারও অপেক্ষায় থাকে না। তবে সুখের দিনগুলির গতি নাকি একটু বেশী, তাই নরেন্দ্রের দিনগুলি যেন একটু তাড়াতাড়িই কেটে যাচ্ছিল। নরেন্দ্রের মেয়েটী এখন পাঁচ বৎসরের। কুঁড়ি থেকে ফুল যেন সদ্য ফুটে উঠেছে। মেয়েটীর নাম রাখা হয়েছে নীলিমা। স্বামী-স্ত্রীতে ভগবানের দেওয়া এই দানটীকে বুকে ক'রে বড় সুখেই দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু হায় এত সুখ বুঝি তাদের ভাগ্যে সইল না—তাদের সুখের পাল্লাটা বোধ হয় বড্ড বেশী ভারী হ'য়ে গিয়েছিল তাই বুঝি বিধাতা তাদের আর এক পাল্লায় দুঃখের ভাগটা একটু বেশী ক'রেই চাপিয়ে দিলেন।

একদিন দুপুর বেলা নরেন্দ্র কাজ থেকে ফিরে এসে বল্লে, মা-নীলি, এক গ্লাস জল আন্‌তে বল ত তোমার মাকে। নীলি ছুটে গিয়ে তার মাকে জল আনতে বল্‌ল—তার মা তখনি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল।—নরেন্দ্র বল্লে, দেখ, আজ আর কিছু খাব না, শরীরটা তত ভাল নয়। শীতও করছে একটু একটু, বোধ হয় জ্বর আস্‌ছে।—একটা গায়ের কাপড় দাও।—” কাপড় গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল—ঘণ্টা খানেক পরে তার সত্যই ভয়ানক জ্বর এল।

২

উক্ত ঘটনার পর দু বৎসর কেটে গেছে। নরেন্দ্রের সৌভাগ্যাকাশে দু বৎসর পূর্ব্বে যে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিয়েছিল সেই মেঘটা এখন ঘন ঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে সে সৌভাগ্যাকাশকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে—সুখ-রবি ঐ কাল মেঘের অন্তরালে পড়ে আছে। চারিদিক অন্ধকার—নিঝুম নিস্তব্ধ। একটা বড় ঝড়ের আশঙ্কায় সব মূক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।—

নরেন্দ্রের সেদিন যে জ্বর এসেছিল সে জ্বর আর ছাড়েনি। মাস খানেক ভোগার পর যখন দেখ্‌লে যে জ্বর ছাড়্‌বার কোন লক্ষণই নাই তখন নরেন্দ্র তার জমিদারকে বলে এক বিজ্ঞ ডাক্তার আনালে।—ডাক্তার দেখে বল্লে রোগীর এ সাধারণ জ্বর নয়—বোধ হয় ক্ষয়রোগে দাঁড়াবে। আর দাঁড়ালও তাই। নরেন্দ্র আজ দু বৎসর শয্যাশায়ী—তার রূপ-যৌবন সব একে একে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, কেবল প্রাণটা এখনও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে চলে যেতে পার্‌ছে না। নরেনের মুখের জ্যোতি এখন নিষ্প্রভ, তার দেহ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর নরেনের স্ত্রীর অবস্থা? তার অবস্থা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না।—স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা যে কি দুঃসহনীয় ব্যাপার, তা বর্ণনা করা অসাধ্য। ফাঁসির হুকুম হ'য়ে গেছে—কেবল ফাঁসিকাঠে ঝোলানর অপেক্ষা মাত্র। আর নীলিমা, নরেনের বড় আদরের নীলিমার মুখে আর সে হাসি নাই, তার হৃদয়ে আর সে উল্লাস নাই সে আর বাগানে ছুটোছুটি ক'রে প্রজাপতি ধরে না—কুটীরের মধ্যে তার বাবার শিয়রে চুপ ক'রে বসে থাকে, আর বসে বসে তার বাবার শীর্ণ মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'লে ফুল যেমন তার প্রভা অনেকটা হারিয়ে ফেলে সেই রকম নরেনের সংসারাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়

তার এই আধ-ফোটা ফুলটীও আজ নিষ্প্রভ—তার প্রভা যেন কোথায় চলে গেছে। দিন চলেছে—দুঃখের দিন বলে যেন দিনগুলি আর যেতেই চায় না!

নরেন্দ্রের স্ত্রী নরেন্দ্রের পাশে বসে—পাশের ঘরে নীলিমা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখন প্রায় তিনটে, হঠাৎ নরেনের আর্ত্ত স্বর শুনে তার স্ত্রী চম্‌কে উঠ্‌ল, সে ভাবতে ভাবতে চিন্তা রাজ্যের সীমানায় গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, সহসা পরিচিত স্বর শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল।—নরেন অতি কষ্টে বল্লে, দেখ নীলিকে একবার আমার বুকের উপর দাও, মরবার আগে তাকে একবার বুকে ক'রে নিই। নরেনের স্ত্রী চোখে কাপড় দিয়ে তাড়াতাড়ি নীলির কাছে গেল, তারপর চোখের জল সংবরণ ক'রে নীলিকে নিয়ে এসে তার স্বামীর বুকের উপর দিল। নীলিমা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তারপর যখন সে দেখ্‌লে যে সে তার বাবার বুকের উপরে, তখন তার মুখে এতদিন পরে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। এই আড়াই বৎসর তাকে তার বাবার কোলে উঠ্‌তে দেওয়া হয়নি—কেন তা সে জানে না। সে মনে কর্‌ল যে এবার থেকে সে আবার আগেকার মত তার বাবার কোলে উঠ্‌তে পাবে।—হায়, অবোধ বালিকা বুঝ্‌লে না যে এই তার শেষ কোলে ওঠা।—

রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। নরেনের স্ত্রী এতক্ষণ থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে, নীলিমাও সেই থেকে তার বাবার বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। কেবল নরেন একা জাগ্রত—সে একবার তার স্ত্রীর মুখের দিকে, আবার একবার তার স্নেহের কন্যা নীলিমার দিকে তাকাচ্ছে, আর সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌ছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতর ধ্বনি তার মুখ থেকে বার হচ্ছে। ঘরের কোণে একটা মাটীর প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিবে যাবার যোগাড় হয়েছে।

সহসা নরেনের অস্বাভাবিক কাশির শব্দে তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখ্‌লে যে রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে, আর নরেন নেতিয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি নীলিমাকে নরেনের বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বাইরে জল আন্‌তে ছুটে গেল। জল এনে নরেনের চোখে মুখে দিতে নরেন চোখ মেলে তাকাল—সে চাহনির মধ্যে অতৃপ্ত প্রাণের চির বিদায়ের কথাটি স্পষ্ট লেখা!

পাশের একটা জান্‌লা দিয়ে বাতাস এসে যে প্রদীপটী এতক্ষণ ঘরের কোণে টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে জ্বল্‌ছিল—সেটা নিবে গেল। নরেনের স্ত্রী নরেনকে

ভয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লে "ওগো এই অন্ধকারে আমাদের ছেড়ে তুমি পালাতে পাবে না গো।"

৩

"মা নীলি একটু জল দেনা মা! ও ভগবান্ নাও, আর ত সইতে পারি না।"—কুটীরের মধ্যে এক রুগ্না নারী আর্ত্তকণ্ঠে এই কথা কটি বলিল।

নরেনের হতভাগিনী বিধবা স্ত্রী। নরেনের মৃত্যুর পর থেকেই বিছানা নিয়েছে আর ওঠেনি। আজ তিন চার বছর হ'ল এই অবস্থা। ছ' মাস হ'য়ে গেল ডাক্তার বলেছে যে কাশ রোগীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এঁরও কাশ রোগে দাঁড়িয়েছে আর তা ছাড়া এঁর মানসিক দুর্ব্বলতা বড় বেশী, কাজেই জীবনের আশা খুব কম।

মার ডাক শুনে নীলি তখনি এক গ্লাস জল নিয়ে এল। নীলির বয়স এখন দশ এগার বৎসর। সে এখন কৈশোরে পদার্পণ কর্‌তে চলেছে—তার মুখ ম্লান, সব সময়েই যেন কি একটা ভাবে, বোধ হয় ভাবে যে তার বাবা গেছেন, মাও যদি যান, তবে এ সংসারে সে কার কাছে আশ্রয় নেবে!

শেষকালে একদিন সত্যসত্যই নরেনের স্ত্রীর কাছে মরণের দূত এল। সে তার সঙ্গে মৃত্যুর পরপারে চলে গেল। যাবার আগে নীলিমা বুকের উপর আছ্‌ড়ে পড়ে বল্‌ল "মা আমায় কার কাছে রেখে যাচ্ছ মা, আমি যে একলা থাক্‌তে পার্‌ব না।" তার মা বল্লে "মা জগন্মাতার কাছে তোকে রেখে গেলাম তিনিই তোকে দেখবেন!"

৪

"ও পাগ্‌লি—দেখ্ দেখ তোর জগন্মাতা ঐ ঝোপের ভেতর আছে।"

"ও পাগ্‌লি, জগন্মাতাকে দেখ্‌বি—ঐ দেখ্ তোর জগন্মাতা আস্‌ছে।"

একটী বালিকা—তের বৎসর আন্দাজ বয়স তার—তার পরণে একখানি ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, তাকেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা 'পাগ্‌লি' 'পাগ্‌লি' বলে ক্ষেপাচ্ছে।

এ বালিকাটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা নীলিমা। তাকে এখন আর বিশেষ কেউ তাকিয়ে দেখেও না। একদিন সে নরেন ও তার স্ত্রীর বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। তার মুখের হাসিটুকু দেখবার জন্য তারা প্রাণ

দিতে পার্‌ত—আর সেই নীলিমা আজ পথের ভিখারিণী, লোকে তাকে 'পাগ্‌লি' বলে ডাকে। সংসারের নিয়মই বুঝি এই! যে ফুল একদিন গাছে থেকে নিজের গন্ধে, সৌন্দর্য্যে চারিদিক আকুলিত, আমোদিত করে, সেই ফুলই আবার একদিন সকলের পদদলিত হয়! তাই বুঝি নীলিমার আজ এই অবস্থা!

আজ সাত মাস হ'ল তার মার মৃত্যু হয়েছে। এই সাত মাস ক্রমাগত সে তার জগন্মাতাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। সে যাকে পেয়েছে, জগন্মাতার খোঁজ জিজ্ঞাসা করেছে—তাই সকলে তাকে 'জগন্মাতা পাগ্‌লি' বলে ডাকে।

তার কচি সুন্দর মুখখানি দেখে কারও কারও দয়া হয়, কেউ দুটো খেতে দেয়, কেউ বা দুটো পয়সা দেয়।

শরৎকাল। সবুজ ক্ষেতের ধানগুলি আজ পেকে উঠেছে—সূর্য্য কিরণ এসে ধানের ওপর পড়ায় ধানগুলি সোনার মত ঝক্‌মক্ কর্‌ছে, আর সেই ধানের ওপর দিয়ে শরতের মৃদু মন্দ বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কাননে কাননে দোয়েল ডাক্‌ছে, কোকিল গাইছে। সুর কখনও উঠ্‌ছে, কখনও নাম্‌ছে। সে সুধামাখা সঙ্গীত পৃথিবী ভাসিয়ে দিচ্ছে।

আগমনী উপলক্ষে চারিদিকে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে আজ আনন্দের রোল উঠেছে। অদূরে জমিদার গৃহে সানাই মধুর সুরে তান ধরেছে। সকলের মুখেই 'মা আস্‌ছেন, জগন্মাতা আস্‌ছেন' রব। সকলেই আজ আনন্দ-সাগরে গা ঢেলে দিয়েছে। আজ আমাদের পাগলিনী নীলিমারও ম্লান মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আজ এই সাত আট মাসের অক্লান্ত অন্বেষণের পর সে আজ তার জগন্মাতার খোঁজ পেয়েছে। তার ডাক শুনে জগন্মাতা বুঝি আজ ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

জমিদার গৃহে পূজার দালানে প্রতিমা বিরাজিত। পূজা হচ্ছে—ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি আর তার সঙ্গে ঢাকঢোলের শব্দে কান ঝালাপালা হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলে মেয়েরা সকলেই নতুন নতুন কাপড় জামা পরে আনন্দে পূজা বাড়ীতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কেবল একটীমাত্র দরিদ্রা বালিকা ছেঁড়া কাপড় পরে মলিন বদনে রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনাথা মায়ের শোকে পাগলিনী নীলিমা।

সকল ছেলে মেয়েই প্রফুল্ল বদনে জগন্মাতাকে দেখ্‌তে আস্‌ছে, সেও তন্ময় হ'য়ে মায়ের রাঙ্গা চরণ দেখ্‌বে বলে তাদের সঙ্গে আস্‌ছিল। সে আজ আনন্দে

বিভোর, আত্মহারা। সহসা জমিদার বাড়ীর দেউড়ির কাছে এসে তার চমক্ ভাঙ্‌ল। হঠাৎ দরোয়ানের কর্কশ স্বর তার আনন্দ-স্রোতের ধারা উজান বইয়ে দিলে। সে দেখ্‌লে তার ভিতরে প্রবেশের অধিকার নাই। সে তাই বুকভরা হতাশা নিয়ে ম্লানমুখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী খুব ধুমধামের মধ্য দিয়েই কেটে গেল। এই ক'দিন 'জগন্মাতা পাগ্‌লিকে' দুএক বারের বেশী কেউ দেখ্‌তে পাইনি। সে প্রথম প্রথম এদিক্ ওদিক্ ঘুরছিল মাকে দেখ্‌বার একটু ব্যর্থ প্রয়াসে। কিন্তু তারপর সে যখন দেখ্‌ল যে কোন আশা নাই তখন নির্জ্জনে বসে তার মৃতা মার উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছিল।

পরদিন বিজয়া-দশমী—নীলিমা সেদিন শুন্‌লে যে আজ তার জগন্মাতা চলে যাবেন। তখন মা-হারা নীলিমা আর থাক্‌তে পার্‌লে না—দরোয়ানের রক্তবর্ণ চক্ষুকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে প্রতিমার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু দরোয়ানের ধাক্কা খেয়ে বেলাহত তরঙ্গের মত দেউড়ির বাইরে এসে আছ্‌ড়ে পড়্‌ল।

বিজয়ার বাজনা বেজে উঠ্‌ল! প্রতিমা নিয়ে সকলে বেরিয়ে গেল।

৫

আনন্দের স্রোতটা তখনও অনেকের মনে ক্ষীণ ভাবে বইছিল। ছেলেপিলেরা তখনও চারিদিকে বিজয়ার প্রণাম ক'রে ফির্‌ছিল। বিজয়ার সানাই সাহানায় বিদায়গীতি গেয়ে গেয়ে সবে মাত্র থেমে গেছে। আজকের এই আধ আনন্দের, আধ দুঃখের দিনে নীলি পাগলিকে কেউ দেখ্‌তে পেলে না। যাদের প্রাণে দয়ার একটু লেশ মাত্র ছিল তারা একবার নীলির খোঁজ কর্‌লে। সকলে বল্লে, কাল বিজয়ার সময় তাকে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে যেতে দেখেছিল, তারপর থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি। এর পর আর তার কথা নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামালে না।

দুদিন হ'ল পূজা হ'য়ে গেছে। সেদিন সকালে সকলে নদীতে স্নান কর্‌তে এসেছে—এসে দেখে যে তাদের জমিদার বাড়ীর দুর্গা প্রতিমার কাঠামটা অদূরে চড়ায় বেধে রয়েছে আর সেই কাঠামটা আঁকড়ে পড়ে আছে কাঙ্গালিনী মৃতা নীলি পাগ্‌লি। তার মুখে যেন একটা আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছে আর মাকে আঁকড়ে ধরে যেন বল্‌ছে—

"এ বার তোকে পেয়েছি মা
আর কিরে মা তোকে ছাড়ি—"

আহ্বান

—শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

ছোট্ট মেয়ে তটিনী ভূধরের পাষাণ বুকে মানুষ হচ্ছিল। মাতৃহারা মেয়েটীকে একদিনের জন্যও তার তপ্ত বুক হ'তে নামায় নি; পক্ষপুটে ঢাকা শাবকের মত আগ্‌লে রেখেছিল।

জ্ঞান হ'লে তটিনী দেখ্‌লে এ যেন সে কারাগারে রয়েছে। এ তার ভাল লাগ্‌ল না। এমন ভাবে আবদ্ধ থাক্‌তে তার ক্ষুদ্র প্রাণ রাজী হ'লো না—ছাড়া পাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে তা জান্‌ত না। দূর হ'তে নির্ঝরের তান, পাখীর গান হাওয়ায় ভেসে আস্‌ত, তটিনী একমনে তাই শুন্‌ত।

কনক-কিরণ-জাল শ্যামা ধরণীর বুকে ছড়িয়ে উষা নামে, সূর্য্য ওঠে। রোষ-রক্তিম দৃষ্টিতে শাসিয়ে সকলকে খাটিয়ে নেয়। অবশেষে নিজের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহখানা অস্তাচলে এলিয়ে দেয়। তারপর মাতার আশীর্ব্বাদের মত সন্ধ্যা এসে প্রকৃতির ব্যথিত মাথাটী তুলে সান্ত্বনা দেয়।

তটিনী দেখ্‌লে কি সুন্দর! এতো সে কখনও দেখেনি! সে তপোবনের হরিণ শিশুর মত সচ্ছন্দ গতিতে নেচে হেসে খেলে বেড়াত। ভূধর তাকে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াত, কখনও বুক ছাড়া করেনি।

একদিন তার এমন হ'লো, তটিনী আর তেমন হাসে না, তেমন খেলে না, গান করে না।

তার কচি বুক জুড়ে একটা কিসের ব্যথা গুমরে উঠ্‌ত। ঐ যে অসীম নীল আকাশ—ঐ যার বুকে তারার মানিক জ্বলে—ওতো আমার মত বদ্ধ নয়। ঐ যে সূর্য্য প্রভাতে ওঠে, সমস্ত দিন কিরণ দেয়, আবার চলে যায়। কেন আসে, কেন চলে যায়? যেন নিজের খুসীতে আসে, আবার খেয়াল মত চলে যায়। কই, ওতো আমার মত বদ্ধ নয়।

ঐ যে বনের পশুরা—আহা ওরা কত সুখী! প্রভাতের পাখীরা গান গেয়ে

ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। সমস্ত দিন ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়, রাত্রি এসে মৃদুল বীজনে ওদের ঘুম পাড়ায়—ওরা কত সুখী!

ভূধরেরও পাষাণ বুক জুড়ে একটা ভাবনা জমাট বেঁধে উঠ্ছিল। সে ভাবত, পারব না ত ধরে রাখ্তে,—একদিন তো সাজিয়ে গুছিয়ে পরের হাতে তার সর্ব্বস্ব ধনকে তুলে দিতে হবে। ওঃ সেদিন কবে? হাসিভরা ফুলের রাশি তটিনী, এ আনন্দে নির্ঝরিণীকে বিদায় দিয়ে বাঁচ্ব কেমন ক'রে, কি নিয়ে?

তটিনী বড় হ'ল। একটা কিসের ভাবনা তাকে বিব্রত ক'রে তুল্ল। বুঝ্তে পার্লে না, কি সেটা!

বাবার স্নেহ, পার্ব্বত্য গাছপালার মধুর সখ্যতা, বনের পশুর প্রাণ খোলা মেশামিশি এই সবই রয়েছে তবু যেন কি নেই, যেন কি একটা চায় তার ক্ষুদ্র প্রাণ!

একদিন সে যেতে চাইলে ভূধর নিষেধ কর্লে, বল্লে, কোথা যাবি মা, কে সে? যাকে কখনও দেখিস্নি, নামও শুনিস্নি, সে কে?

তটিনী বল্লে, তাত জানি না বাবা, মনে হয় কে যেন ডাক্ছে, নিয়ত ডাক্ছে।

—অজানা অচেনা না-দেখাকে পাবার আশা তোর এতই প্রবল? আমি কি তোর কেউ নই? আমার স্নেহ কি তোর অভাব পূর্ণ কর্তে পারে না?

—তাকে দেখেছি বাবা কোন অনাদি কালের প্রথম প্রভাতে—তার সঙ্গে চেনা আমার জন্ম-জন্মান্তরের। ঐ শোন বাবা পাখীর গানে, বাতাসের সুরে তার কাতর আহ্বান ভেসে আস্ছে, আর যে নিজেকে সাম্লাতে পার্ছি না।

* * *

তটিনী বেরিয়ে পড়্ল অনন্তের পথে, পিতার স্নেহের বাঁধন কেটে—তার উদ্দেশ্যে যার অভাবে তার জীবনটা ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

ভূধরের বুক ফেটে গেল। এতটুকু বিলাপ কর্লে না, ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস—তাও সে ফেল্লে না। শুধু দাঁড়িয়ে রইল নীরব নির্ব্বাক্। তার পলক্-হারা চোখে মুক্তা বিন্দুর মত অশ্রু টস্ টস্ ক'রে ঝড়ে পড়্তে লাগ্ল। তটিনী চলেছে অনন্ত আশা বুকে নিয়ে, দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই সন্ধ্যা নেই, কেবলই চলেছে। বনপ্রান্তর ভেদ ক'রে কূলে কূলে শ্যামল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে।

কোথায় সে—কোন্খানে, কোন্ সুদূরের পারে? কে তার সন্ধান দেবে?

মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছে, উত্তর পায়নি ; পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতা বন-উপবন মাঠ-প্রান্তর কেউ তার বাঞ্ছিতের পথের সন্ধান বলে দিতে পার্‌লে না, শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার মুখের পানে—কে এই পাগল মেয়ে !

পথের শেষ আর এল না, চলারও বিরাম হ'ল না। অবসাদ এল, আশ্রয় চাইলে—কেউ দিলে না।

কত বর্ষ, মাস, কত যুগ অতীতের কোলে ঢলে পড়্‌ল। কত বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম, এল গেল, তটিনীর চলার তবু শেষ হ'ল না। দেহ ক্ষীণ হ'ল, মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তবুও চল্‌তে লাগ্‌ল।

দেহ ক্ষীণ হ'তে লাগ ল, নিরাশায় বুক ভরে উঠ্‌ল, চলার গতি শিথিল হ'য়ে এল। ডাক এবার কাছে, খুব কাছে মনে হ'ল। তটিনী কেঁদে বল্‌লে—ওগো কই কোথা তুমি, কাছে এস, দেখা দাও !

সে এক সজল সন্ধ্যা। আকাশ বাতাস সবই যেন কান্নায় ভরা। গাছপালা কাঁদ্‌ছিল, পাতায় পাতায় অশ্রু ঝর্‌ছিল, বাতাসে কান্নার করুণ সুর ভেসে আস্‌ছিল।

উপরে অসীম নীল আকাশ, নীচে সীমাহারা নীল সাগর তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আনন্দে চল্‌ছিল। হঠাৎ সে চলা ভুলে থম্‌কে দাঁড়াল।

* * *

কুলে দাঁড়িয়ে তটিনী বল্‌লে, কে তুমি ওগো, একটু আশ্রয় দাও।

হেসে সাগর বল্‌লে—কে আমি ? চিন্‌তে পার্‌ছ না ? আমি যে তোমারি। তোমারই আশায় কত যুগ-যুগান্তর ধরে এমনি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। এস বুকে।

—তুমি তুমিই সেই ! দাও ! তবে স্থান দাও।

—এস, বলে প্রীতি-ভরা বুক প্রসারিত ক'রে স্নেহ-মাখা দুটী বাহু বাড়িয়ে দাঁড়াল।

তটিনী আপন-ভোলা হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল তার বিশাল বুকে। বাহুর বাঁধনে জড়িয়ে ধরে সাগর উল্লাসে হেসে উঠ্‌ল।

———

উপেক্ষিতা

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু।

সেদিন শক্ত ব্যাধির মৃত্যু-কবল থেকে কিছুক্ষণ অব্যাহতি পেয়ে যখন আমার এই সম্বক্ষীণ দেহখানি একটা তন্দ্রাহত তৃপ্তির অবসাদে শয্যার একান্তে লুটিয়ে পড়েছিল, কে জান্‌ত তখন পাশের ঘর থেকে আর একজনের ক্ষীণ কণ্ঠের আকুল আহ্বান কতবার এই জীর্ণ বুকের দ্বারে এসে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে নিতান্তই ভিখারীর মত ফিরে গেছে। তাই আমার আধ-সুপ্ত আধ-জাগরণের পর্দ্দাখানি যখন ভৃত্যের ব্যগ্র কণ্ঠ একেবারে অতর্কিতের মত ছিন্নভিন্ন ক'রে তার প্রাণের পরম বাণীটি চরম ক'রে জানালে, তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেই একেবারে তার বুকের কাছে ব'স্‌লুম। অম্‌নি দুখানি কোমল বাহুর নিবিড় আলিঙ্গন আমায় বুকের ওপর আঁকড়ে ধর্‌লে—তৃপ্তির বিজয় গৌরবে, শান্তির দীপ্ত মহিমায়! . . . কিন্তু একি! চীৎকার ক'রে বল্‌লুম "চিত্রা! চিত্রা! মুক্তি দাও আমায় মুক্তি দাও! চোখের সাম্‌নে বুকের প্রদীপ নিবিয়ে দিতে পার্‌ব না!" কত তৃপ্তির সঙ্গে সে তখনই তার বাহুপাশের বাঁধন থেকে আমায় মুক্ত ক'রে দিল! . . . অনিশ্চিতের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলুম!

সংজ্ঞা যখন ফিরে এল, দেখ্‌লুম আমারই ঘরে আমি অসাড়ের মত পড়ে আছি। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধির বেদনায় জরজর, কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তেও ক্ষীণতর; তবুও যথাসম্ভব চীৎকার ক'রে বল্‌লুম "ওরে কে আছিস্? ওষুধটা খাইয়েছিস্ ত?" দ্বারের পাশ থেকে ভৃত্য ছুটে এল কিন্তু জবাব কিছু পেলুম না। শুধু একান্ত অনুযোগের স্বরে সে আমায় কথা কইতে নিষেধ কর্‌ল; আরও জানালে ডাক্তার বাবুও এই কথা বলে গেছেন। ভাবলুম একথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। যার কোলে পিঠের ওপর আমার সমস্ত শৈশবটা কেটেছে, যার স্নেহের গঙ্গায় আমার জীবনের প্রত্যেক তরঙ্গটি এখনও অবাধে খেলা কর্‌তে পায়, সে ভৃত্য হ'লে কি হ'ল, তাকে এমন একটা শক্ত কাজে আমার মত অকেজোর হুঁসিয়ার কর্‌তে যাওয়াই ত পাগলামী! সে যে আমার দৈনান্দন জীবন থেকে এ

অভিজ্ঞতাটুকু বেশ লাভ করতে পেরেছে যে চিত্রা আমায় ভালবাসে—তার প্রাণের চেয়েও ভালবাসে! কিন্তু মন ত স্থির করতে পারলুম না; অবাধ্য শিশুর মত সে নিয়তই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল! ভাবলুম আবার ডাকি।

এমন সময় শুনতে পেলুম, ঠিক আমারই ঘরের সুমুখের বারান্দায়, বৃদ্ধের নিম্নস্বরের সঙ্গে শিশুর কলকণ্ঠের কি আকুল কাকলী! হৃদয়ের সমস্ত স্নেহে কণ্ঠ অভিষিক্ত ক'রে বৃদ্ধ বল্‌ছে "লক্ষ্মী দিদি আমার! তুমি চুপ্‌টী ক'রে আমার কোলে বসে থাক। ও ঘরে গেলেই তোমার বাবা জেগে উঠ্‌বেন, আর অসুখ বেড়ে যাবে। আচ্ছা গল্প বল্‌ছি শোন—সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প!" কিন্তু শিশুতো তা শুন্‌বে না; সে যে অস্থির, সে যে চঞ্চল, সে যে শিশু! এমন সময়ে সেই দ্বন্দ্বের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছিল আমার ক্ষীণ কণ্ঠের এক মৃদুল আহ্বান! উর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটে এল বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত! আর সে গতিকে প্রতিহত করতে ছুটে এল জীর্ণকণ্ঠের এক আকুল মিনতি, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এক ব্যাকুল প্রার্থনা, তপ্ত প্রাণের এক ব্যর্থ অনুরোধ! "যেয়ো না দিদি" বলেই মধ্য-পথে সে বৃদ্ধকণ্ঠ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল! কান পেতে রইলুম কিন্তু শোনবার মত কোন শব্দই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে পারলে না!

হঠাৎ ছোট্ট দুখানি কোমল বাহুর ব্যগ্র আলিঙ্গন আমার মনের গতি ক্ষণিকের মত ফিরিয়ে দিল। কিন্তু হায় রে! কে জান্‌ত, বৃদ্ধের সেই কাতর-উক্তির ভিতরে সদ্য-বিপদের রুদ্ধ-বেদনায় অশ্রু-জমাট হৃদয়ের এক স্পষ্ট পরিচয় ছিল। তাই মণিকে যখন জিজ্ঞাসা করলুম "তোর মা কেমন আছে," আর সে তার শিশুসুলভ সহজ ভাষায় যা উত্তর দিল, তা শোন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকাও বোধ করি পাপ। কিন্তু আমার পক্ষে তা বহুসঞ্চিত পাপের সামান্য একটু প্রায়শ্চিত্ত! সে বল্‌লে "মা'ত গঙ্গা নাইতে গেছে। সবাই তাকে নিয়ে গেল—যাবার জন্যে আমি কাঁদ্‌লুম, আমায় নিয়ে গেল না!" পাগলের মত মণিকে একান্ত নিবিড় ক'রে আঁক্‌ড়ে ধরতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হ'লুম—তা আবার ভাঙ্গ্‌লে কেন ভগবান্?

* * *

যখন জান্‌লুম যে আমার মূর্চ্ছা হওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তার জীবন-প্রদীপ হঠাৎ একটা নির্দ্দয় ঝঞ্ঝাবাতে নিবে গিয়েছিল, তখন দুঃখে ক্ষোভে আমার হৃদয়খানা পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। রুগ্নকণ্ঠে বড় ব্যথিত অভিমানের

স্বরে বল্লুম "আমায় ডাকলিনে কেন, রঘুদা? একেবারে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আমায় কেমন ক'রে তোরা খবর দিলি? তোরা এত নিষ্ঠুর, তোদের ভেতরেও এত ষড়্যন্ত্র!"

রঘুদা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, যেন কত কালের রুদ্ধ কান্না আজ পথ পেয়ে মুক্ত ধারার মত বেরিয়ে তার চোখবুক ভাসিয়ে দিল! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে "দাদা" বলেই হঠাৎ থম্‌কে গেল। কণ্ঠে আর সে স্বর খুঁজে পেল না, দু'একবার জীর্ণ ঠোঁট দুখানি ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে যেন একটা উদ্গত অশ্রুর অপ্রতিহত বেগ সংবরণ করতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তার বুকের ভিতরে যে ঠিক কি হচ্ছিল, তা যিনি বুকের প্রভু, যিনি শুধু বুকে বসেই কথা কন, তিনিই জানেন! তবে তার বাহিরটা দেখে আমার এই বাইরের চোখদুটো হৃদয়ের সঙ্গে কোন মতদ্বৈধ না রেখেই বোধ করি বুঝ্‌তে পেরেছিল যে হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝার উন্মত্ত প্রলয় তার হৃদয়ের সমস্ত তারগুলির উপর এমন একটা তীব্র আঘাত ক'রে গেছে যে তারই ব্যথিত-বেদনের অভিব্যক্তি করতে গিয়ে বৃদ্ধ আজ হতবাক্! তাই সেই কণ্ঠহারার মত শুধু একটা অস্ফুট শব্দ ক'রেই আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল—সে দৃষ্টি স্থির হ'লেও বেদনা-চঞ্চল!

এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলুম না। কোন রকমে এই ক্ষীণ দেহখানি নিয়ে পাগলের মত তার গলা জড়িয়ে ধরে মূর্চ্ছাহতের মত তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়্‌লুম! আর অম্‌নি অশ্রুর সহস্রধারা এসে তার অভিষিক্ত বুকখানিকে আবার স্নান করিয়ে দিলে! মনে হ'ল এই দুটী হিয়ার অশ্রু-অভিষেক সন্ধ্যার অন্ধকারকেও ভিজিয়ে তুলেছে! এমন সময় শুন্‌তে পেলুম অবুঝ শিশুর ব্যাকুল আর্ত্তনাদ। অভাবের দৈন্যে সেও আজ পাগল। সে মানা যে আর মান্‌বে না, মান্‌তে সে যে পারে না! যার বুকের ওপর অনন্তনির্ভর হ'য়ে তার প্রথম-বিকশিত আঁখি-পুট দুটী মেলেই এই আলো-হাসি-গানের জগৎটাকে সে এত ভালবেসেছিল, সেই শান্তিনিকেতন, সেই স্নেহের আশ্রয় যে চিরদিনের মত তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল! এ অভাব, এ নিষ্ঠুর দৈন্য, তার কচি কোমল শিশু-হৃদয় কেমন ক'রে সইবে! তাই ঝি তাকে সাম্‌লাতে না পেরে দুটী অশ্রুসিক্ত আঁখি নিয়ে একেবারে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল! বালিকা তার কোল থেকে নেমে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার শিশুসুলভ ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে বল্‌ল—"কৈ মা আজও এল না কেন—আমি মার কাছে যাব!"

এ দৃশ্য দেখ্‌বার, এ বাণী শোন্‌বার জন্য বোধ করি মনের কোণে একটুও

স্থান ছিল না। এই সান্ধ্য অন্ধকারে বসেই আজ বুঝ্‌লুম এই বিশ্বসংসারের ভিতরে সে অনেকগুলি জীবকে দেউলে ক'রে গেছে! আর শুধু এই কথাই ভাবছিলুম যে, এই অনন্ত বিশ্বাসী হৃদয়ের ওপর যে গভীর মিথ্যার দাগ তোমরা নিষ্ঠুরের মত এঁকে দিচ্ছ, যেদিন এর স্বরূপ বেরিয়ে পড়্‌বে, সেদিন তার গভীর ক্ষত মুছ্‌বার মত তোমাদের কি সম্বল আছে? দুটী মিষ্টিকথার মামুলি সান্ত্বনা?

* * *

চলে গেছে! একান্তই ছেড়ে গেছে! ঠিক্‌ বলিছিস্‌, রঘুদা, লক্ষ্মীছাড়াদের পিছনে ফেলে লক্ষ্মী আমাদের চলে গেছে! কিন্তু যাবার বেলায় সে সোনার প্রতিমা একবার দেখালিনে রে? শুধু আমার জন্য তোকে বল্‌ছিনে, তারই বুকে যে এ সাধ বড় বেশী ছিল, তাকি তোরা আজও বুঝ্‌তে পারিস্‌ নি? উচ্ছলিত রোদনের অদম্য বেগ সংবরণ করতে না পেরে রঘু মেজের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ল। হাত ধরে তুল্‌তে গেলুম সে আরও যেন নেতিয়ে পড়্‌ল। জোর গলায় ডাকলুম "রঘুদা! রঘুদা!" চমক ভেঙ্গে ধীরে ধীরে উঠে বসেই আবার নিস্পন্দের মত স্থির হ'য়ে গেল। ভাবলুম বৃদ্ধের জীর্ণ-পাঁজর খানি রুদ্ধ-বেদনের ক্ষুব্ধ আঘাতে এখুনি চুরমার্‌ হ'য়ে যাবে। তাই তারই মত—কি তার চাইতে অনেক বেশী একটা অশ্রু-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে উঠ্‌তে গিয়েই বৃদ্ধের অস্ফুট ধ্বনি কানে গেল "যাস্‌নে ভাই একটু বোস্‌!" অনিচ্ছুকের মতই সেখানে আবার বসে পড়্‌লুম। তারপর? তারপর কয়েকটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস আর তারই সঙ্গে চিত্রার জীর্ণ জীবনের কয়েকখানি ছেঁড়া পাতার এক নির্ম্মল ইতিহাস! . . .

"একবারও ভাব্‌লিনি রে কি করেছিস্‌ বদ্‌খেয়ালে মেতে—ছিঃ! ছিঃ! কর্‌লি কিরে কর্‌লি কি? আর দুগ্‌গো পিত্তিমেকে আগ্‌লে রাখ্‌তে রেখে গেলি এই বুড়ো থুথুড়ো ঘাটের মড়া? মাকি আর তায় থাক্‌তে চায়? চব্বিশ ঘণ্টা বল্‌ত—চল্‌, রঘুদা, চল্‌ আমরা দুজনে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি। . . . মুখ্যু আমি, তার কোন কথাটাই বুঝ্‌লাম না রে; মার যাওয়ার আগের দিন যখন বল্‌লাম, ভগবানকে ডাক, মা, হরিকে ডাক। কি বল্লে জানিস্‌? বল্লে—রঘুদা, সবারই একটা সময় আছে—তুই তাঁকে একবার ডেকে দে ভাই, তোর পায়ে পড়ি। লজ্জায় মরে গেলাম। আবার

যখন বল্লাম—যাওয়ার খানিক আগে—মা, দাদাকে ডাক্‌ব? ভারি আপত্তি জানিয়ে ঘাড় বল্‌লে না, না। বল্‌লাম—মণিকে? কথা বল্‌লে না।"

মণি ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে "বাবা, বীণাদের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাব—মাকেও নিয়ে আস্‌ব।" মণিকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম "রঘুদা!" রঘু বল্‌লে "এইত ভাল, এবার তোমার পালা! সে যেমন তোমাকে হারিয়ে মণিকে বুকে ক'রে ধরেছিল, এবার তাকে হারিয়ে তুমি মণিকে মানুষ ক'রে তোল।"

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোট তাহা ইহার পূর্ব্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন—দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশী নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতর বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন, আমি ত বুঝিতে পারি না!

"শ্রীবিলাস"



—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর আগমেই ইউরোপের আবার এক নূতন রূপ ফিরিয়া আসিল। পুরাতন পৃথিবী একবার শেষ চেষ্টা করিয়া নূতনতর এক পৃথিবীর জন্য সরিয়া দাঁড়াইল। ফ্রান্সে সেই রাজসমারোহের দিনে ষোড়শ লুইএর রাজসভায় নবপরিণত মন্ত্রী রেঁালা যখন সামান্য একজন নাগরিকের বেশে হাসিতে হাসিতে সভায় আসিয়া বসিলেন, উৎসবের অধিনায়ক সেইদিন বুঝিয়াছিলেন—পুরাতন ফ্রান্স চলিয়া গেল, পুরাতন পৃথিবী চলিয়া গেল; এবার নূতন কোন আগন্তুক আসিয়াছে, তাহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

পুরাতন ইউরোপ তাহার কাজ সারিয়া চলিয়া গেল। সুন্দর নিয়মবদ্ধ গদ্য, ছন্দবদ্ধ কাব্য পরিপূর্ণতার মাত্রায় পৌছিয়াছিল। রাজতন্ত্রতার আবছাওয়ায় লতাগুল্মের মত মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থেরা ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমশঃ লতাগুল্ম আপনার বৃদ্ধির ভারে আশ্রয়তরুকে ছাপাইয়া, তাহাকে প্রাণশূন্য করিয়া আপনিও ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার স্থলে আসিল তৃণরাশির মত বিপুল, কর্ম্মরত, কোলাহলক্লিষ্ট, উন্মাদ জন-সাধারণ—দরিদ্র, রিক্ত, প্রাণের আবেগে পূর্ণ, নূতন আলোকে উদ্বুদ্ধ। পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, মানিয়া লইতে চায় না; নূতনকে ভাল করিয়া দেখে নাই অথচ নূতনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে চায়।

বিজ্ঞান রাজতন্ত্রকে লুপ্ত করিয়া গণতন্ত্রকে বরণ করিয়া আনিল। সাধারণ নাগরিক তাহার ঘরের বাহিরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল; গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নিজেদের হাতে-গড়া অজ্ঞতার সীমারেখা লুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল! নিজেদের ভাবে নূতনতর গাথা রচনা করিল, তাহাদের ভাবে নূতনতর ভাষার প্রবাহ আনিল, নূতনতর মানুষের কথা

নবীনতর ভাবে তাহারা গাহিতে শিখিল। রাজতন্ত্রের শিলাস্তম্ভে গণতন্ত্রের বিজয়গীতি প্রোথিত হইল। নাটকের, কাব্যের, গল্পের নায়কও বদলাইয়া গেল। রাজপ্রসাদসেবী ধনী নায়ক, নারীর সেবা করিয়াই যাহারা নিজেদের ধন্য মনে করিত, কিংবা জগৎকে যাহারা আরামকেদারা করিয়া নারীর সহিত, বয়স্যদের সহিত রসালাপ করিয়া, রেশমে আপনাকে আপাদমস্তক মুড়িয়া, শুধু আপনাকে লইয়াই আপনার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল, তাহার স্থলে নায়ক হইয়া আসিল একজন পথের দরিদ্র, অর্দ্ধভুক্ত, উত্ত্যক্ত ভিখারী। জীর্ণগাত্র, অন্তরে বিপুল সম্ভাবনার বীজ এক সুগুপ্ততম দুঃখের বজ্রবাঁধনে নিখিল মানবের সাথে বাঁধা—কখনও নীচ কখন মহান্—কিন্তু এক চির-অতৃপ্ত বহ্নিশিখার মত আপনার মাঝে কখন আপনি দহিতেছে, কখনও সধূম অগ্নি উদ্গার করিয়া সারা বিশ্বকে ঘিরিয়া অগ্নিবাসর রচনা করিতেছে। ভিকটর হুগো, গ্যেটে, ব্যালজাক, বার্ণস্ তাহাদের জন্য আসিল, তাহাদের জন্য গাহিল, তাহাদের ব্যথা সুনিবিড় প্রাণের ভাষায় ধরণীর পত্রপুটে অমর গাথা রচনা করিয়া গেল।

এই যে পরিবর্ত্তন হইল তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিত না। যেমন করিয়া কুঁড়ি ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে, ফুল যেমন করিয়া ফলে পরিণত হয়, তেমনি করিয়াই এই পরিবর্ত্তন রূপ ধরিয়া আসিল। ভাল হইল কি না, ন্যায় হইল কি না, ভাবিবার ঠিক করিবার, বুঝিয়া দেখিবার, অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার কোন অবসর দেয় নাই।

এতদিন পর্য্যন্ত যে জাতি নিষ্প্রভ গতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই প্রথমে এ পরিবর্ত্তনের অধিনায়ক হইল। জার্ম্মানীর বিশাল ভাবগভীর অন্তরে এই অভ্যুদয়ের প্রথম সাড়া পড়িল। জার্ম্মানী ইউরোপে ভাবের বিপ্লব আনিল, ফ্রান্স ইউরোপে ভাষা ও ভঙ্গীর নূতন প্রবাহ আনিল। একজন রস দিল, গন্ধ দিল, প্রাণ দিল; আর একজন রূপ দিল, গতি দিল, দেহ দিল। নূতন যাহারা আসিল, নিয়মকানুনের, সংস্কারের বাহিরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিল; কাব্যকে অলঙ্কারের শূন্য ঝঙ্কার হইতে মুক্তি দিল, সত্যকে সুখে-দুঃখে-দোলা প্রাণের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিল। রূপকথার রাজত্ব ছাড়িয়া তাহারা নিজেদের প্রতিদিবসের হাসি-কান্নার জীবনে সত্যকে খুঁজিতে লাগিল।

এই জাগরণের প্রথম চিহ্ন, প্রথম রেখা ফুটিল এক বিপুল অতৃপ্ত চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া। যুগযুগবঞ্চিত মানবের অন্তরের বিশ্বগ্রাসী তৃষ্ণাকে

সকল বাধাবন্ধন হইতে আজ মুক্ত আলোর গগনে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার তৃষিত প্রাণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অন্তরের অমৃত আহার্য্যের জন্য ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। এতদিনের নিয়ম কানুনের বাঁধাবাঁধির আড়ালে যে বিপুল তৃষ্ণা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সহসা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার আহার্য্য খুঁজিয়া পাইল না। তাই আপনার অন্তরের অনির্ব্বাণ তৃষ্ণার আলোয় আপনি দহিয়া মরিল; যাহাকে লইয়া সে জগৎ দেখিতে বাহির হইল, একদিন বেলাশেষে তাহারি কোলে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই ভাবকে, এই জাগ্রত জীবনকে মূর্ত্তি দিল বর্ত্তমান ইউরোপের সাহিত্যের মহাপুরোহিত গ্যেটে। তাঁহার Faust, Werther এই ভাবের প্রতিমূর্ত্তি। গ্যেটে, শীলার, স্যাটুব্রিয়াঁ সদ্যজাগ্রত ইউরোপের এই বিপুল দোলাকে রূপ দিল। তাহাদের নায়ক বর্ত্তমানের সামান্য পুঁজি লইয়া থাকিতে চায় না; এই যে রূপ চোখের সাম্‌নে দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার চেয়েও এক মহাসুন্দরের রূপভারাতুর দেহ তাহাদের অন্তরের বাসনার সঙ্গে লুকাইয়াছিল। তাই এই বর্ত্তমানের সীমারেখার বাহিরে অন্য কোথাও, কে জানে জগতের কোন্ শান্ত নিরালা কোণে, কোন্ নির্জ্জন শষ্পবহুল চিরশ্যাম নদীমাতৃক দেশে, কোন্ উদার অনাঘ্রাত আকাশের তলে অন্তরের সে চিররূপসী নারী আপনার রূপযৌবনের অসহ্য ভারে আপনি শুকাইয়া মরিতেছে। তাহারি জন্য ছুটিল—Faust, Wagner, Werther, Rene. তাহাকে পাইবে বলিয়া যত শাস্ত্র ছিল, যত বিদ্যা ছিল, ধরণীর বিপুল বক্ষে যত রস ছিল, আকণ্ঠ পান করিয়া নিল; তবুও তৃষ্ণা মিটিল না, তবুও সে নারী ধরা দিল না। সীমার বাহিরে, ঐ যেখানে দূর দিগন্তরেখা নীল অরণ্যানীতে আপনাকে হারাইয়া দিয়াছে, ঐখানে, ঐ শুকাতারার দেশে, হয়ত ঐ উপরে রাত্রির কালো আবরণে ঢাকা এক চিরস্বপ্নের রাজ্যে, সে যৌবন-ভারাতুর রমণী নিরালায় তারা আর ফুল দিয়া, হাসি আর গান দিয়া, কথা আর কান্না দিয়া মালা গাঁথিতেছে—কে জানে? তাই এ নবজাগ্রত সাহিত্যে প্রতিদিবসের হাসিকান্নার সুখ-দুঃখের জগতের পাশাপাশি ফুটিয়া আছে এক অদৃশ্য রম্য জগৎ,—বাতাস যেখানে রূপের গন্ধে অন্ধ, আকাশ যেখানে রূপের স্বপ্নে মোহাচ্ছন্ন, ধরণীর ধূলিকণা যেখানে আলোর তরঙ্গের মত নিত্য কাঁপিতেছে, নিত্য দুলিতেছে। এই পথে গিয়াছেন গ্যেটে, শীলার, হেইন, ওয়াগনার, রুশো, বিটোভেন, স্যাটুব্রিয়াঁ।

এই পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝে, এই অনন্ত বুভুক্ষার মধ্যে, এই রূপের সম্ভোগে, এই রূপাতীতের স্বপ্নে, এই সীমা ও অসীমের মাঝে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের জন্ম হয়।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙ্গে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা।

"শ্রীবিলাস"

বকুল

শীতের রাত্রি। পথের ধারে কেরোসিনের আলোগুলির কাঁচের উপর হিম পড়িয়া ধোঁয়াটে হইয়া গিয়াছে। তাহারই উপর দিয়া দুএকটা শিশিরের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য কাঁচগুলি কাটা বলিয়া মনে হইতেছে। পথের পাশে একস্থানে একটা আতা গাছের নীচে আবর্জ্জনার স্তূপ। তাহার ভিতর গর্ত্ত করিয়া একটি কুকুর-মাতা তাহার সদ্যপ্রসূত সন্তানগুলিকে লইয়া শুইয়া আছে। রাস্তা জনশূন্য। শীতের সন্ধ্যা নামিয়া আসিলেই গৃহস্থ কেহ বড় আর বাহিরে থাকে না। সন্ধ্যার পরে গ্রামে ঢুকিলে মনে হয় যেন রাজত্বের একটা শূন্য পুরী মানব শিশুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সেই শব্দবিহীন, নিরালা পথে কাহার চলার পায়ের শব্দ উঠিল। কুকুরটা একবার চোখ খুলিয়া চাহিল, দুএকবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, আবার দুএকটা অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে শুইয়া পড়িল। পায়ের শব্দ একটি কুটীরের কাছাকাছি আসিতেই, প্রদীপ হাতে দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বলিল, বাবা এলে?

একটি লোক ঘরের সম্মুখে বাঁশের বেড়া সরাইয়া খুলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ এসেছি মা।

লোকটি মদের নেশায় টলিতেছিল। হাতে একটা পুঁটুলি। তাহা যেন সে কিছুতেই সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল শিশুর মত পুঁটুলিটা যেন হাত পা ছুঁড়িয়া তাহার কোল হইতে নামিয়া যাইতে চায়। তাই সে দুই হাতে পুঁটুলিটি বুকে চাপিয়া রাখিতেছে, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে আবার তাহা আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। পরণের ধুতির কোঁচা অর্দ্ধেক খুলিয়া পড়িয়াছে, গায়ের কাপড়খানি রাজ পরিচ্ছদের পৃষ্ঠ-বস্ত্রের মত ধূলায় পড়িয়া ঝুলিতেছে।

মেয়েটি অঙ্গনে নামিয়া পুঁটুলিটা তাহার হাত হইতে ধরিয়া লইয়া

বলিল, দেখো একটু আস্তে আস্তে উঠো। কাল্‌কের মত আবার পড়ে না যাও। পা'টা আজ কেমন আছে বাবা ?

লোকটি ঘরের দাবার উপর উঠিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। পিছনের দিকে চাহিয়া অন্ধকারে কাহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিল, এস বাবা, হিমে দাঁড়িয়ে থেকো না।

পিতার কথায় কন্যাও অন্ধকারের দিকে চাহিল। দেখিল একটী ভদ্রবেশী যুবক উঠানের ছোট বাগানটুকু পার হইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিল, আলোটা একটু দেখা না বকুল।

বকুল প্রদীপ ধরিবার পূর্ব্বেই যুবক ঘরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রায় পড়িতে পড়িতে মাটির উপর বিছানায় বসিয়া পড়িল। বকুল তাড়াতাড়ি বালিশটা সম্মুখের দিক হইতে পিছনে সরাইয়া দিল।

বৃদ্ধ বালিশে কাৎ হইয়া পড়িয়া আরাম করিতে করিতে বলিল, দেখ্‌ বকুল, বাবুটিকে ত নিয়ে এলাম, এখন শুতে দিবি কোথায় বল্‌ ত ? খেতেই বা দিবি কি ?

যুবক এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতেছিল, আর আঙ্গুল দিয়া বিছানার উপর আঁচড় কাটিতে ছিল। বৃদ্ধের কথায় মুখ তুলিয়া বলিল, খাবারের জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমার তেমন ক্ষিদে নেই। আচ্ছা, গ্রামে কোনও অতিথশালা নেই ? আমি ত সেখানে গিয়েই রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারি।

বৃদ্ধ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, অতিথশালা ? বড় বাবু থাকৃতে খালের ধারে একটা অতিথশালার মত মস্ত বড় আটচালা তুলে রেখেছিলেন বটে। সে অনেকদিনের কথা। বড় বাবু দেহ রেখেছেন, তাও প্রায় দশবছরের উপর হ'ল। ঝড়ে জলে তবু কিছুদিন বাড়িটা খাড়া ছিল, তৃতীয় সনের কার্ত্তিকমাসের ঝড়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। আর অতিথিই বা কে আসে ? এই আমরা কয়েক ঘর এখনও ভিটে কাম্‌ড়ে পড়ে আছি। তা নইলে বাবুও গাঁয়ে থাকে না, আর যারা পেরেছে সবাই সহরে গিয়ে বাস কর্‌ছে। তাহার পর মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তা বকুল, আমার বিছানায়ই ত দুজনে শুতে পার্‌ব, কি বলিস্‌ ?

বকুল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যুবক বলিল, তবু এক ঘরে, ওঁর অসুবিধা হবে।

বৃদ্ধ যুবকের হাতে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, উনি ? উনি কে ? বকুল ?

তাতে কি হয়েছে? ওর ভাই থাক্‌লে কি এক ঘরে থাকৃত না? আমার ত আর দুটো ঘর নেই।

যুবক আবার মাথা নীচু করিল। বৃদ্ধ বলিল, আন্ ত পুঁটলিটা বকুল।

বকুল উঠিয়া গিয়া গৃহকোণ হইতে পুঁটলি আনিয়া পিতার সম্মুখে রাখিল। বৃদ্ধের হাত কাঁপিতেছিল, অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও গিঁঠ্ খুলিতে পারিল না। যুবক পুঁটলিটা সরাইয়া লইয়া খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ একটা কাল বোতল বাহির করিয়া একবার উঁচু করিয়া আলোর গায়ে ধরিল। বকুল উঠিয়া যাইতেছিল, বৃদ্ধ বলিল, দে'ত মা ছোট গেলাসটা। যে শীত! হাড় শুদ্ধ গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্চে। তুমিও একটু খাবে ত বাবা? যুবক মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি খাই না।

বৃদ্ধ উত্তর শুনিয়া চোখ কপালে তুলিয়া, ভ্রূ বাঁকাইয়া প্রশ্ন করিল, সহরে থাক, বাবু মানুষ, আর মদ খাও না? তবে হাঁ এ কথা বল্‌তে পার, এ সব বাজে-মার্কা খাও না। কিন্তু কি জান, আমিও মদ খাওয়াটা বড় পছন্দ করি না। আমাকে প্রথম মদ ধরিয়েছিল কে জান? আমাদের জমিদার, আমাদের যে কর্ত্তা, যে রক্ষক! এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার হো হো করিয়া পাগলের মত হাসিয়া উঠিল।

সেই রাত্রির মত আহারাদি শেষ করিয়া সকলে শুইয়া পড়িল।

কিছুকাল হইতে যুবক বৃদ্ধের বাড়ীতেই থাকে। যুবক বৃদ্ধেরই সঙ্গে ঘরে বসিয়া কাজ করিত। বৃদ্ধ ভাঙ্গা ঢোল্ ছাউনি দিত, বাঁয়া তবলা সারিয়া দিত, সেতার এস্রাজ প্রভৃতি মেরামত করিত। এই ছিল তাহার উপজীবিকা।

দিনে দিনে যুবকেরও কাপড় চোপড় ময়লা হইয়া আসিল। যাহা পরিয়া আসিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। সুকোমল মুখে দাড়ি ও গোঁফ বড় হইয়া উঠিল। জামার ছিদ্র দিয়া তাহার সুগঠিত দেহের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইত। যুবক যখন কাজ করিত, বকুল কাজের ফাঁকে দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিত। মাঝে মাঝে বকুলও তাহাদের কাজে সাহায্য করিত।

বৃদ্ধ একদিন বাহির হইতে ঘরে ফিরিয়া দেখিল, একটা ভাঙ্গা সেতারের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া যুবক বকুলের হাত ধরিয়া রহিয়াছে, বকুলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে খুব ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিয়া বলিতেছে, না, না, ছেড়ে দাও আমাকে। আমাকে বাঁচ্‌তে দাও, আমাকে পাগল ক'রে দিও না।

দরজার ভিতর দিয়া মানুষের ছায়া দেখিয়া বকুল চাহিয়া দেখিল তাহার বাবা দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। বৃদ্ধের মুখে সুখের ও স্বস্তির ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বৃদ্ধ বকুলের দিকে চোখ্ টিপিয়া হঠাৎ গম্ভীর স্বরে ডাকিল—রাজীব।

যুবক কোনও সাড়া দিল না। বকুলের হাত হইতে তাহার হাতখানি সেতারের উপর পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ পিছন হইতে রাজীবের পিঠে হাত রাখিয়া বলিল, কি রাজীব? ঘর শূন্য পেয়ে আমার মেয়েকে তালিম্ দিচ্ছিলে? ভাল, ভাল। তোমাদেরই দিন এখন। আমাদের দিন ত ফুরিয়ে গেছে।

বকুল দাঁড়াইয়া উঠিয়া একবার ডাকিল, বাবা! তাহার পরই তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। চোখের পাতার উপর আসিয়া ফোঁটা দুইটি টল্‌টল্ করিতে লাগিল। বকুল যেন কি মন্ত্র বলে তাহাদিগকে ঝরিতে দিল না।

বৃদ্ধ একটা তবলা সরাইয়া রাজীবের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার পর তাহার মুখ হাঁ করিয়া রাজীবের মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, দেখ গন্ধ পাচ্ছ? আমি আজ মদ খাইনি। হাতের মুঠার ভিতর পয়সা দেখাইয়া বলিল, এই দেখ পয়সা ছিল। কিন্তু খেতে গিয়েও খেলাম না। শুঁড়ির দোকানে ঢুকে শুন্‌লাম, আমারই মত একটা বুড়ো মাতাল হ'য়ে মাটীর উপর পড়ে বুকে ঘা মারতে মারতে চেঁচাচ্ছে, ঘর গেল, দোর গেল, একে একে সব ক'টা গেল, তবু কেন আমি রইলাম বেঁচে। তার ঐ কান্না শুনে, জান রাজীব, আমাকে কে যেন মাথাটা হাতে ক'রে ঘুরিয়ে দেখাল, ঐ দেখ্, অত মদ খেয়েও কি ওর প্রাণের জ্বালা গিয়েছে? বুঝ্‌তে আমার এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'ল না। সেই বুড়োটাকে ধরে তুল্‌লাম। আমার খোঁড়া পা, তবু তার ঐ জ্ঞানহীন সমস্ত দেহের ভারটা যে কি ক'রে টেনে বাইরে আন্‌লাম তা জানি না। তাকে ঐ গাছতলায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আর টেনে আনতে পারলাম না। তুমি যাও ত রাজীব, ওকে নিয়ে এস ত ঘরে।

রাজীব বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সে তখনও বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ তাহার চোখের কাছে নিজের হাতের আঙ্গুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে হাসিয়া বলিল, যাক্ বাবা, আমি ভেবেছিলাম, তোমার বুঝি হ'য়ে গেছে। ভাগ্যিস্ চোখের পাতা

নড়্‌ল। আর ভাবুক হ'য়ে কাজ নেই, এই বেলা গিয়ে ঐ বুড়োটাকে ধরে নিয়ে এস।

রাজীব উঠিয়া বাহিরে গেল। বকুল বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গলার পাশে মুখ রাখিয়া ডাকিল, বাবা।

বৃদ্ধ আর চোখের জল রাখিতে পারিল না। সেও হাতের পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হয়েছে মা? খুসী হয়েছিস্? আর তোর বাবা ও সব খাবে না। যতদিন খেয়েছি, তোর কান্নাতেও তা ছাড়িনি। আজ নিজেরই মনে বিভীষিকা দেখেছি। এমন মাতাল তার সব জ্ঞান হারিয়ে গেছে, তবু প্রাণের জ্বালাটা তখনও তাকে বিঁধে বিঁধে মার্‌ছিল। আমিও ত দেখেছি মদ খেয়ে কিছুই ত ভুল্‌তে পারি না। যত মদ ঢালি, ঐ মদের ওপর সমস্ত দুঃখটা একটা লাল জবার মতই ভেসে ভেসে বেড়ায়। আজ এত বছর মদ ঢেলেও ঐ ওটাকে ডোবাতে পারিনি রে বকুল!

বকুল তাহার নিজের গাল দিয়া পিতার চোখ মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর খাবে না বাবা?

বৃদ্ধ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। আস্তে আস্তে বকুলের চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, রাজীব বুঝি তোকে ভালবাসে? তুইও কি বাসিস্ ওকে?

বকুল বৃদ্ধের চিবুকের তলায় গলার কাছে তাহার মাথাটি ঘষিতে ঘষিতে উত্তর করিল, হাঁ বাবা।

বৃদ্ধ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু তোদের বিয়ে হবে না তা ত জানিস্? আজও ঐ শ্মশানের ছাই-ভস্ম ঘেঁটে দেখ্‌লে হয়ত তোর মার আর তোর ছেলের পোড়া অস্থি খুঁজে পাওয়া যায়। রাজীব ত জানে না বকুল, সে কথা।

বকুল বৃদ্ধের বাহুবেষ্টন হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল, আমি বল্‌ব তাকে সব কথা। তাহ'লেই সে আর আমাকে চাইবে না। বেশ হবে।

বৃদ্ধ দুঃখের ব্যথায় হাসিয়া বলিল, কিন্তু তুই কি কর্‌বি?

বকুল তাহার আঁচলটা টানিয়া আনিতে গিয়া হাতের বালা লাগিয়া ভাঙ্গা তবলার উপর ঢং করিয়া একটা বেসুরা শব্দ হইল। বৃদ্ধ হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল? বুকের ভিতরে যাহা আছে তাহা যেন মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মুখের

কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কপালে অসহ্য একটা যাতনার চিহ্ন রেখায় রেখায় ভাসিয়া উঠিল। কপালটা ঘামিয়া উঠিল। একটা বিকৃত শব্দ করিয়া ভাঙ্গা যন্ত্রের মত মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। দেহটা কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর বকুলের মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টি রাখিয়া বৃদ্ধের দুই চোখ যেন অনন্ত কালের জন্য চাহিয়া রহিল।

বকুল কাঁদিল না, নড়িল না। বৃদ্ধের দৃঢ় মুষ্টি ধীরে ধীরে খুলিয়া দিয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া বুকের উপর রাখিয়া দিল। মাথার নীচে একটা বালিশ পাড়িয়া গুঁজিয়া দিল। একখানি কাপড় দিয়া সমস্ত দেহটি ঢাকিয়া দিল। দেয়ালের গা হইতে একটী বহু পুরাতন সেতার আনিয়া বৃদ্ধের বুকের পাশে রাখিয়া দিল। যন্ত্র ও বাজনাগুলি খুব সন্তর্পণে ঘরের এক কোণে জমা করিল। তাহার পর সব কাজ সারিয়া দরজার গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া ভাঙ্গা পথের ধূলার পানে চাহিয়া রহিল।

রাজীব তখন অন্য বৃদ্ধটিকে ধরিয়া আনিতেছিল। বৃদ্ধ তখনও ঘোর মাতাল। তখনও মাঝে মাঝে গভীর শোকে ও দুঃখে কাঁদিয়া উঠিতেছে।

কান্নার শব্দে বকুলের চমক ভাঙ্গিল। সে ঐ দৃশ্য দেখিয়া, ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। রাজীবের কাণে কাণে বলিল, এখন ওকে ঘরে নিয়ে কাজ নেই। বাবা একটু শুয়েছেন। চল ওকে দুজনে ধরে ঘাটের ধারে চালাটাতে এখন শুইয়ে রেখে আসি।

একদিকে রাজীব ও অন্য পাশে বকুল বৃদ্ধটিকে ধরিয়া প্রায় শূন্যে তুলিয়া চালায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল। রাজীব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বকুলের দিকে তাকাইল। বকুলও শ্রান্ত বক্ষের নিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তারপর?

দুইজনে দুইজনের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া রহিল। বকুল আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। খড়ের গাদার উপর বসিয়া পড়িল। রাজীব বলিল, বকুল তুমি ঘরে যাও, আমি এখানে থাকৃছি।

বকুল একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, আমি ঘরে গিয়ে কি করব? তুমিই বা এখানে থেকে কি করবে? কারুর কিছু করবার নাই।

রাজীব বলিল, তোমার বাবা আবার জেগে উঠে তোমাকে খুজবেন ত? তাঁর যে ঘুম!

বকুল একটা বড় করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া একখানি খড় টানিয়া লইয়া

ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল, না, খুঁজ্‌বেন না। তাহার পর সে চালা হইতে বাহির হইয়া পিছনের উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজীবের ভয় হইল বুঝি বৃদ্ধ বকুলকে তিরস্কার করিয়াছেন। বুঝি বকুল কিছু কঠিন কথা বলিয়াছে। বুঝি বা বৃদ্ধ রাগ করিয়া বকুলকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। এই সকলের জন্য সে নিজেই যে দায়ী তাহাই সে অনুভব করিতে লাগিল। যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া বকুলের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল বকুলের চোখে আর লজ্জার জড়িত ভাব নাই, মুখে একটা অস্ফুট হাসির রেখা তাহার যৌবনের সুষমাকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। রাজীব বলিতে যাইয়া কিছু বলিল না। বকুলের পাশে যাইয়া তাহার হাত খানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

বকুল কিছুই বলিল না। রাজীব মমতা ও স্নেহের সুরে ডাকিল, বকুল।

বকুল এইবার চোখ ফিরাইল। রাজীবের চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল, থাক্ ছেড়ে দিও না। আমি রাগ করব না। তুমি আমার হাত তোমার হাতে তুলে নিয়েছ, এখন সত্যি ক'রে বল্‌তে পার, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

রাজীব উদ্‌গ্রীব হইয়া উত্তর করিল, বাসি, কিন্তু তুমি?

আমি? আমিও তোমাকে বাসি। কতখানি ভালবাসি জান, আমাকে আমি যতখানি ভালবাসি তার চাইতে একটুও কম না। কিন্তু আর একটা কথা। আচ্ছা, তুমি কি আর বাড়ীতে ফিরে যাবে না?

রাজীব বলিল, না। তোমাকে পাই না পাই, তোমার কাছেই থাক্‌ব। সেখানে আর যাব না। সেখানে যা আছে, তা দিয়ে আমায় প্রাণ ভরেনি। তুমি ত জান, আমার দেশে আমি দু একজনকে ভালবাস্‌তাম। তাদের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ভালবাসার অপমান। তারা চাইত বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের অবসরে সখ ক'রে প্রেমের অভিনয় কর্‌তে। তাও করিনি তা নয়। ক'রে দেখেছি, প্রাণ ভরে না, প্রেম নির্ব্বাক হ'য়ে আপন শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে না। তেম্‌নি থাকে সব। আরও বাড়ে তৃষ্ণা। কেবলই ছুট্, ছুট্—ছোটার আর অন্ত নাই। জীবনের একটা ফাঁকে কোথাও বিশ্রামের সময় নাই। তাদের ফেলে এসেছিলাম। এখানে এসে

মনে হয়েছিল, সব ফেলে এসেছি, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি আমার এই স্নেহ-কাতর প্রাণটাকে ফেলে আস্‌তে পারিনি। তাই বলছিলাম, যাব না ফিরে। বকুল চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যদি কিছুদিন পরে ভাল না লাগে তখনও যাবে না?

—না।

বকুল এবার হাসিল। বলিল, দেখ, তোমার প্রাণটা এত কোমল যে তুমি যে কি কথা বল্‌ছ, আর সে কথার ঋণ শুধ্‌তে যে জীবনের কতখানি তিল তিল ক'রে, ফোঁটায় ফোঁটায় খসে পড়্‌বে, তার কথা একবারও ভাব্‌তে পার্‌ছ না। আমি বল্‌ছি, যখন ইচ্ছে হবে তখুনি ফিরে যেও। কিন্তু একটা কথা বল্‌ছি, কিছুক্ষণ আগে বাবার সব শেষ হ'য়ে গেছে। তুমি বাইরে চলে যেতেই কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ঢলে পড়্‌লেন, তারপরই শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে পড়্‌ল।

রাজীব চম্‌কিয়া উঠিল। জোরে বলিয়া উঠিল, তোমার বাবা?

রাজীব ঘরের দিকে ছুটিতে গেল, বকুল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, থাক্‌। কি হবে গিয়ে? শেষকালে তাঁর যেটা ভাব্‌না ছিল, সেইটেতেই তাঁর সব শেষ হ'ল। আমিই তাঁর শেষ ভাবনার শেষ। তাই ভাব্‌ছিলাম—

রাজীব জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌ছিলে?

বকুল বলিল, না কিছু না। ভেবে পার পাবার এ সমুদ্র নয়। ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পার্‌লেই যথেষ্ট।

২

বকুল বসিয়া ভাবিতেছিল, এ চমৎকার। আশ্চর্য্য একটা শান্তি। কোনও সুখে প্রাণ লাফিয়ে ওঠে না, কোনও দুঃখেও মন ত আর কেঁদে মরে না। এমন চমৎকার শান্তি কিসে ভাঙ্‌তে পারে? রাজীবের একটা স্পর্শে? না, তাও আজ সম্ভব নয়। আজ যদি রাজীব এসে বলে তুমি একলা, তাহ'লেও বুঝি আমি এমনি শান্তিতে বিভোর হ'য়ে থাকি। সব আছে তবু চাইবার তাড়া নাই! কিছুই কি আমার আর নাই? স্নেহ, ভালবাসা, স্বাস্থ্য, জীবন, এ সব কিছুরই জন্য আমার আর কামনা নাই?

বকুল ভাবিতেছিল, রাজীব আসিয়া একখানি আসন পাতিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব সারাক্ষণ বকুল?

বল্‌ব না! বকুল উত্তর করিল, বল্‌ব না।

রাজীবের প্রাণে বকুলের ঐ ছোট উত্তরটি বড় বিষম করিয়া লাগিল। তাহার মনে হইলে, সমস্ত ঘরটার ভিতর যেন তাহার নিশ্বাস লইবার মত একটু বাতাস নাই। সে তবুও ম্লান হাসিয়া বলিল, আমাকেও বল্‌বে না? আর কিছু না দাও, তোমার ভাবনাটুকুও আমাকে দিতে পার না? আজ কতদিন পরে এসে তোমার কাছে বসেছি বল ত? মনে পড়ে আজও, তোমাকে ছেড়ে, তোমাদের এই ঘরখানি, এই উঠান, এই ঘাটের ধারের চালা, ছোট বাগানটুকু, এমন কি ঐ আমগাছের তলায় ঐ শুক্‌নো কাঠের গুঁড়িটা পর্য্যন্ত ছেড়ে যে দিন চলে যেতে হ'ল, সেদিন আমার শরীরে একফোঁটা শক্তি খুঁজে পেলাম না। প্রথমটা সারারাত সারাদিন, মনে হ'ত, আমার এই শরীর আর মনটা যেন দুজনে দুজনের দিকে নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে থাক্‌ত। অনেক ভেবে তোমাকে একলা থাক্‌তে দিয়েছিলাম। সাধুকাকার ওপর, তোমার নিজের ওপর সবটুকু ভার দিয়ে, আমি ভাস্‌তে চেয়েছিলাম ছবির নৌকার মত, স্বচ্ছ জলের ওপর কালো ছায়ার পাশে সাদা পালের নিস্পন্দতা নিয়ে। বহুদিন পর আবার আজ মনে হ'ল, আমাকে না দেখেও তোমার শান্তি নাই। বকুল একটা কাঠের খুঁটির ওপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রাজীবের কথাগুলি শুনিতেছিল, আর মাঝে মাঝে চোখ বুঁজিয়া চোখের ভিতরের ঐ অন্ধকারটুকুর ভিতর যেন কোন্ ছবিরই ছায়া দেখিতেছিল।

রাজীব একটু আসিতেই সে বলিল, বল. বল, আরও বল! কথা কয়টি বলিতে বলিতেই যেন তাহার সর্ব্বদেহ জুড়াইয়া আসিল। সে আবার চোখ বুঁজিয়া তেম্‌নি অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

রাজীবের চোখে তখন জল, গলা ভারী হইয়া গিয়াছে। সে বকুলের একটু কাছে গিয়া বসিল। বকুল একটুও নড়িল না, একটিবার চাহিয়া দেখিল না।

রাজীব জিজ্ঞাসা করিল, শুন্‌ছ? বকুল তেমনি অলসভাবে উত্তর করিল, হুঁ।

রাজীব আবার বলিয়া চলিল, যে দিন তুমি তোমার সেই সন্তানের কথা বল্‌লে, যে দিন বল্‌লে, তোমার মা যেমন ক'রেই হোক, তাঁর নিজের চিতা নিজে সাজিয়েছিলেন, সেদিন তোমারই সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, এইখানেই শেষ হোক্। তারপরেই মনে হ'ল তুমি বলেছিলে, আমি দেবী

নই, আমি মানুষ, আমি নারী, আমার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি দেখ্‌ব আমার সন্তান কেমন হয়। তুমিই আবার বুঝিয়ে বলেছিলে, সে ত সন্তান নয়, সেত আমার আর তার যৌবনের তাগিদের রাহাজানি। তখন মনে হ'ল, তোমার আবার জীবন আরম্ভ হয়েছিল, যেদিন তোমার সেই শিশু এসে বিদ্রোহ ক'রে তোমার সমস্ত অতীতকে অস্বীকার ক'রে চলে গেল।

বকুল উঠিয়া বসিল। রাজীবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ খুব চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, দেখি তোমার আঙ্গুলের আংটিটা।

রাজীব হাত বাড়াইয়া দিল। বকুল তাহার হাতের উপর রাজীবের হাত রাখিয়া আংটিটা দুই একবার ঘুরাইয়া দেখিয়া বলিল, এটা সেই তোমার বাবার আংটি, না? রাজীব কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বকুল আবার রাজীবের হাত ছাড়িয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর বকুল বলিল, কিছু বল্‌ব না বলেছিলাম, তুমি বড় কষ্ট পেয়েছিলে, না? মনে হয়েছিল, আমার দুঃখের কথাও কাউকে বল্‌ব না, সুখের কথাও না। কেন জান? আমি এখন খুব শান্তিতে আছি। এ যে কত স্নিগ্ধ, কত অনাকুল, তা আমি বোঝাতে পার্‌ব না। সারাদিন মেরামতের কাজ করি, সাধুকাকা লোকেদের বাড়ী গিয়ে কাজ দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। ঠিক্ বাবার সময়ে যেমন চল্‌ত, এখনও সংসার তেম্‌নি চল্‌ছে। অভাবও আছে, আর তার উপায়ও ক'রে নিতে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও মনে কোন হাহাকার নাই, তাও নয়। একটু আগে বল্‌ছিলে আজ এখানে আস্‌বার আগে তোমাব মনে হয়েছিল, তোমাকে না দেখেও আমার শান্তি নেই! ঠিক্ তাই, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে ইচ্ছে করে, তোমাকে কাছে দেখি, ইচ্ছে করে একটা নিশ্বাস নিয়ে দুজনে বেঁচে থাকি, ইচ্ছে করে আবার একটি পদ্মের মত শিশুকে কোলে ক'রে দেখি, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে কেমন ক'রে তার পাপড়ি ভরে সে নিয়ে এসেছে। সবই ভাবি, কিন্তু অশান্ত হই না। উদ্‌গ্রীব থাকি, ছট্‌ফট্ করি না। জানি, তোমারও দিনরাত এমনি ভাবেই যায়। কিন্তু রাজীব, মনে ক'রে দেখ দেখি, যা হাত বাড়ালেই পাই, অথচ জানি না তার শেষ কোথায়, তাকে তোমার আমার মধ্যে স্থান না দিয়ে ভাল করেছি কিনা। আমাদের দুজনের বুকের মাঝখানে সে যত বেড়ে উঠ্‌ত, আমরা তত দূরে চলে যেতাম। শেষকালে হয়ত জীবনের

একপ্রান্তে এসে পিছন ফিরে দেখ্‌তাম মরণ আর জীবনের মাঝখানে এক তিল স্থান নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বাতাসকে শেষ নিশ্বাসটিও ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

বকুলের কথা শেষ হইতেই সাধুকাকা, সেই বৃদ্ধ, আসিয়া বলিল, ওরে ওরে বকুল, আজ ভারি মজা হয়েছে। আজ তাকে দেখ্‌লাম। আমার পেছনে পেছনে এসে বাড়ী দেখে গেছে। আমি সব টের পাচ্ছিলাম, কিন্তু একটুও তাকে জান্‌তে দিইনি। রাজীব কোনও কথা বলিল না। বকুল বলিল, তাহ'লে অনেকদিন পরে গ্রামে এলেন। শুনেছিলাম আজকাল তাঁর অনেক কাজ। সহরেই নাকি খুব কাজ করছেন। সভায় বক্তৃতা করেন, কাগজে লেখেন, সমাজে একজন গণ্যমান্য লোক।

বৃদ্ধের দুইটি চোখ হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। শীর্ণ গালে রক্তের আভা ফুটিয়া উঠিল। সে আরও চুপি চুপি বলিল, বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গেছে তাই জমিদারীতে এসেছে। কালই সব খবর পাব। এইবার আমার হাতে পড়েছ যাদু, এবার তোমার টুঁটি ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দেব। নদী লাল হ'য়ে উঠ্‌বে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কপালের ও হাতের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল। প্রতিশোধের আশায় তাহার দুই চোখ জ্বলিতে লাগিল।

বকুল তাহা লক্ষ্য করিল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের কাছে যাইয়া বলিল, সে কে জান ত সাধুকাকা?

বৃদ্ধ রাগিয়া বলিল, জানি, জানি সে জমিদারের ছেলে। তাতে আমি ভয় করি না। আমার আবার কিসের ভাবনা? দেব বেটাকে শেষ ক'রে।

বকুল বৃদ্ধের মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিল, সে শুধু জমিদারের ছেলে নয়, আমারও কেউ।

বৃদ্ধ চাপা হাতের ভিতর দিয়াই রুখিয়া চীৎকার করিল, কেউ না। ওটা রাক্ষস।

বকুল এবার হাত নামাইয়া লইল। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, রাক্ষস হ'তে পারে। আমি রক্ত দিয়েছিলাম তাইত সে ক্ষুধা মেটাতে পেরেছিল। আমি নিজে যদি তা না দিতাম, সাধ্য ছিল তার?

বৃদ্ধ এবার বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, তাই ত! কেবল ত তারই সব দোষ নয়। তাহার পরেই বড় ব্যাকুল ভাবে

বলিল, কিন্তু কেন এমন করেছিলি বকুল। তুই ত যে-সে মেয়ে না। তুই কি ক'রে ও কাজ করলি? তোরা বড় ঘরেরই মেয়ে, শিক্ষা পেয়েছিলি, বাপ অমন বুদ্ধিমান্ লোক, তার মেয়ে তুই—

বকুল দেখিল বৃদ্ধের যেন প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। সে বৃদ্ধের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া উত্তর করিল, কেন করেছিলাম? খুব সোজা কথা। তাকে খুব ভাল লেগেছিল। আর ভাল লেগেছিল তাদের বাড়ীর প্রচুর স্বচ্ছন্দতা। মা সে বাড়ীতে থাকতেন, অনেক দিন আগে থেকে। বাবারা আর তারা এক জাত, তবু বাবা তাদের উপকার করা ছাড়া, একটি উপকার তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে নেন্ নি। মাকেও থাকতে দিয়েছিলেন ঐ ভাব থেকে। এঁর বাবা বেঁচে থাকতে মা তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। ইনি তখন শিশু, মাতৃহীন, আর আমিও শিশু। ঐ মাতৃহীন শিশুর নাম ক'রে বৃদ্ধ রামকমল মাকে বাবার কাছ থেকে ব'লে কয়ে তাঁর পরিবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ত সবই জান। আমিও বড় হ'লাম, তিনিও বড় হ'লেন। সবাই দেখ্ত আমরা খেলার সাথী। তারপরে যে কোন্ ফাঁকে সবাইকে ফাঁকি দিলাম তা আমারও ভাল ক'রে মনে নেই। রাজীব বহুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়াছিল। এবারে সে দৃঢ়মুষ্টিতে মাটীর উপর আঘাত করিয়া ঘৃণার সুরে বলিল, কিন্তু সেই শিশুকে এমন ক'রে হত্যা করল কেন?

বকুল রাজীবের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। খুব স্পষ্ট করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হত্যা করল কেন? তার মান, তার সমাজ বড়, না, ঐ ক'টা নিশ্বাস মাত্র যে নিয়েছে ঐ শিশুটা বড়। তাও, রাখ্বার কোনও বিধান নাই, মেরে ফেললেও কোনও শাস্তি নাই। তাকে হত্যা করতে হ'ল বলেই করল। সেইটেই সব চাইতে সুবিধের ছিল। মা সেই সুবিধাকে দুষ্কর করতে গিয়েছিলেন, বিধিমতে তাঁকেও সরান হ'ল। সেই মৃতদেহের বুকের উপর ঐ শিশুকে লুকিয়ে রেখে এক সঙ্গে চিতার উপর ভস্ম করা হ'ল। আমি ত এতকাল তা জানতাম না।

রাজীব বলিয়া উঠিল, দস্যুর চাইতেও নৃশংস এরা!

বকুল তেমনি স্থিরভাবে উত্তর করিল, আমি ওদের হ'য়ে এটুকু বলতে পারি, আর যদি কোনও পথ থাক্ত, তাহ'লে ওরা এতখানি নিষ্ঠুর কাজ করত না। তারাই বা কি করবে। তোমরা তাদের থাক্বার স্থান রাখনি, যাবারও পথ

রাখনি। যদি কোনও জবাবদিহি না দিয়ে মানুষের সন্তান বলে ঐ শিশুকে তাদের বাড়ীতে রাখা চল্‌ত, আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তিনি ওকে এমন ক'রে মানুষ করতেন, যাতে ওর মন শান্তি পায়। তা ছাড়া পিতৃহীন যুবক, তাকে সাহস দেবার কেউ ছিল না, দুঃসাহসে সবাই তাকে চোখ ঢেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার যদি জ্ঞান থাক্‌ত, আমি তাঁকে বল্‌তাম, ঐ শিশুকে রাখ্‌তে, না হয় আমি নিজে নিতাম। আমার এখন যে দশা, উপলক্ষ্য-টুকু বেঁচে থাক্‌লে তার বাড়া কিছু করতে পারত না কেউ!

বৃদ্ধ বলিল, ওরাই ত তোর বাবাকে মদ ধরালে!

বকুল বলিল, ধরাবে না? ঐ একটা মুখ ছিল, যে বিচার চাইতে পারে। তার গলায় আকণ্ঠ বিষ ঢেলে দিয়ে সে শক্তিকে চূর্ণ করবে না তারা? বাবাকে তারা বোঝাল, তুমি শোক ভুল্‌বে, দুঃখ ভুল্‌বে। সব ভাল মানুষ যা করে, বাবাও তাই কর্‌লেন। সাধুকাকা, আজ মনে পড়ে, একদিন তোমার আর্ত্তনাদ শুনেই বাবার মনে পড়্‌ল, এতদিনের বিষের স্রোত ঢেলেও একটা বোঝা তলিয়ে দিতে পারে নি। আর সেই শেষ।

বকুলের কথা শেষ হইবার পরও বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল। তাহার পর ধরা গলায় প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাকে ত দেখ্‌লাম না একদিন। সে যেন তার শেষ ক'রে আমার আরম্ভ ক'রে দিয়ে গেল। আচ্ছা বল্‌ ত বকুল, তার পর কি হবে?

বকুল জিজ্ঞাসা করিল, কার পর? তুমিও যখন চলে যাবে?

হ্যাঁ তখন?

বকুল মুখ ফিরাইয়া রাজীবের দিকে চাহিতেই বৃদ্ধ বলিল, কিন্তু লোকে আবার কথা তুল্‌বে। মানুষের বিশ্বাস একটু বয়েস বেশী হ'লে তাকে দিয়ে কোনও ভয় থাকে না। রাজীবকেও তাই সন্দেহই করবে।

বকুল বলিল, সন্দেহ কর্‌বে? আজ যদি রাজীব আমাকে বিয়ে করে?

বৃদ্ধ এবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, না তাহ'লে আর কি বল্‌বে?

বকুল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখ রাজীব, প্রাণ গেলেও আমাকে বিয়ে কোরো না। আমি যদি তোমাকে প্রলোভনে টানি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও। তার পূর্ব্বে যতদিন পার, আমাকে জান্‌তে দিও, তুমি আমার কাছে আছ। দেখ্‌তে না পাই তোমাকে, যেন মনে কর্‌তে পারি এক মুহূর্ত্তে

তোমাকে কাছে পেতে পারি। তুমি কোথাও আমার পাশে পাশে আছ সেটা জীবনের বাইরেই হোক্, আর ভিতরেই হোক্, কিছু আসে যায় না।

বৃদ্ধ বকুলের ছোট হাতখানি ধরিয়া নিজের চোখের উপর বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কিন্তু যদি—

রাজীব বাধা দিয়া বলিল, যদি আবার তেমনি হয়? আমাদের সমস্ত অক্ষমতাকে ঢাক্‌তে গিয়ে একটা বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করব না। আর সেই শিশু যাতে পরে আমাদের শত্রুর মত মনে না করে, তার ব্যবস্থা তার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই হবে।

বৃদ্ধ উঠিয়া মুখ হাত ধুইতে গেল। রাজীবও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ তবে যাই বকুল?

বকুল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আর একটু বসো। আর একটা কথা আছে।

রাজীব জিজ্ঞাসা করিল, কি?

বকুল হাসিতে হাসিতে বলিল, এতক্ষণ যা বল্‌লাম তা'ত সব কবিত্বের মতই শোনাল। তাই না? আচ্ছা, আমি যদি বলি তুমি আবার এসে আমাদের সঙ্গে থাকবে, পারবে তা?

পারব মানে?

না, আমি নিজে জান্‌তে চাই, তোমাকে কাছে পেয়েও আমি যা বলি আর ভাবি তা সম্ভব হয় কিনা। আর লোকেরাও জান্‌বে সেই আমি এই। এটা কি মন্দ কথা?

রাজীব বলিল, এতক্ষণ আমারও ঠিক্ তাই মনে হচ্ছিল। নিজেকে শাসন করতে হ'লে যে কতখানি খাঁটি আর কতখানি নিষ্ঠুর হ'তে হয়, তা যে মা সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে তাকে শাস্তি দেন্ তিনিও বোধ হয় ধারণা করতে পারেন না। কিন্তু সব সম্ভব হবে কি?

বকুল বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন হবে না? সমস্ত শূন্য ভরে বাতাস নিরন্তর তার কাছে রয়েছে, কিন্তু শূন্যের গায়ে কোথাও একটা আঁচড়ের দাগ দেখেছ?

রাজীব স্বীকার করিল, তবে তাই হবে। আমি হার মান্‌তে চাই, তুমি বিজয়িনী হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিও, তুমি যদি নিজেকে ভোল, আমি আমার শক্তি দিয়ে তোমাকে রক্ষে করব।

রাজীব উঠিতেই চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ সাধুকাকা ভিজা গামছা দিয়া মুখ মুছিতেছে, আর তাহাদের দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিতেছে।

বকুল উঠিয়া পড়িয়া সাধুকাকাকে এক ঝাঁকানি দিয়া বলিল, হাস্‌ছ যে? ঠাট্টা মনে কর্‌ছ সব?

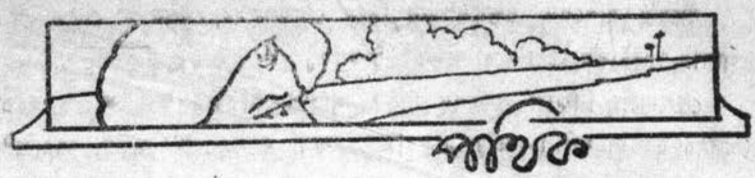
বৃদ্ধ উপহাস করিয়া বলিল, ধর্ যেন আমি পৃথিবীর হ'য়ে তোদের ঐ সব কথা শুনে হাস্‌ছি। সর্ব্বদা মনে রাখিস্ পৃথিবী কেবলই তোদের দিকে তাকিয়ে হাস্‌ছে। একটুও তোদের বিশ্বাস কর্‌ছে না।

বকুল বলিল, ইস্।

রাজীব বলিল, আচ্ছা! দেখা যাবে।

পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশী; তারা কোন কাজই কর্‌তে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধূলা পায়, তা পিঠেই হোক্ আর মাথাতেই হোক্।

"ঘরে বাইরে"



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৬

সমস্ত দুপুর এবং সন্ধ্যা বন্ধুগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শ্রীশ যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। বাহির হইতে ডাইনিং রুমের মিশ্রিত কোলাহল শুনিয়া শ্রীশ প্রমাদ গণিল। জলের গ্লাস এবং ডিস্ প্রভৃতির যে শব্দ হইতেছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, আহার বহুক্ষণ হইতেই চলিতেছে। কিন্তু উপায় নাই। সমস্ত দিনের ধূলা-ধূসরিত কাপড়-জামার কথা মনে করিয়া সে খাইবার ঘরে যাইতে পারিল না। মুখ হাত ধুইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সে যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটিতে আসিয়া বসিল, তখন নিবিষ্ট মনে সকলে পাতের দিকে চাহিয়া খাইয়া চলিয়াছে।

বর্ষিয়সী শিক্ষয়িত্রী যেমন চশমার ভিতর দিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করে, সেই ভাবে মাথা নীচু এবং চোখের তারা ভ্রূর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া শ্রীশের দিকে তাকাইয়া মায়া বলিল—দেরি হ'ল কেন।—আঁ ?—

শ্রীশ। খাবার সময়টা তোমরা যদি নিজেদের খিদের সঙ্গে বদ্‌লাতে থাক, তাহ'লে দোষটা কি আমার ?

মায়া। অর্থাৎ ?

শ্রীশ। অর্থাৎ আটটা বাজ্‌তে এখনও সাত মিনিট।

মায়া। তোমার ঘড়িটা মিথ্যেব্যাদী। বাড়ীতে যতগুলো ঘড়ি আছে দেখে এস, সবাই তার সাক্ষী দেবে। ওটাকে Reformatoryতে পাঠাও।

শ্রীশ সদর্পে ঘড়িটি মায়ার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া তাহার সত্যবাদীত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া দেখিল সেকেণ্ড হ্যাণ্ডটি স্থির নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে! ঘড়িটিকে কানের কাছে আনিয়া তাহার হৃদয়-স্পন্দন শুনিতে চেষ্টা

করিল, সেও নীরব! বিপুল বেগে ঝাঁকানি দিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! মায়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র বলিলেন—সম্ভবত ওর খিদে পেয়েছে রে, খেতে দে খেতে দে। আমার ঘড়িটারও মধ্যে মধ্যে অমন ফিট্ হয়।

সে রাত্রে বিকাশ সকলের সহিত আহার করিবার জন্য আহূত হইয়া আসিয়াছিল। বলিল—ঘড়ি যদি মিথ্যে কথা বলে সেটা ততটা মারাত্মক হয় না, কিন্তু ঐ ঘড়িকে বিশ্বাস ক'রে যদি আর কারো ঘড়ি মিলিয়ে দেন—'

শ্রীশ চিংড়িমাছের কাট্‌লেটের খানিকটা মুখে পুরিয়া বলিল—দেন কি? দিয়েছি! মজাবে দেখ্‌ছি! সে আর কারো ঘড়ি নয়, উমার!

সকলে শ্রীশের এই ভ্রান্তি বিশেষ ভাবে উপভোগ করিতেছিল।

মায়া বলিল—তোমাকে একটু জোরে মুখ চালাতে হবে নইলে আমাদের ধর্‌তে পার্‌বে না, আমরা মাংসে এসেছি।

শ্রীশ। By neck জিতে যাব, দেখ্।

সুবর্ণ বকিয়া উঠিলেন—ও ছুটোতে যে কি করে, তার ঠিক নেই। না শ্রীশ তাড়াতাড়ি ক'র না। পালিয়ে যাচ্ছে না ত কিছু।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এমন সহজ স্নেহের সুরের কথা সুবর্ণের নিকট হইতে কেহই আশা করিত না। খাইবার সময়ে পাছে কোন অসংযত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সকলে বিশেষ উৎকণ্ঠিত থাকিত। মুখে 'চপ্ চপ' না শব্দ হয়। 'কোঁৎ কোঁৎ' করিয়া জল কেহ না খাইয়া ফেলে। খাইবার সময় মেয়েদের গা-চুলকান, এবং ছেলেদের আহারান্তে পেটে হাত বুলান, ঢেঁকুর তোলা—কোন দিন তিনি সহ্য করিতেন না।

তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া বিবাহের অব্যবহিত পরেই চির-উচ্ছৃঙ্খল চন্দ্রকুমার শুধ্‌রাইয়া গিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ আজও সাধ্যমত চেষ্টা করেন। অসাবধান হইয়া পড়িলে 'I am sorry, excuse me' প্রভৃতি বলিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে এ যাবৎ তিনি অাঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পেটে হাত বুলান, আহারান্তে পান মুখে দিয়া উদ্গার তুলেন, এবং এ সমস্ত গর্হিত কর্ম্মের সময় তিনি বড়দির অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। কিন্তু এ সমস্তই বহু পূর্ব্বের কথা। তখনকার সুবর্ণ এবং এখনকার সুবর্ণের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বলিল—জানেন বড়মাসী, প্রিয়বাবু কমলার বিয়েতে মত দিয়েছেন।

শ্রীশের এই কথাটী সুবর্ণের কাছে একদিন হয়ত অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিত, এবং তীব্রভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু এখন বলিলেন—প্রিয়বাবুর অপরাধ? মত না দিয়ে তিনি কি কর্‌বেন? যে সব ধিঙ্গী হ'চ্ছ তোমরা, কোন্ দিন বল্‌বে 'আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও, আমি নিয়ে খেলা কর্‌ব। এবং কথা কয়টী বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন। পূর্ব্বে হয়ত তিনি ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিতেন কিন্তু তাহার সুর শুনিয়া সকলের হৃৎকম্প হইত।

শ্রীশ আড়চোখে একবার সুবর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া ছেলে-মানুষী সুরে বলিল—ওটা বুঝি আকাশের চাঁদ চাওয়া?—

সুবর্ণ। নয় ত কি?—কি বাপু এই সব ভাই-বোনে বিয়ে, চুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। তোমার কি মত বিকাশ, এ সব ভাল?—

বিকাশ। বড় শক্ত প্রশ্ন কর্‌লেন সোনা মাসী। ভাল মন্দ বলা কি সহজ? তবে মনে হয় এ সব বিয়ে বেশী হবে না। দুএকটা হ'লে তাকে ক্ষমা ক'রে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া এ সব দেশাচার বৈ ত আর কিছুই নয়, এই ধরুন না, দ্রাবিড়ি ভদ্রলোকেরা ভাগ্নিকে পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌তে চায় না, সেটা তাদের খুব উঁচু ধরণের বিয়ে—

দীপ্তি তখন সবে জলের গ্লাসটি মুখে তুলিয়াছে, হাসির ধাক্কায় তাহার বিষম লাগিল এবং এক মুখ জল লইয়া কাশিতে কাশিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে সুবর্ণ প্রভৃতির মুখও রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মায়া বলিল—বাবারে! বিকাশ বাবু, এখুনি দীপ্তিটাকে মেরে ফেলেছিলেন! হাস্‌তে হাস্‌তে মারা গেলে লোকে বল্‌বে কি?

দীপ্তি চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া পুনরায় তাহার চেয়ারে বসিতেই বিকাশ বলিল—এত হাসি পাবে তা জান্‌তাম না, মায়া দি।

শ্রীশ। কিন্তু কোন দেশের প্রথাকে নিয়ে এমন ক'রে হাস্‌তে দিতে পারি না। হাসিগুলো তোমরা চেপে নাও মায়া।

গম্ভীর ভাবে এই আদেশ করিতে গিয়া শ্রীশ নিজেও পুনরায় হাসিয়া ফেলিল।

করুণা। তুই নিজে নিজেই হাস্‌ছিস্ আবার পরের ওপর 'তম্বি'।

শ্রীশ। বিকাশ অমন কথা বলে কেন? আমাদের বাঙ্গালীর নাড়ী স্বভাবতই একটু ঢিলে, ওর সে কথা ভাবা উচিত ছিল।

মায়া। বিকাশবাবুর দোষ নেই, তুমিই আজ কিছু অতিরিক্ত খোস্ মেজাজে আছ, আর তার কারণও আমি জানি। কিন্তু বল্‌ব না।

'জানি।—কিন্তু বল্‌ব না' বলিলে শ্রোতাদিগের মধ্যে যে অশান্তির উদ্রেক হয়, তাহা প্রত্যেকের মুখেই ফুটিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র বলিলেন—কি হয়েছে রে মায়া?

মায়া। আচ্ছা, শুধু আপনাকেই বল্‌ছি মেসোমশাই। এবারকার এশিয়েটিক সোসাইটির জারনেলে শ্রীশদার একটা নির্ঘণ্ট বেরিয়েছে—

শ্রীশ। তোর বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে মায়া।

মায়া বিশেষ বিচলিত না হইয়া বলিল—আর জানেন মেসোমশাই, ডাঃ বুশে সেই নির্ঘণ্টের তারিফ ক'রে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়ে শ্রীশদার উর্ব্বর মস্তিষ্কের ঘিলু, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন করেছেন। তাঁর মতে এমন মাথা নাকি বাংলাদেশে আর নেই!

মায়া ধীরে ধীরে কথা কয়টি বলিয়া শ্রীশের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল—নির্ঘণ্টের বিষয়টা কি জানেন মেসোমশাই, র‍্যাম্‌ফিশিস্‌কিআমস্‌লোপোখিয়াস্ যখন ইজিপ্টের রাজা, তখন প্রবল পরাক্রান্ত ডেরায়াগাজিমোলোসোকোপো-আসুর এসিরিয়ার সিংহাসনে ছিলেন। উভয়ের রাজত্বকাল যে ঐতিহাসিকগণ ৩০০০ বি, সি, বলে নির্দ্ধারিত করেছেন, শ্রীশদার মতে, তা আসলে হচ্ছে ৪০৪৯ এ, ডি। আর সেই সময়ে ঘনরিংরিংড্রাড়িম্বকাসুর ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একছত্র অধিপতি। ইনি এসিরিয়া হইতে বিতাড়িত হ'য়ে ভারতবর্ষে এসে ছিলেন। পরে রামচন্দ্রের সেনার হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে গতাসু হন।

এই স্ব কপোল-কল্পিত অত্যন্ত উদ্ভট ব্যাপারটি এমন ভাবে মায়া বলিয়া গেল যে বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুই ধরিতে পারিলেন না এবং বর্ণনার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—Quite interesting! সত্যি ঐ Egyptology জিনিসটা আমাদের দেশে আজও কেন যে সম্মান পেল না, তাই আশ্চর্য্য লাগে।

মায়ার হাতের একটি ছোট চিম্‌টি খাইয়া বিকাশও এই প্রত্নতত্ত্বে নামিয়া পড়িল। বলিল—কিন্তু ডাঃ বুশে, কি তারিখ সম্বন্ধে শ্রীশবাবুর মতই sanguine? কিন্তু ডাঃ সিন্‌টারনিট্‌জ্‌'এর একটা লেখায় যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে যে, রামায়নের রচনা কাল ঠিক না পাওয়া গেলেও মোটামুটি ভাবে ৪০০০ বি, সি'র পূর্ব্বে বলা যেতে পারে। এ, ডি, নয়।

মায়া। তা হবে। আমার তারিখটা ঠিক মনে নেই শ্রীশদা কি দিয়েছে। আর জানেন মেসোমশাই, আমাদের ওরিয়েন্টাল আর্টে যে 'স্যারাসেনিক' প্রভাব আমরা দেখ্‌তে পাই, তা ঘনরিংরিংদ্রাড়িম্বকাসুরের আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশদা দেখিয়েছে যে গান্ধার, বার্হুৎ প্রভৃতির অতি প্রাচীনতম শিল্পে এই স্যারাসেনিক প্রভাব আজও জীবন্ত রয়েছে।

এত বৃহৎ একখানি ঐতিহাসিক তথ্য সকলের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া একটি সন্দেশ মুখে পুরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মায়া শ্রীশের দিকে তাকাইল।

বিকাশ মায়ার দিকে একবার তাকাইয়া তাহার চোখের ইঙ্গিতে উৎসাহিত হইয়া বলিল—কিন্তু পৃথ্বীশ ঠাকুর প্রমুখ ওরিয়েন্টাল আর্টের মহা মহা পাণ্ডারা শ্রীশবাবুকে এর জন্যে সহজে ছাড়্‌বেন না মনে হয়। তাঁদের মতে ওটা একেবারে বিশুদ্ধ জিনিষ। বিশুদ্ধকে ভেজাল বল্‌লে—

বীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন—ভেজাল কথাটা ঠিক নয় বিকাশ। 'Influence', বলা যেতে পারে। Oriental Artএ যদি Greek বা Saracenic influence থাকে তাতে লজ্জা পাবার কি আছে? তা ছাড়া New School of Paintingএর অনেক ছবিতেই আমি ত 'চাইনিজ ইন্‌ফ্লুএন্স' দেখ্‌তে পাই। অবশ্য আমি যদিও কিছু বুঝি না। শ্রীশের লেখাটা আমাকে একবার দেখ্‌তে হবে।

বিকাশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া মিনতি-পূর্ণ চোখে মায়ার দিকে তাকাইয়া জানাইল—আর বেশী দুর গিয়ে কাজ নেই—

মায়া বলিল—শ্রীশদা ঠিক Oriental Artএর ওপর যে ঝোঁক দিয়েছে তা মনে হয় না, artটাকে সঙ্গে রেখেছে মাত্র দৃষ্টান্তের জন্য। আর এ দৃষ্টান্তটা ডাঃ বুশেও মেনে নেন নি। তিনি লিখেছেন—I don't quite agree with Mr. Mitra about the Assyrian Prince, who settled in India, and, don't think the Prince has anything much to do with the art. Rather I believe the foreign influence came with the Greeks during and after the reign of Chandra Gupta.

বীরেন্দ্রনাথ। There you are! 'Influence', ডাঃ বুশেও স্বীকার করেছেন সে কথা।

বিকাশ। ডাঃ সিন্টারনিট্জও করেন।

মায়া। কিন্তু এই সব বিদেশী পণ্ডিতরা যেমন—I dont quite agree—' বলে ছেড়েদিলেন, আমাদের অজয়চন্দ্র, গোপালদাস প্রভৃতি দেশী পণ্ডিতরা তাঁদের মতের সঙ্গে না মিল্‌লে, Ancient civilization'এর নথি আর Ancient coinsএর তোড়া শ্রীশদার নাকের ওপর ছুঁড়ে মেরে বল্‌বেন—'মূর্খ', 'অর্ব্বাচীন', 'বাতুল'। আর যদি একান্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহ'লে বল্‌বেন—'অজাত-শ্মশ্রু'। শ্রীশদা, বেশ ত ছিলে এতদিন. আবার কেন ঐ সব শিলালিপির মধ্যে গিয়ে পড়্‌লে? শেষ কালে প্রফেসর্ মুঢ়েল্‌করের মত উল্টোপাল্টা ক'রে পড়ে Thesis লিখ্‌বে আর লোকে বল্‌বে—

তাঁতি থাচ্ছিল বেশ তাঁত বুনে
কাল হ'ল তার ষাঁড় কিনে!

মায়ার এই মন্তব্য প্রকাশের পর টেবিলে উপবিষ্ট সকলের উচ্চ হাসির সঙ্গে ঘরখানি ভরিয়া গেল।

বীরেন্দ্রনাথ, Bad—bad, Very bad মায়া, বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাসিতে লাগিলেন। এবং মায়ার কৌতুক করিবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া সুবর্ণ হাসিতে উছলিত মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—বাঁদর মেয়ে, ও না তোর দাদা?

বীরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন— না বড়দি, I support মায়া। But this is puzzling, very puzzling indeed! You are all pulling my legs or what?—কি বিকাশ মাথা নীচু করছ যে?

বিকাশ মায়ার দিকে তাকাইল। মায়ার মুখ নির্ব্বিকার! সে চামচে করিয়া 'কাষ্টার্ড' মুখে দিতেছে। নিরুপায় হইয়া বিকাশ বলিল—শ্রীশ বাবু Ancient civilization'এর ওপর যে thesis লিখেছেন তা সত্যি, আর তা নিয়ে antiquarianদের মধ্যে বেশ যে একটা আন্দোলন চল্‌ছে তাও সত্যি কিন্তু মায়াদি যা বল্‌লেন, তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মায়া। You traitor!

বীরেন্দ্র উচ্ছ্বসিত আবেগে হাসিয়া বলিলেন—You scamps, but don't fight. I will sleep better to night! অনেক দিন এমন ক'রে হাস্‌তে পাইনি। কিন্তু কি নাম বল্‌লি রে ঐ রাজা তিনটের? আর একবার বল্ ত।

মায়া হাসিয়া বলিল—মনে নেই।—শ্রীশদা রাগ হ'ল ?

শ্রীশের রাগিবার কোন কারণ নাই। সে এই মায়াবিনী, এই কৌতুক রসের উৎসকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার অফুরন্ত হাসি কোলাহল দিয়া নিরানন্দের জগদ্দল শিলাটিকে সংসারের বুক হইতে ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই। হাসিয়া বলিল—না, রাগ হবে না, ইচ্ছা করছে তোর জুলপি ধরে ঘোড়্দৌড় করাই। বিকাশের সঙ্গে আগে থেকে ষড়্যন্ত্র করা হয়েছিল।

মায়া। কখন না।

দীপ্তি। কখন না? না দাদা, বিকেল থেকে দুজনে মিলে পড়্ছিল তোমার লেখাটা, তারপর দিদি বল্‌ল—'

মায়া। 'দিদি বল্‌ল,'—উন্নুনমুখী। আমি কি বিকাশবাবুকে শিখিয়ে দিয়েছি কি বল্‌তে হবে? উনি ত নিজে থেকেই বলেছেন।

বিকাশ ধরা পড়িয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিল—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে।

বীরেন্দ্রনাথ। আরে কি বলে তার ঠিক নেই! এ রকম অন্যায় রোজ রোজ কিছু হ'লে আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচ্‌ব, with my tooth in the head.

আহারান্তে সকলে ড্রইং রুমে আসিয়া বসিতেই, দীপ্তিকে বাহিরে লইয়া গিয়া মায়া বলিল—এই শোন্, তুই গেটের কাছে ঐ হেনা গাছটার পিছনে লুকিয়া থাক্ গিয়ে, শ্রীশদাকে জব্দ কর্‌বার একটা plan করেছি। কিন্তু খবরদার, আমি না আসা পর্য্যন্ত নড়্‌বি না।

দীপ্তি। তোর জ্বালায় আর পারি না। কি আবার plan মাথায় এল ?

মায়া টানিয়া দীপ্তিকে পথে নামাইয়া দিয়া বলিল—যা ছুটে, বেশী কত্তাত্তি করতে হবে না।

দীপ্তি তাহার দিদিকে ভাল করিয়াই চিনে, সে আর প্রতিবাদ না করিয়া যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মায়া ড্রইং রুমে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কি বিকাশবাবু আপনার ঘড়িতেও আটটা বেজে সাত মিনিট হ'য়ে আছে নাকি ?

বিকাশ তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাইল—দশটা বাজিতে দুই মিনিট বাকি! দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ইঃ অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আসি।

করুণা বলিলেন—তুমি কি ক'রে যাবে? আমাদের গাড়ীটা—

বিকাশ। কিছু না, কোন দরকার নেই, এইটুকু হেঁটে গিয়ে সারকিউলার রোডের মোড় থেকে একটা কিছু নিয়ে নেবো, আসি।

মায়া বিকাশের সহিত গাড়ীবারাণ্ডার নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—আর পিছনে তাকাতে হবে না। দীপ্তি ওপরে গেছে। আচ্ছা এক অকবির পাল্লায় পড়েছেন, বিদায় বেলার শেষ চাহনির মর্ম্ম পোড়ারমুখী বোঝে না! দেখুন, আপনি যাবার সময় ঐ ডানদিককার হেনার ঝাড় থেকে কিছু ফুল নিয়ে যাবেন, ঘরে রাখ্‌লে রাতে বেশ গন্ধ দেয়। নমস্কার, ফুল নিয়ে যাবেন, কিন্তু ভুল্‌বেন না—

বিকাশ নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইতেই মায়া উঠিয়া আসিয়া একটী থামের আড়ালে দাঁড়াইল।

মায়ার আদেশমত বিকাশ হেনা গাছের ঝাড়ের নিকট আসিয়া দীপ্তির উপরের ঘরের দিকে তাকাইয়া আন্‌মনে ফুল ছিঁড়িতে গিয়া বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিয়া ফেলিল।

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—পোড়ারমুখী কি শয়তান! আমায় বল্‌ল—

বিকাশ এক গুচ্ছ ফুল ছিঁড়িয়া দীপ্তির হাতে দিয়া ফুলশুদ্ধ তাহার হাতখানি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহা আপনার মুখের কাছে তুলিয়া আনিয়া মুখ রাখিতে গিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া ত্রস্ত পদে ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিকাশের এই বালক-সুলভ দ্বিধা বা লজ্জা দীপ্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে হাতখানি আপনার মুখের কাছে তুলিয়া কম্পিত বক্ষে ফুলগুলিকে চুম্বনে অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা বিকাশ তাহাকে বলিয়াছিল, জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কিছু নেবো না, তুমি দিলে তবে নেবো।

পুরুষ কেন এমন হয়? শক্তি, সুযোগ, সুবিধা তাহার আয়ত্তের মধ্যে থাকিতেও কেন সে তাহা ব্যবহার করিবে না? দীপ্তির মনে হইল বিকাশ এমন করিয়া তাহার অনুমতির অপেক্ষায় না থাকিয়া যদি—হাঁ যদি আজ তাহাকে চুম্বন করিত, সে একটুও রাগ করিত না, অসন্তুষ্ট হইত না।—খুব ভাল্ লাগিত।

দীপ্তির চিন্তার মধ্যে মায়া কখন্ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে,

তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহার চমক ভাঙ্গিল মায়ার কথা শুনিয়া—ঢের হয়েছে, আর সংঙের মত দাঁড়িয়ে কি হবে?

দীপ্তি। আমি ইচ্ছে ক'রে ওকে—

মায়া। ইচ্ছে অনিচ্ছে জানি না, ওকে তাড়ালি এটা ত ঠিক?

দীপ্তি। ও চলে গেল যে।

মায়া। 'ন্যাকা! যাবে না? সারা রাত্তির তীর্থের কাকের মত হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে নাকি? কখন তোমার দয়া হবে—ওকে চাস্‌, না—না?

দীপ্তি হাসিয়া ফেলিল। মায়া বলিল—বল্‌ শিগ্‌গির—'

দীপ্তি। চাই।

মায়া বিদ্রূপের সুরে বলিল 'চাই' আমাকে বলে কি হ'বে? আর দুমিনিট আগে সে কথা ওকে বল্‌তে পার্‌তে না? তাড়িয়ে দিয়ে এখন মাথা খুঁড়ে মর্‌লে কি হবে? যা বেরো ঘুমোগে যা।

দীপ্তি। তুই যাবি না?

মায়া। না এখন আমার বর আস্‌বে, তাকে আদর করব। সমস্ত দিন তাকে দেখিনি। যা পালা—

মায়া ধীরে ধীরে শ্রান্তভাবে একটি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। দীপ্তি মায়ার পাশে বসিয়া তাহার মাথাটি আপনার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—সমস্ত দিন দস্তি-বিত্তি কর্‌বি! খুব tired লাগ্‌ছে ত এখন?

মায়া তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া চোখ বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিল—উঃ disgusting! নরম নরম jelley হাত! থু-থু, মোটা চওড়া হাত, কাজ ক'রে ক'রে চামড়া শক্ত হ'য়ে গেছে, সেই হাত চাই। আমার কপালের ওপর সে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেবে, তার মনে ভয় জাগ্‌বে পাছে আমার কপালটা ফেটে যায়, আর আমি এম্‌নি ক'রে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাক্‌ব—'

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—মরণ আর কি! তোকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে! আমি পালাই বাবা—

দীপ্তি চলিয়া গেল। মায়া তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এখানে আসিয়া পর্যন্ত মায়া প্রতিদিন এমনি অবিশ্রান্ত ভাবে আপনাকে সকলের সহিত মিশাইয়া, সকলের দিনগুলিকে আনন্দপূর্ণ করিয়া, রাত্রের অন্ধকারে আপনার শ্রান্ত শরীর ও মনটিকে লইয়া বাগানে বসিয়া থাকে।

এ সময়ে সে দীপ্তিকেও কাছে রাখিতে চায় না। সে থাকিলে তাহার শ্রান্তি যেন দূর হয় না। রাত্রের এই স্তব্ধ নীরব মুহূর্ত্তগুলি আপনার ইচ্ছা মত সে উপভোগ করিতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া যায়,—একা।

দিনের বেলা দর্শন শাস্ত্রের শুষ্ক পত্রগুলি চর্ব্বন করিতে করিতে সে ছুটিয়া করুণা বা সুবর্ণের কোলে গিয়া বসে, কিছুক্ষণ তাঁহাদের আদর করিয়া বা আদর লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করে। পড়িতে পড়িতেই সে দীপ্তি এবং শ্রীশকে সহস্র প্রকারে বিরক্ত করে—দীপ্তি তোর গালে যে 'থোবা' 'থোবা' মাংস হয়েছে লো! শ্রীশদাকে কিছু ধার দে না! শ্রীশ কাছে থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাটিয়াল সুরে গান ধরে:—

কার জন্যে ভাব রে মন
কার জন্যে ভাব?
তোমার জন্যে কেউ কি ভাবে?
ভূতের বেগার খেটে মর—
নাহি জান কি ভাবনা!—

শ্রীশদা কৃচ্ছ্র-সাধন একটু কমাও না?' কিম্বা কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার সময় শ্রীশের পরাজয় হইলে চীৎকার করিয়া সেই সুসংবাদ সকলকে শুনাইয়া দেয়—শ্রীশদাটা হেরে গেল!

বীরেন্দ্রনাথেরও নিস্তার নাই। মায়া হাসিয়া বলিয়া উঠে—অ মেসোমশাই, আপনার পায়ে দুরকম মোজা! একটা সবুজ আর একটা নেভি ব্লু! তাও আবার একটা উল্টো! হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া এক রঙের মোজা লইয়া আসিয়া বীরেন্দ্রনাথের জুতার ফিতা খুলিয়া ঠিক করিয়া পরাইয়া দেয়।

যখন তখন গান গাহিয়া উঠা তাহার স্বভাব। গান যখন গায়, তখন গানের কথা সম্বন্ধে কোন বাচ-বিচার করে না, কোন সঙ্কোচও তাহার মনে থাকে না। করুণা সুবর্ণ প্রভৃতির সম্মুখেই সে গাইয়া উঠে:--

ভালবাসি বলে তাই তোমারে
দেখ্‌তে আসি প্রাণ।

সুবর্ণ বকিয়া উঠেন—আঃ মায়া, কি করিস্? লজ্জা করে না তোর?
মায়া বলে—সুরটা বেশ মা। সেদিন একটা গাড়োয়ান গাইছিল:—

দয়া মায়া নেই কি রে তোর
হ'লি রে পাষাণ!

যাই বল মা 'গজল'এর মত প্রাণ-মাতান সুর খুব কম আছে।

মায়া কোন দিনই বাদ্যযন্ত্রের পক্ষপাতী নয়। তাহার বিশ্বাস, সমস্ত যন্ত্রই হয় নিজ গুণে, নয় বাদকের গুণে বেসুরা বাজে। তাহার এই ধারণা বিকাশ বহু কষ্টে কিছু পরিমাণে সরাইয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু গানের সময় সে কোন যন্ত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন বোধ করে না। তাহার গলা কোন 'মজলিসে' যেমন তীব্র হইয়া উঠে, ছোট ঘরে তেম্‌নি শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া মানুষকে আকুল করিয়া তুলে। করুণা সময়ে অসময়ে বলেন—মায়া, একটা গা না মা—

হাসি, গান, কৌতুক, বিদ্রূপ, আলোচনা সমস্ত বিষয়ে মায়াকে চাই। আহারে বিশ্রামে মায়া না থাকিলে কাহারও মন উঠে না। মায়া সকলের, শুধু সে নিজের নয়। নিজের কথা ভাবিতে হইলে তাহাকে এমনি করিয়া চুরি করিয়া রাত্রের অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়।

এখন তাহার মুখে হাসি নাই, চোখে বিদ্যুৎ খেলে না, গালে লালিমা নাই! এই মায়াকে হয় ত কেহ চিনেও না।

সাম্‌নের জমাট অন্ধকারে শ্রান্ত দুটি চোখ মেলিয়া দীর্ঘ শ্বাসের শব্দের মতই সে বলিয়া উঠিল—সমস্ত দিন নিজেকে দিয়েছি, এখন আমাকে কে নেবে?—

কিছুক্ষণ পরে কঠিন হাসি হাসিয়া বিদ্রূপের সুরে আপনিই তাহার উত্তর দিল যম! এখন শুবি চল্, নইলে ভোর থেকে রসের জোগান্ দিবি কি ক'রে?

২৭

ভোর হইল। মায়ার নিত্য নবরসের জোগানও বন্ধ হইল না। এই ধনী পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা যে 'হাসির' অভাব ছিল, সে হাসিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! হাসি, হাসি, হাসি, কাহারও না-হাসিয়া উপায় নাই। হাসিতে হাসিতে এখন সকলে অভিযোগ করে—আর হাস্‌তে পারি না রে বাবা! পেটে ব্যথা ধরে গেল—' সমস্তদিনের আনন্দ উপভোগ করিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া সকলে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে। সবাই তৃপ্ত, সকলের মনে আনন্দের রেশ অম্লান হইয়া বিরাজ করিতেছে। বীরেন্দ্রনাথ কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন—'Life worth living'; করুণা নীরবে মায়ার মাথায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। সুবর্ণ তাঁহার গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া একদিন

চন্দ্রকুমারকে চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন—ওগো তোমার মেয়েকে একবার দেখে যাও। ঠিক যেন ছোটবেলাকার তুমি—' দীপ্তি বলে—দিদি পোড়ার মুখী, তুই মর্। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়।

কিন্তু একদিন আর কাটিল না! সেদিন গোধূলি লগ্নে যে অন্ধকার নিবিড় হইয়া মিত্র পরিবারের বুকে আশ্রয় লইল তাহা আর উঠিল না!

যে মায়াবিনী মায়া এতদিন মাকড়সার নিপুণতা এবং অধ্যবসায়ে এই পরিবারে চারি পাশে সুখের জাল বুনিতেছিল, সে শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল—সমস্ত বৃথা হইয়া গিয়াছে! কোথায় একটি গ্রন্থি, কোন্ অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে শিথিল হইয়াছিল, তাহার সমস্ত সাবধানতার দৃষ্টির অন্তরালে সে জানিতে পারে নাই, সহসা তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! এই সুখ-জালে যাহাদের যত নিবিড় ভাবে সে বাঁধিয়া ছিল তাহারা তেম্‌নি ভীষণ ভাবে বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া অশান্তির কঠিন শিলায়-আছাড়িয়া পড়িল!

বীরেন্দ্রনাথের চীৎকার শোনা গেল—Man—man! am I to believe my ears?—তুমি বিকাশ? তুমি বল্‌লে এ কথা?—

পিছনের দিকে দুই হাত বদ্ধ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বিকাশ ঘরের মাঝ খানে দাঁড়াইয়া ছিল, শান্ত আবেগহীন কণ্ঠে বলিল—আজ বল্‌বার সময় হয়েছে, তাই বল্‌লাম আপনাদের কাছে।

বীরেন্দ্রনাথ শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—এই কথা?—

বিকাশ। হাঁ।

সুবর্ণ বিকাশের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন—কি লজ্জা!

বিকাশ মুখ তুলিয়া করুণার দিকে তাকাইয়া বলিল—সব চেয়ে বড় সত্য বলে যা অনুভব করেছি, সত্য বলে যা বিশ্বাস করি, তাই বলেছি মা, আপনাদের অপমান করবার জন্মে নয়।

বীরেন্দ্রনাথ। নয়? এর চেয়ে জঘন্য অপমানের কথা আর হ'তে পারে?

বিকাশের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রাণ-পণে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল—কথা দিয়ে আপনাদের বোঝাবার শক্তি আমার নেই। দীপ্তিকে একবার ডেকে দিন, সে হয়ত বুঝ্‌তে পারবে আমার কথা—

বীরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—Shameless—retentless brute! You want to kill her!

ভক্ত-বিশ্বাসীর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায় উদ্ভাসিত মুখে বিকাশ বলিল—সে আমায় ভুল বুঝ্‌বে না, একবার তাকে ডেকে দিন।

বীরেন্দ্রনাথ। আমার সাম্‌নে, করুণার বুকের ওপর তাকে অপমান কর্‌বে!—তুমি মানুষ!

বিকাশ নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আশঙ্কা উদ্বেগে মাঝে মাঝে তাহার পা কাঁপিয়া যাইতেছিল।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ,তাই হোক। I won't be a tyrant father,—I love you, I love my children—বেয়ারা, ছোট দিদিমণিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

কথা কয়টি বলিয়া তিনি তাঁহার চেয়ারের মধ্যে এমন করিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন যেন বাহিরের এই একান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার হইতে আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চান্।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—সে যদি এটাতে লজ্জার কিছু না দেখ্‌তে পায়, তার খুসী মত কাজ সে করুক, আমি বাধা দেবো না করুণা।

বিকাশ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের বাহিরে যেন কাহার চুড়ির শব্দ শোনা গেল! কাহার পাত্‌লা চটি জুতার শব্দও ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে! ঘরে কে আসিল! বিকাশের চোখ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার হাত দুটি পিছনের দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গলাটিকে চাপিয়া ধরিল যেন তাহার নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছে!

বীরেন্দ্রনাথ কাহাকে বলিয়া উঠিলেন—না, ঐ খানেই দাঁড়াও—বিকাশের 'সাম্নে—আমাদের কাছ থেকে আরো সরে যাও।

বিকাশ মাথা তুলিয়া চাহিল।

দীপ্তি বিবর্ণ মুখে ভীতভাবে সকলকে দেখিয়া বিকাশের মুখের দিকে প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—বল বিকাশ, তোমার কি বল্‌বার আছে, শেষ কর—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ শাস্তি বেশীক্ষণ সহ্য হবে না আমার—'

বিকাশ দীপ্তিকে কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বা শব্দ বাহির হইল না। সে আবার মাথা নীচু করিল।

বীরেন্দ্রনাথ। পার্‌লে না?—you are ashamed?—আমি বল্‌ব সে কথা—I—a father?—বেশ, শোন দীপ্তি,বিকাশ বল্‌ছে—কোন সমাজের কোন পদ্ধতি বজায় রেখে ও বিয়ে কর্‌বে না। Registration ও বিশ্বাস করে না,

ওটাকে বিয়ের অপমান বলে মনে করে। ও শুধু তোমার হাত ধরে ওর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। আমার মত নেই। করুণার কি মত তা তুমি জিগ্‌গেস ক'রে নিতে পার। আমি তোমায় বাধা দিতে চাই না। খুসী হ'লে তুমি যেতে পার and live as X and Y living—living dead to the world. Have your choice, girl, you are free—'

এতগুলি কথা হাঁকাইতে হাঁফাইতে বলিয়া তিনি পিতৃত্বের অধিকার এবং অভিমানকে আপনার বক্ষে চাপিয়া পুনরায় তাঁহার চেয়ারে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন।

করুণা এতক্ষণ নিঃশব্দে বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। এখন ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখানি বীরেন্দ্রনাথের হাতের উপর রাখিলেন। বীরেন্দ্রনাথ তাহা লইয়া অন্যমনস্কভাবে দুইহাতে এমন করিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন যেন তাহা একখণ্ড কাগজ কিম্বা কিছু।

প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে একদিন সুচারু এবং সন্ধ্যাতারা যেমন সকলের সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আজ বিকাশ এবং দীপ্তি ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

করুণা দেখিলেন—বিকাশের সর্ব্ব শরীরে সন্ধ্যাতারার অনু-পরমানু যে নিদ্রিত ছিল এত দিন, তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া সুচারুর তেজস্বীতা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে!

বিকাশ ধীরে ধারে মাথা তুলিয়া দীপ্তির চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—বাবা-মার আশীর্ব্বাদের চেয়ে বিবাহের আর কোন বড় বন্ধন আমি মনে ঠাঁই দিই না। যা বিশ্বাস করি না, লোকের মন রাখ্‌বার জন্যে তাকে এতখানি পবিত্রতার মাঝখানে এনে ফেল্‌তে পার্‌ব না। আমার মা-বাবা তা পারেন নি। এস দীপ্তি—

কিন্তু ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সন্ধ্যাতারা যেমন করিয়া সুচারুর দিকে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছিল আজ দীপ্তি তেমনি করিয়া বিকাশকে ধরিতে পারিল না। সে মুখখানিকে এমন সঙ্কুচিত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যেন লজ্জায় সে মরিয়া যাইতেছে। মাথাটিকে বুকের কাছে ঝুলাইয়া টলিতে টলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সেই সঙ্গে বিকাশের প্রাণও যেন তাহার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র, করুণা, সুবর্ণ আপন আপন আসনে বসিয়া আছেন এবং বিকাশ

ও তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পা দুটি যে তাহার শরীরের ভার আর বহিতে পারিতেছে না, তাহা তাহার মনে নাই!

পিছন হইতে আসিয়া বিকাশের দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মায়া ড়াকিল—বিকাশ—'

প্রথম ডাকে কোন সাড়া না পাইয়া তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া পুনরায় ডাকিল—বিকাশ—'

বিকাশের ঘোর কাটিয়া গেল। নিমজ্জিত মানুষ যেমন করিয়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথম নিশ্বাস ফেলে, তেমনি করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যাকুল ভাবে মায়ার চোখের দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি, চেতনার তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিতেছে!

মায়া সুবর্ণের তীব্র ক্রোধের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বিকাশের একটী হাত একহাতে জড়াইয়া অপর হাতখানি তাহার হাতের উপর বুলাইতে বুলাইতে বলিল—বিকাশ তোমার এখান থেকে যাবার সময় হয়েছে—যাও।

বিকাশ মায়ার কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল—যাবার সময় হয়েছে?

মায়া। হাঁ বিকাশ। যে দুঃখ তোমার বুকে আজ বাসা বাঁধ্‌ল, তাকে অভিশাপ মনে ক'র না বিকাশ।

বিকাশ ম্লান হাসিয়া বলিল—না।

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় বীরেন্দ্রও করুণার দিকে তাকাইয়া বিকাশ কি বলিতে যাইতেছিল, মায়া তাহার মুখ চাপিয়া মাথা অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিয়া বলিল—চরম বোঝা-পড়া হ'য়ে গেছে বিকাশ, করুণামাসী তোমার আর মা নয়, আমার মা তোমার সোনামাসী নয়। মেসোমশাইকে তুমি অপমান করেছ।

বিকাশ দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল—তবু—

মায়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—না—না—না। কোন 'তবু' নেই, এর মধ্যে থাকতে পারে না। আমি এখনও তোমার পাশে আছি, যে মুহূর্ত্তে তুমি অপরাধীর মত এঁদের কাছে এসে দাঁড়াবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমায় ছাড়্‌ব।

বিকাশ নত হইয়া মায়াকে প্রণাম করিয়া বলিল—এই শেষ। আশ্রয়টুকু আমার থাক্‌, আর কিছু চাই না, আমি বাঁচ্‌ব—পার্‌ব সইতে।

বিকাশের মাথার চুলের ভিতর হইতে আঙ্গুল তুলিয়া লইয়া মায়া বলিল—যাও।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে যতক্ষণ বিকাশকে দেখা গেল ততক্ষণ মায়া স্থির চোখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

আর হাসিল না, গাহিল না, কৌতুকের একটি কথাও কাহাকেও বলিল না।

সে রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আহারে বসিবার সময় সকলের মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশের বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার আহারে রুচি চলিয়া গেল। কোন মতে কয়েক মিনিটকাল ডিসে রক্ষিত দ্রব্যগুলি নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিল। এবং অল্পক্ষণ পরে একটী ছোট রেকাবিতে করিয়া ভাজা মশলা লইয়া মায়া আসিয়া বলিল—মশ্‌লা না খেয়ে চলে এলে যে ?

সে নিজেও কিছু তুলিয়া মুখে দিল।

শ্রীশ মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—হ'ল না, না ?

মায়া। না। তোমাদের 'Principle' আর 'Honour' মায়ার সমস্ত মায়াকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ীর হাসিও চির বিদায় নিল শ্রীশদা।—ভাল কথা তোমাকে একটা কাজ কর্‌তে হবে, আমাদের কর্পূরীটোলার বাড়ীটা সারান শেষ হয়েছে কি ?

শ্রীশ। হয়েছে—কেন ?

মায়া। কাল ভোরেই আমি সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে চাই। এখানে আমার পড়াশোনার ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে শ্রীশদা।

শ্রীশ আরক্ত চোখে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—তুই যাবি মায়া ?—

মায়া। আর উপায় কি ? পরীক্ষার আর ক'দিনই বা বাকি আছে !

শ্রীশ। কিন্তু একা থাক্‌বি কি ক'রে ?

মায়া। এই কটাদিন কোন মতে কাটাতেই হবে। বাবা সম্ভবত সাতাশে তারিখের আগে আস্‌তে পার্‌বেন না, লিখেছেন। এই কদিনের জন্যে কমলাকে আমার কাছে রেখে দেবো ভাব্‌ছি। সুবিধে হ'লে তুমি রাতে গিয়ে ওখানে থেকো।

শ্রীশ। বেশ যা। আর কতদিন তোকে ভাঙ্গিয়ে খাব বল্?

কথা কয়টি বলিয়া শ্রীশ হাসিয়া উঠিল। সে হাসি এত শুষ্ক যে মায়াও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে সরিয়া আসিয়া শ্রীশের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—তুমি যাবে ত ?

শ্রীশ। নিশ্চয়। নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলেই ছুটব তোর কাছে।

মায়া। আমি আরো যাচ্ছি শ্রীশদা, এখানে থাক্‌লে বিকাশকে দেখ্‌তে পাব না।' আমি ছাড়া তার আর কে আছে বল?

মায়ার চোখ হইতে জল গড়াইয়া তাহার গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

শ্রীশ মায়ার হাতখানি আপনার উত্তপ্ত কপালে একবার চাপিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যা, একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর্ গে। আমিও শুয়ে পড়ি, আর পার্‌ছি না—'

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইল দীপ্তি! সকালে চা খাইবার পর সে করুণার আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া আপনার আঁচলে বাঁধিল। ভাঁড়ার ঘরে আসিয়া বাবুর্চ্চিকে রন্ধনের সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া নূতন গৃহিনীর মত ভারি ভারি পা ফেলিয়া চাবি ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে উপরে কি করিতে আসিয়া দেখিল মায়া তাহার জিনিস-পত্র বাছিয়া লইতেছে। ঘরের মেঝেয় দুইটি ট্রাঙ্ক খোলা রহিয়াছে। সে কোন কথা না বলিয়া সেই খানে বসিয়া একটি ট্রাঙ্কে মায়ার সমস্ত বই খাতা ভর্ত্তি করিল। অন্যটিতে মায়ার কাপড়-জামা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজাইয়া দিল।

কমলা এবং তাহার সমস্ত জিনিস পত্র লইয়া শ্রীশ আসিলে চাকরদের ডাকিয়া দীপ্তি মায়ার দ্রব্যগুলি একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বোঝাই করিবার আদেশ দিল—' তাহার পর মায়ার মুখচুম্বন করিয়া দীপ্তি হাসিয়া বলিল—যদি এর পরও ফেল হ'য়ে মরিস্ তোর মুখ দেখ্‌ব না।

মায়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুবর্ণ কঠিন স্বরে বলিলেন—এর মানে?

মায়া। ও বাড়ীতে যাচ্ছি মা।

সুবর্ণ। উনি আসা পর্য্যন্ত সবুর সইল না?

মায়া। সবুর কর্‌লে ফেল হ'য়ে মর্‌ব। এখানে আমার অসুবিধে হচ্ছে মা পড়া-শোনার।

সুবর্ণ। কিন্তু আমি এখন এখান থেকে যেতে পার্‌ব না—কি ক'রে থাক্‌বি?

মায়া। কমলা রইল আমার সঙ্গে। রাতে শ্রীশদা থাক্‌বে।

সুবর্ণ। খাবি কি? হাওয়া?

মায়া। শ্রীশদার কার্‌খানার একজন লোক সব বাজার হাট কর্‌তে গেছে। রাঁধ্‌বার লোক যত দিন না পাই, কমলাই কর্‌বে সব।

সুবর্ণ। টাকার দরকার আছে, না না ?

মায়া! নেই আবার ?—দাও না মা কিছু।

সুবর্ণ। আমার কাছে এখন কিছুই নেই।

মায়া। তাহ'লে শ্রীশদাই উপস্থিত আমার Banker হ'ল। শ্রীশদা, Payable, when 'able', কেমন ?

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

সুবর্ণকে চুম্বন করিয়া করুণার মুখের নিকট মুখ বাড়াইয়া দিতেই তিনি মায়ার মাথাটি আপনার বুকে চাপিয়া ধরিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

বীরেন্দ্রনাথের ঘরে আসিয়া মায়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহার খাতাপত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাগিয়া বলিলেন—কোথায় যে রাখে সব কিছু ঠিক পাওয়া যায় না! আমার pencil টা ?—

মায়ার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, প্রাণপণে হাসিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিয়া ব'লল—ঐ ত তোমার হাতে মেসোমশাই।—আমি যাচ্ছি।

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যেন কিছুই শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে শেলফ্ হইতে কি বই আনিতে ছুটিলেন।

মায়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে যদি ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে দেখিত, বীরেন্দ্রনাথ একটি চেয়ারে বসিয়া হাত দুটিকে মুচ্ড়াইয়া যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার চোখ হইতে অজস্র ধারে জল ঝড়িতেছে।

* * *

বিকাশ এবং মায়া মিত্র পরিবার হইতে বিদায় লইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই মিসেস্ ডি—' সম্প্রদায় ভুক্ত জীবগুলির মধ্যে আর এক নূতন চাঞ্চল্যের আভাস দেখা গেল। তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেক সহৃদয়া আপনা হইতে ঘন-ঘন করুণার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। পাশে যে ছোট বাক্সটিতে Dr. and Mrs. 'Mitra Not at home' লেখা ছিল তাহা কাহারও চোখে পড়িল না। এবং দেখা করিয়া ফিরিয়া গিয়া সমাজের সুনাম রক্ষায় অধীর আগ্রহে বলিতে লাগিলেন—দিনে দিনে সব হ'ল কি ? আরো কত দেখ্তে হবে কে জানে! ওমা কি ঘেন্নার কথা। মায়াটা ওদের বাড়ীতে একা আছে, আর যে ছোঁড়াটাকে ডাক্তার মিত্তির জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই ছোঁড়াটা সেখানে রোজ যায়! সোনার সঙ্গে মায়ার ত মুখ দেখা-দেখি নেই।

এই আলোচনা শুধু মিসেস্ ডি—'সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না। সাধারণেও শুনিল এবং আপন আপন মতামতও প্রকাশ করিল।

একদিন খাইবার সময় কমলা মায়াকে বলিল—শুনেছিস্?

মায়া। কি?

কমলা। লোকের কথা?

মায়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—Gossip rats! লোক?—মানুষ ওরা? ওরা যদি মানুষ হ'ত, বাড়ীতে গিয়ে ওদের ঝেঁটিয়ে আস্তাম।

কমলা কোন উত্তর দিল না।

মায়া বলিল—ঐ মা-হারা ছেলেটার আমি মা। তারামাসী ওকে অসহায় ফেলে গেছে, কিন্তু ও অসহায় নয়। আমি আছি এখনও বেঁচে। যে মা কলঙ্কের ভয় করে, সে মা নয়। লাগুক কত কলঙ্ক লাগ্‌বে আমার গায়ে, ওরা আমাকে একেবারে কালো ক'রে দিক। আমার এতটুকু দুঃখ নেই কমলা। আগে বিকাশকে বাঁচিয়ে তুলি, ও বেঁচে উঠুক—ও নিজের হাতে আমার গায়ের কলঙ্ক মুছে দেবে। যদি না বাঁচে, মায়ের কলঙ্ক বুকে নিয়ে আনন্দ ক'রে আমিও মর্‌ব।—আমার কাছে থাক্‌তে তোর সঙ্কোচ হয়?—

মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা বলিল—তুই জানিস আমাকে তবু বল্‌বি ঐ সব—'

সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মায়া হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—আর বল্‌ব না, আমার ওপর অভিমান করিস্‌নি কম্‌লি—'

ক্রমশঃ

শ্রী—

তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে যতদূর পর্য্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূর পর্য্যন্তই ভাল—তার চেয়ে বেশী টানাটানি করতে গেলেই—মিলন হবে বাঁধন।

"ঘরে বাইরে"



আলোচনা

আজকাল বাংলাদেশে মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রের বহুল প্রচার হইয়াছে। এই সকল পত্রের কোনও কোনও অফিস দিনে দিনে প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ পত্রিকার গাত্রে যে সকল সম্পাদকের নাম উল্লেখ থাকে, পত্রিকার অফিসে গেলে এইরূপ অনেক সম্পাদকেরই দর্শন ঘটে না। তাঁহারা যে কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে বসিয়া এই সকল পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহাও জানিবার উপায় নাই। শুনা যায় কোন কোন পত্রিকা মাসিক বৃত্তি দান করিয়া এইরূপ দুই একজন সাধারণের নিকট বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষকে সেই পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রচার করিবার অধিকার লাভ করেন।

লেখক বা সংবাদ-দাতাগণ এই পত্রিকার আপিসে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়াই যান। প্রায় সকল পত্রিকার গায়েই ছাপান থাকে, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি ফেরত পাইতে হইলে বা পত্রাদির উত্তর চাহিলে, লেখককে ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে। নচেৎ প্রবন্ধাদি ফেরত বা পত্রাদির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই নিয়মানুসারে প্রবন্ধের বা লেখার সহিত অনেক লেখকই ডাকটিকিট পাঠাইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া এই ডাকটিকিট পাঠান হয়—রচনা যদি মনোনীত হয় সে সংবাদ জানিবার জন্য অথবা অমনোনীত হ'লে রচনা লেখকের কাছে ফেরত পাঠাইবার জন্য। এমন অনেক পত্রিকার কার্য্যালয় আছে যেখানে লেখকদের এইরূপ অনুরোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা

হয়। টিকিট পাঠান সত্ত্বেও লেখক বা পত্রপ্রেরক পত্রিকা আপিস হইতে কোনও সংবাদ পান না। সুতরাং ব্যস্ত হইয়া তিনি বারম্বার পত্রিকার কার্য্যালয়ে, কার্য্যাধ্যক্ষ বা সম্পাদকের কাছে সংবাদ জানিবার আশায় পত্র লিখিতে থাকেন। পত্রিকার আপিস যথাপূর্ব্বং তথা পরং! একেবারে নির্ব্বিকার, জ্ঞানশূন্য। কাজেই অনেক লেখক ছুটিয়া সম্পাদকের সাক্ষাৎ লাভ করিতে যান। সেখানে যাইয়াও তাঁহার দুর্দ্দশা! সম্পাদক হয়ত উপস্থিত থাকেন না। আপিষের কেহ হয়ত লেখককে আপাততঃ ফিরাইয়া দিবার জন্য, অন্যদিন আসিতে বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। এমন লেখকও আছেন, যাঁহারা এই সকল পত্রিকা আপিষের অবিবেচনা ও প্রবঞ্চনার কথা জানেন না, তাঁহারা উক্ত অনুরোধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ আপিসে যাতায়াত করিতে থাকেন। কিছুই ফল হয় না। যদি কোনও আপিস দয়া করিয়া শেষ কথা বলেন, যে রচনাটি হারাইয়া গিয়াছে, লেখক তাহা হইলেও যথেষ্ট স্বস্তি লাভ করেন।

এই সকল পত্রিকার মধ্যে কয়েকটি, বাংলাদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পত্রিকা একবার 'চলিয়া' গিয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা লেখকদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। অথচ এই সকল লেখকেরই কাহারও কাহারও রচনা দ্বারা কাগজ ভরিয়া তাঁহারা সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করেন।

এরূপ পত্রিকার কার্য্যালয়গুলি খোসামোদকারী ও আড্ডাধারী জনবর্গে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকে। তোশামোদ শুনিতে শুনিতে সম্পাদক অহঙ্কারে অন্ধ ও বধির হইয়া পড়েন, কার্য্যাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীগণ লেখকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তার স্থান অধিকার করেন। সাহিত্যের নামে এরূপ ধৃষ্টতা, অনিয়ম, প্রবঞ্চনা ও বাচালতা একান্ত অমার্জ্জনীয়। কেন যে এই আপিসগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতর আসিতে পারে না তাহার উত্তর কি কেহ দিতে পারে না? পত্রিকা আপিসের কার্য্যপদ্ধতি কিছুদিন লক্ষ্য করিলেই এরূপ যথেচ্ছাচারের কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়।

অধিকাংশ পত্রিকায় সম্পাদকের মাথার উপরে ধনী ও নির্ব্বুদ্ধি পরিচালক থাকেন। পত্র-সম্পাদন ও টাকা আনা পাইয়ের হিসাব যে একই জিনিস নহে তাহা তাঁহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না। সম্পাদক নবীন যুবক হইলে হয়ত প্রথম প্রথম দুই একবার পরিচালকের সহিত কার্য্য পদ্ধতি ও কাগজের সম্পাদন কার্য্য লইয়া বিবাদ করেন। ফলে তাঁহাকে আপিস

হইতে আপিসে কাজ যোগাড় করিয়া বেড়াইতে হয়। শেষে অনন্যোপায় হইয়া অনেক অন্যায় সহ্য করিতে আরম্ভ করেন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে দিতে তাঁহারও মন ও ধারণা ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ ও কলুষিত হইয়া পড়ে। তখন নিতান্ত পরিচালকের মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি কাজ চালাইতে আরম্ভ করেন। বাহিরের সমস্ত মনুষ্যত্বের আহ্বানকে বারে বারে উপেক্ষা করেন। হতভাগ্য এই সম্পাদক-জাতি সরকারের আপিসের কেরানীর চাইতে কোনও অংশে সুখী নহে। এক একস্থলে এমন কথাও শুনা যায়, একজন হয়ত জমিদারী আপিসের নায়েব বা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট ছিলেন, তিনিও কালক্রমে হয়ত কোনও কারণে কোনও পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসেন। পত্রিকা সম্পাদন কার্য্যে তাঁহাদের কোনও যোগ্যতা দেখিতে পাইলে হয়ত কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু এই সকল সম্পাদকেরা সম্পাদন কার্য্যে একেবারে অনভিজ্ঞ। নিজেরা কিছুই ত জানেন না, অন্যের রচনা লইয়া তাঁহারা অনায়াসে নিজ নামে চালান। প্রমাণ দিতে হইলে হয়ত ইহার কোন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণে এ সকল কথা অনেকেই জানেন। সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন হইলে হয়ত কেহই তাহাতে সম্মত হইবেন না।

দ্বিতীয়ত কার্য্যালয়ে এমন কোনও কর্ম্মচারী থাকেন না, যিনি একমাত্র লেখকের পত্রাদি বা রচনার উত্তরাদির ভার লইয়া থাকেন। প্রুফ সংশোধন ইংরাজী লেখার নকল ও অনুবাদ করা প্রভৃতি কার্য্যেই সকলেরই ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কাজেই চিঠি পত্র, প্রবন্ধ- রচনাগুলি অধিকাংশস্থলে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের বস্তুর মত পড়িয়া থাকে। তাহা ভিন্ন সম্পাদকের স্তুতিবাদক গোষ্ঠির লেখাই এত বেশি স্থান অধিকার করে যে অজ্ঞাত লেখকের ভাল রচনা হইলেও কাগজে তাহার স্থান লাভ ঘটে না। দুই একটি কাগজের আপিস এ বিষয়ে খুব মনোযোগ দেন। তাঁহারা লেখককে রচনা ছাপা হইবে কি না হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন্ না। পত্রাদি বা প্রবন্ধের সঙ্গে টিকিট না থাকিলে অবশ্য অভিযোগ করিবার বিশেষ কারণ থাকে না। অনেক পত্রিকার আপিসের লোকেরা বলেন, যে, প্রত্যহ যত রচনা আপিসে আসে তাহার যথাবিধি ব্যবহার করিতে হইলে, সেই কার্য্যের জন্য একটি লোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হয়। মনে হয়, তাহা না করিবার কোনও কারণ নাই। যাঁহাদের পত্রিকার আয় যথেষ্ট তাঁহারাতো অনায়াসে চিঠি পত্রের জন্য আলাদা একজন কর্ম্মচারী রাখিতে পারেন। আর যাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই, তাঁহারা নিজেরা, যতখানি সময় গল্প ও বাজে কথায় নষ্ট করেন, ততখানি সময় এই কার্য্যে ব্যয় করিলে, অনায়াসে এই অভিযোগের প্রতিকার হইতে পারে।

সংগ্রহ

অতি অল্পব্যয়ে অথবা বিনাব্যয়ে, উপোষ করে, পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ীর বালিকাদের যে সকল ব্রত নিয়ম উদ্‌যাপন করতে দেখেছি, তাতে আমার কেবলই এই কথা মনে হয়েছে, এদের জীবনেও খেলাধূলা স্ফূর্ত্তি নির্দ্দোষ আমোদের কত আবশ্যক আছে, কত অল্পে এদের প্রাণের সরসতা সঞ্জীবিত রাখা যায়, কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততটুকু আনন্দও এদের ভাগ্যে বেশীদিন জুটে উঠে না।

* * *

অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে না পারলে তাদের শিক্ষা সকল হবে না, বরঞ্চ "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেহেতু কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতী হবার নব নব রোমাণ্টিক্ উপায় খুঁজে বের করবে। নাটক নভেলও আবার বেছে বেছে পড়া হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল সেগুলিই পড়া হয়, দু'চারটি যুক্তি বা তত্ত্বকথা বা সুচিন্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, তবে সেগুলি নাকি সযত্নে বাদ দেওয়া হয়।

* * *

—উচ্চশিক্ষার পথ তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক, দাক্ষিণাত্যের ন্যায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ প্রথা শিথিল করে দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে দেওয়া হোক, যৌবন বিবাহের দরুণ যদি 'লাভ-ম্যাচ্' ও অসবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে বরণ করে নেওয়া হোক—মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হেতু গান্ধর্ব্ব বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যকমত তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক * * * এমন কি আবশ্যক স্থলে বিবাহ বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হোক।

এমন সুগৃহিনী * * * নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে আমাদের পুরুষদের মানুষ করে তুলবার সাহায্য করতে পারে। দেব বা দেবী কেবল পুঁথি পত্রের সাহায্যে তৈরী হয় না, সেটা যার যার ভগবদ্দত্ত প্রকৃতি অনুসারে হয়ে থাকে।

—স্ত্রী-শিক্ষা

প্রবাসী, ১৩৩০, ফাল্গুন সংখ্যা।

যৌবনে দুই কারণে ভালবাসা জন্মে, একটি রূপ গুণের প্রত্যক্ষ্য জন্য, অপরটি স্বভাব জন্য। * * * যৌবনে দেহ, মন, বুদ্ধি সমস্তই পরিপুষ্ট হয়; কি রূপ গুণের প্রত্যক্ষ জন্য ভালবাসা, কি স্বভাব জন্য ভালবাসা এই উভয় ভালবাসাই যৌবনে উৎপন্ন হয়। * * * রূপের বা গুণের শেষ নাই। একের রূপ বা গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; সাময়িক উত্তেজনা বশে তাহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; তাহা অপেক্ষা অধিক রূপ বা গুণ আসিয়া চক্ষের উপর পড়িয়া আমাকে যে মোহিত না করিবে, কে বলিতে পারে? * * * স্বভাব জন্য ভালবাসা সকলের উপরে, এ ভালবাসায় রূপ, গুণ কিছুরই অপেক্ষা করে না। সে ভালবাসা কবে কাহার উপর জন্মিবে, বলিতে পারে না। * * * স্বভাব জন্য ভালবাসারও মুখে রূপ-গুণ-জন্য ভালবাসা কোনও ক্রমেই টিকিতে পারে না—কোথায় ধ্বসিয়া যায়। যৌবন বিবাহের ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের এই সকল দোষ অপরিহার্য্য। * * * বাল্য বিবাহে এ সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। বাল্যকালের শিক্ষা, বাল্যকালের অভ্যাস সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কারই স্বভাবকে আনয়ন করে। * * * এই স্বভাব জন্য ভালবাসা কামজ ভালবাসা নয়। * * * বাল্য বিবাহে সভাবত দম্পতির হৃদয় কোমল; তাহাতে অন্য ভাব আসিয়া পড়ে নাই, পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গাছ পালারও শিকড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। * * * যৌবন বিবাহ কামজ। এ বিবাহে কেবল ভোগ স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, স্বার্থপরতা বাড়িয়া যায়।

—বাল্যবিবাহ ও যৌবন বিবাহের সমালোচনা।

ভারতবর্ষ, ১৩২০ ফাল্গুন সংখ্যা।

সমাচার।

বালিকা—বাঙ্গালী বালিকাদের জন্যে সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১নং রাজা বাগান ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার সিংহ। বার্ষিক মূল্য ১॥০; প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য বাংলা দেশে একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব ছিল। এই পত্রিকাখানি সেই অভাব পূর্ণ করিতেই প্রকাশিত করা হইতেছে। আশা করা যায় ইহার রচনাগুলি বালিকাদের পক্ষে মনোজ্ঞ ও সহজ হইবে।

সবিতা—মাসিক পত্র। ১৩৩০ পৌষ মাসে ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। সম্পাদক, শ্রীননীলাল দে, বি, এল, উকিল হাইকোর্ট। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ আনা; প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা। কার্য্যালয়, ৯।১ হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা। এম, এ, বি, এল; ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট; স্মৃতিরত্ন; পি, আর, এস্; ডি এল্; প্রভৃতি সুধীবর্গ নাকি সবিতার লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সারথী—সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। পরিচালক, শ্রীঅনিলবরণ রায়। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা; প্রতি সংখ্যা তিন পয়সা। "অরবিন্দের গীতা" ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্ভিন্ন সংবাদ ও সুরচিত অনেক প্রবন্ধাদি থাকে। কার্য্যালয়, সরস্বতী প্রেস, ২৬।১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

দীপালি—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ ১৩৩০। সম্পাদক, শ্রীপরেশ চন্দ্র দেব। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা। বার্ষিক সডাক ২॥০ টাকা। কার্য্যালয় ৪৫ নং ড্যালহৌসী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন। এই পত্রিকাখানি বেঙ্গল একাডেমী পুরাতন ছাত্র-সঙ্ঘ ও অন্যান্য সহসেবকদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। আশ্বিন মাস হইতে দীপালির বর্ষারম্ভ। সুললিত কবিতা, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গল্পাদিতে পত্রিকা খানি ভালই হইয়াছে।

পল্লিশ্রী—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বর্ষ চলিতেছে। সম্পাদক, শ্রীসুরেশ চন্দ্র গুহ। সমবায়, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ থাকে। ইহা ভিন্ন গল্প, কবিতা ও আলোচনা পল্লিশ্রীর প্রতি সংখ্যায়

প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।৴০ আনা। প্রতি সংখ্যা ।৴০ আনা। ঠিকানা—পল্লিশ্রী কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

তরুণ—মাসিক পত্র। সম্পাদক, শ্রীসুকুমার দত্ত ও শ্রীহীরালাল দাস গুপ্ত। বরিশাল হইতে প্রকাশিত। প্রথম বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। আমাদের দেশের তরুণ, প্রবন্ধ, পত্র, গল্প ও কবিতায় "জীবনের মেঘে বহুবর্ণ ভঙ্গিমায় বিচিত্র; অথচ স্বপ্রকাশ" হইয়া উঠুক্।

আলোক—সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক-শ্রীমহিম চন্দ্র দাস। বার্ষিক মূল্য ২।০; সংখ্যা এক আনা। ১৩৩০ পৌষ হইতে প্রথম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত মনস্বী যুবক নলিনী কান্ত সেনের মাসিক পত্রিকা "আলো"র স্মৃতির অনুসরণ করিয়া এই পত্রিকা খানির নামকরণ হইয়াছে।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত গল্প পুস্তক। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য-১॥০ আনা।

মহর্ষি মন্‌সুর—শ্রীমোজাম্মেল হক্ প্রণীত মহর্ষি মন্‌সুরের জীবনী-গ্রন্থ। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

স্বাস্থ্য-সমাচার—স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক-শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু, এম, বি। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ফেরদৌসী চরিত—মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রেকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত। মৌলভী মোজাম্মেল হক্ প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। পারস্য মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী তুসীর জীবন বৃত্তান্ত।

স্নেহলতা—শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প পুস্তক। মূল্য ॥৴০ আনা মাত্র। পণপ্রথা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

মাধবী—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।৴০; প্রতি সংখ্যা ।৴০ আনা। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত।

মানুষ ব্যগ্র-আগ্রহে বলে,—সে কি তুমি, সে কি তুমি?

আবার বাহিরে ডাকে শত কোলাহল, আকাশের কণ্ঠলগ্ন মেঘমালা বিদ্যুতের বক্র-বহ্নি ওষ্ঠে ফুটাইয়া উপহাস করে, সাগরের তন্দ্র-তটে যাত্রীর জনতা ছলকিয়া উঠিয়া ডাকে—আয় আয়; লক্ষ্যহারা মরুর বাতাস হা-হা করিয়া ছুটিয়া চলে, মানুষ ছুটিতে চাহে তাহারই পিছু পিছু; ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, মন তাহার কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে,—তখন তাহার চোখের উপর লাগিয়া থাকে তাহারই হারাণ-হারা নিঃশব্দ বিস্ময়-ভরা স্বপ্ন-চোখে চাওয়া।

চীন-যাত্রার পূর্ব্বে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-অর্ঘ্য' শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর গল্প, 'দ্বাদশী' উপন্যাসের প্রথম অংশ কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যার বিশেষত্ব হইবে।



খণ্ডগিরি—উড়িষ্যার যেখানে যে মন্দির স্থাপিত হইয়াছে খণ্ডগিরি তাহার প্রাচীন রচনায় আপন প্রস্তর দান করিয়াছে এবং আপন বক্ষ-কোটরে এককালে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-তাপসদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ; * * এক দিকে ধবলগিরি অনতিদূর জনস্থানের শিরোদেশে অশোকের অনুশাসন হৃদয়ে ধরিয়া দাঁড়াইয়া * * অন্যদিকে নিবিড় অরণ্যানীর পশ্চাতে নীলাদ্রিশ্রেণীর উন্নত প্রাচীর * * ।

খণ্ডগিরি গুহায় গুহায় পরিপূর্ণ। মানবের বুদ্ধি পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডকে আপন বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে—তলার উপর তলা, ঘরের পর ঘর, বারান্দায় বিচিত্র আকারের গিরিকর্ত্তিত স্তম্ভ এবং স্তম্ভের শিরোদেশে ব্র্যাকেটাকারে উন্নত-বক্ষ নারীদেহ পাষাণ-ছাদভার বহন করিতেছে। দেয়ালেও মধ্যে মধ্যে নানা মূর্ত্তি খোদিত * * নরনারী-সৈনিক প্রহরী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রমোদ বিলাস, হয়ত কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ উপাখ্যানের অবশেষ * *

* * *

খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্ম্মযুগের সমাধি। এখন কিছুই নাই, শুধু শূন্য গুম্ফাবলী, কোনটি ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানের অনুরূপ, কোনটি বা হস্তীর স্থূলদেহের আকারসদৃশ, কোথাও দেবসভা, পাহাড়ের পাষাণ-দেয়ালে খোদিত কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং তাহারই সন্নিহিত সর্ব্বোচ্চশিখরে * * জৈন মন্দির। জৈনদেবতা সেই বিজন গিরিশিখরে বসিয়া আপন মহিমায় বিলীন হইয়া আছেন।

—খণ্ডগিরি

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রৌদ্র-দগ্ধের গান

—নজরুল ইস্‌লাম

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক টুটুক খ'সে,
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥
মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কমল-দীপ,
ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুম্-শাখে মোর স্বপন মণি নীপ।
নিখিল-গহন-তিমির-তমালগাছে
কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে কালোতে নিত্য মরণ যাচে—
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥
দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি
সেথায় আঁধার-বাসর ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
ম্লান ক'রে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো নিশীথ-নিতল অসিত আমার শীতল কালোই ভালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

মনের দেখা

—শ্রীসুনীতি দেবী।

সে আমার অনেক কালের প্রতিবেশিনী, তবু তাকে ভাল করে চিন্‌তাম না। কোন্ গোপন অন্তঃপুরে যে সে থাকৃত জানি না,—তার দেখা পাওয়া এক দুর্ঘট ব্যাপার। কোন দিন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হয়ত হেসে চলে যেত, কোনদিন বা তার সাড়ির আঁচলের কোণটুকু শুধু দেখ্‌তে পেতাম। তার সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল থাকৃলেও, তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুল্‌বার অবকাশ সে দেয় নি।

এমন যে সে,—তাকে যখন সেদিন অত ঝড়ের মধ্যে নদী-তীরে দেখ্‌লাম, অবাক হ'য়ে গেলাম! আমি গিয়েছিলাম জল আন্‌তে। তাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম। অনেক লোক নিয়ে, অসংখ্য আলো জ্বালিয়ে কেন যে সে নদীকূলে রাণীর সাজে বসেছিল বুঝ্‌লাম না।

তার মুখের ঘোমটা খসে গিয়েছিল। এতদিনে তার মুখখানা স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম। সন্দেহ হচ্ছিল, এ কি সেই চির-লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকা, না আর কেউ? আমার সন্দেহ ভেঙ্গে দিয়ে সে ডেকে বল্‌ল—আমায় চেন না? তোমার কাছেই ত আমার বাস।

—চিনি বই কি!—বল্‌লাম বটে, তবে কতটুকু যে চিন্‌তাম তা অন্তর্যামীই জানেন।

সে আমায় ডেকে পাশে বসিয়ে বল্‌ল,—কতদিন থেকে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌ব ভেবেছি, কিন্তু হয় নি। তুমি সংসার, সমাজ, গৃহকর্ম্ম, এম্‌নি কত কি নিয়ে যে ব্যস্ত,—আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বল্‌বার অবসর তোমার ঘটে না।

আমি মনে মনে বল্‌লাম—তা'ত বটেই। আর তুমি যে কোথায় লুকিয়ে থাক, দেখা পেলে ত আলাপ কর্‌ব?—মুখে বল্‌লাম—এমন ঝড়ে যে তুমি বাইরে বেরিয়েছ বড়? সে বল্‌ল—ঝড় উঠেছে বলেই ত বেরুতে পার্‌লাম,

তু না হ'লে তোমার সঙ্গেও দেখা হ'ত না। তারপর মৃদু হেসে গান ধর্‌ল,—

'তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।'

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তার মানে? সে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমার গলা জড়িয়ে বল্‌ল—বল তুমি আজ থেকে আমার সই? তা হ'লে তোমায় সব বল্‌ব।

আমি তার হাতখানা ধরে সই পাতিয়ে নিলাম।

সে বল্‌ল—আমায় সে পথে ভাসাবে বলে আজ প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। পথের সাথী দেখা দিয়ে কোথায় লুকিয়েছে জানি না। তবু তারই আশায় আছি।—জানি সে আস্‌বে।

আমি হেসে বল্‌লাম—পথে ভাস্‌তে এসেছ এত আড়ম্বর ক'রে, এত লোক জন নিয়ে?—

সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ভয়-চকিত স্বরে বল্‌ল—চুপ চুপ। ওরা শুনতে পাবে। আমি যে এদের বন্দিনী। এরা সব আমার ওপর চোখ রেখে বসে আছে। তাই আমিও রাণী সেজেছি। আমার অন্তরের কাঙ্গালিনী আমার প্রিয়ের উদ্দেশে পথে পথে ঘুরছে। সে এলেই আমি সব ফেলে নদীর জলে ঝাঁপ দেব।

আমি বল্‌লাম—এই ঝড়ে যে তোমায় পথে বার ক'রে সরে পড়েছে সে ত সুবিধার লোক নয়। যদি সে আর না আসে?—

সে বল্‌ল—ঐ ত তোমাদের ভুল। ঘরের সীমায় আট্‌কা থেকে থেকে এমন হয়েছ যে পথেও তোমরা আশ্রয় খোঁজ। পথ যে অসীমের সন্ধানে গেছে, সেখানে ত বাসা বাঁধ্‌তে আসি নি ভাই। আর সাথী যদি সঙ্গে না এসে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যায়, তাতেই বা কি? তাকে ধর্‌বার জন্যেও ত আমায় এগিয়ে যেতে হবে। বসে থাকার দিন আমার ফুরিয়েছে। সে আমার কত বড় উপকার করেছে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? সে যে আমায় চল্‌তে শিখিয়ে গেল।

আমি বল্‌লাম,—তার আস্‌তে দেরি হ'লে, কি নিয়ে তোমার দিন কাট্‌বে? কতদিন আর নিজেকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে?

সে বল্‌ল—আছে গো আছে, আমার অনেক পাথেয় আছে। তাই নিয়েই দিন কাট্‌বে।

তার কণ্ঠ স্বর মৃদু হ'য়ে এল,—সে বল্‌তে লাগ্‌ল।—সেদিন এম্‌নি সন্ধ্যার

আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। সন্ধ্যাতারাটি দেখিয়ে আমি বল্‌লাম—কি সুন্দর তারাটি দেখেছ? সে আমার চোখে চোখ রেখে বল্‌ল—দেখেছি। আমি বল্‌লাম,—কই বল ত? সে বল্‌ল,—তোমার কপালে ঐ যে উজ্জ্বল টিপ্‌টি।

সত্যমিথ্যা ভাব্‌বার অবকাশ হ'ল না। বুকের মধ্যে ঐ কথাটুকু সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌লাম। ধীরে ধীরে তার কাঁধে মাথাটী রেখে উদ্বেলিত প্রাণটাকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

তারপর তার হাতে হাত রেখে গানের পর গান গেয়ে গেলাম। বুঝি বা গান দিয়ে নিজেকে প্রকাশ কর্‌তে চেয়েছিলাম। সে বুঝ্‌ল কি না জানি না। সে শুধু খেলার ছলেই আমার চোখে চোখে চেয়ে পাগল কর্‌ছিল কিনা তাও জানি না। আমি গেয়েই গেলাম। সে শুন্‌ল, কিন্তু কিছু বল্‌ল না। আমাদের মাথার ওপর নীরব আকাশে অন্তহীন তারার দল নদীর অচপল বুকে মুখ দেখ্‌ছিল। তার স্পর্শটুকুর স্মৃতি আমার মনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হ'য়ে রইল।

শুধু সন্ধ্যার অন্ধকারেই কি তাকে পেয়েছি? তপ্ত-দিনের আলোতেও সে আমার কাছে ছিল। কেমন ক'রে যেন দুজনে মাঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে গাছের পাতার আড়ালে ঘুঘু করুণস্বরে ডাক্‌ছিল, আমার ইচ্ছা কর্‌ছিল গাছের তলায় একটু বসি। বসা হ'ল না। তবু একসঙ্গে ধূলার মধ্যে পথ চলার সুখ সে কি ভুল্‌বার?

আবার মনে পড়্‌ছে পাখীর গানে মুখরিত সেই উষা। মিলন রাত্রি কেটে গেল, দুজনে দূরেই র'য়ে গেলাম, তার বুকে মাথা রাখা হ'ল না। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিদায় বাণী প্রাণটাকে আকুল ক'রে তুল্‌ল, চোখের জল পাতার ওপর এসে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তাদের ঝর্‌তে দিলাম না। বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিয়ে সে আমার চুলের ওপর মুখখানা রেখে আদর ক'রে চলে গেল। কিছু বলা হ'ল না, কিছু শোনা হ'ল না। তবু সকাল সন্ধ্যা দুপুর প্রতিদিনই তার স্মৃতি-বিজড়িত হ'য়ে আমার কাছে আসে। সে না-আসা পর্য্যন্ত তার এই স্মৃতিগুলিই আমার পাথেয়।—কিছু কম কি?

আমি বল্‌লাম—না কম নয়,—অনেক। এ নিয়ে মরণের পার পর্য্যন্তও অপেক্ষা করা চলে।

নিমেষের পরিচয় আমাদের ফুরিয়ে গেল। অজানা সই আমার কোন্

অজানা পথে চলে গেল। বলে গেল—আবার দেখা হবে। আবার যেদিন এমনি ঝড় উঠ্‌বে।

সেদিন আর আমার জলভরা হ'ল না। শূন্য কলসী জলে ভাসিয়ে বসে রইলাম। থেকে থেকে তার গানের সুর কাণে আস্‌তে লাগ্‌ল—

'আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।'

শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে সত্য নাই।

"চৈতন্য ভাগবৎ"

অপূর্ণ

—শ্রীসোমনাথ সাহা।

সুইচ্ টিপে দিতেই ঘরের আলো নিভে গেল। তারপর জানালা খুলে দিতেই প্রভাতের হাসিমাখা আলো এসে শোভনের ঘর ভরে ফেল্‌ল।

চলে যাবার জন্যে বাঁধা-ছাঁদা সব শেষ হয়ে গিয়েছে। বিছানা-পত্র, দু'তিনটে সুটকেস্ এক কোণে গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। খাট নিজের শূণ্যতাভরা নগ্ন-মূর্ত্তি মেলে ধরেছে। গোটাকতক ছড়ি, একটা ছাতা বাঁধা হয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর কতক গুলো খাম আর চিঠির টুক্‌রো স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে,—অগ্নিদেবের সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার আহুতির অপেক্ষায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্যে যে কয়জন বাঙালীকে নেওয়া হয়েছে, শোভন তার মধ্যে একজন। সেইদিন সকালেই তারা কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাবে।

একটা জিনিস তখনও টেবিলের ওপর পড়ে ছিল,—একখানা ফটোগ্রাফ।

অনাবৃত টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে শোভন সেই ছবি-খানা তুলে নিল, আর চুপ করে সেখানার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। কোঁকড়ানো চুল দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটি মেয়ের মুখ। আধ-নিমীলিত চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে তার চোখের ব্যথা-কাতর দৃষ্টি শোভনের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হ'ল। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চম্‌কে উঠ্‌ল। ছবি খানার দিকে চেয়েই সে সেখানা নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সেখানা তার বুক্ পকেটে রেখে দিল। কিন্তু আবার কি যেন ভেবে তাড়াতাড়ি সেখানা বের করে ছিঁড়ে ফেল্‌তে গেল। কিন্তু সেখানা ছেঁড়া সহজ বলে মনে হ'ল না।

চেয়ার থেকে উঠে সে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক দ্রুত পা ফেলে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। বুকের মধ্যে যখন তুফান ওঠে, বাইরে তার আভাষ মাঝে

মাঝে ফুটে বেরোয়। খানিক পরে শোভন আবার চেয়ারে বসে ছবির পেছন দিকে বাঁকা মেয়েলি ছাঁদে লেখা একটি অতি পরিচিত নামের দিকে চেয়ে রইল।

ঘড়ির কাঁটা যখন আরো অনেকখানি এগিয়ে গেল, পাশের বাড়ীর ঘড়ি শব্দ করে সে খবর জানিয়ে দিল। শোভন আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে না-ছিঁড়েই ছবিখানা ছেঁড়া চিঠির স্তূপের ওপর ফেলে দিল। চিঠির স্তূপের ওপর শুয়েও ছবিখানার চোখ দুটো শোভনের দিকেই চেয়ে রইল,—ব্যথা-মাখানো দৃষ্টি নিয়ে। শোভন সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পার্‌ছিল না। সে ছবিখানা উল্টে দিল।

তারপর টেবিলের ড্রয়ার টেনে খুলে নিজের মনিব্যাগ্‌টা পকেটে নিল। ড্রয়ারের মধ্যে একখানা বই ছিল—সেখানা খুল্‌তেই তার মধ্যে থেকে কতকগুলো শুক্‌নো ফুলের পাতা শোভনের পোষাকের ওপর ঝরে পড়্‌ল। কি যেন ভেবে সে আস্তে আস্তে বই খানার পাতা উল্টে যেতে লাগ্‌ল। প্রথম পাতায় মেয়েলি হাতে কি যেন লেখা ছিল। আর ছিল রক্তের মত রাঙা কতকগুলো পাতা! সেগুলো সে বের করে ফেল্‌ল। তার পর প্রায় প্রতি পাতা থেকে নানা বিচিত্র ফুলের বিচিত্র পাপ্‌ড়ি ঝরে জমা হ'তে লাগ্‌ল। পাতার পর পাতা উল্টে সে সব পাপ্‌ড়িগুলো বের করে নিল। একটা পাতা থেকে বেরিয়ে এল শুক্‌নো একটা কাঁটাওলা আস্ত গোলাপ ফুল। সেটারও রঙ রক্তের মত রাঙা,—হয়ত অনুরাগের সুরে তার সুর মেলানো ছিল কোন দিন।

বইখানা সরিয়ে রেখে ফুলের পাপ্‌ড়িগুলোকেও সে সেই কাগজের স্তূপের উপর নামিয়ে দিল। তার পর পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেই কাগজে আগুন দিয়ে দিল। প্রথম বারে আগুন ধর্‌ল না—একটুখানি শিখা বের করেই সে নিবে গেল। শোভন খানিকক্ষণ ভাব্‌ল, তারপর আবার তাতে ভাল করে আগুন ধরিয়ে দিল। এবার আর আগুন নিভ্‌ল না—নাচের শিখায় ফুলের পাপ্‌ড়ি, ছবি, আর কাগজ, চিঠি, খাম পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগ্‌ল।

শোভন সেই আগুনের শিখার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিল কালো কোঁকড়ানো চুলের ফ্রেমে আট্‌কানো সুন্দর একখানা মুখ—চোখের কোণে যার এক ফোটা জল, মুখের কোণে যার এক রত্তি হাসি।

* * *

খানিক বাদে আগুনের শিখা আবার ঘুমিয়ে পড়্‌ল। পড়ে রইল পুরাণো দিনের বিস্মৃত কথার মত কতকগুলো ছাই, আর দুটো একটা মনে-থাকা কথা ও কাহিনীর মত একটু আধটু কাগজের টুকরো।

শোভন তখন বেরিয়ে চলে গিয়েছে।

একটু পরে একজন চাপ্‌রাসির সঙ্গে দু তিনটে কুলি এসে বাঁধা ছাঁদা সব জিনিস নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর খানিক বাদে ভোঁ করে একখানা ট্যাক্সী বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে অনাবৃত চেয়ারে টেবিলে খাটে রোদের স্পর্শ এসে লাগ্‌ল। আর সকালের পাগ্‌লা হাওয়া এসে শূণ্য ঘরে কাগজের ছাই নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিল।

তার খানিক বাদে হঠাৎ আর একখানা মোটর এসে বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌ল। আর তার পরেই একটি সুন্দর মেয়ে খট্‌খট্‌ করে এসে সেই ঘরে ঢুকেই চম্‌কে থেমে গেল। ঘরের আস্‌বাব-পত্র যে খবর দিচ্ছিল, তা যেন সে মেয়েটি দেখ্‌বে আশা করে নি।

হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল মেঝের উপরের ছাইয়ের দিকে। একখানা খাম তখনও অদগ্ধ অবস্থায় আগুনের গণ্ডীর বাহিরে পড়েছিল। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে খামখানি তুলে নিল—দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত অন্তঃসার শূণ্য খামখানির ওপর শোভনের নিজের হাতে নাম ও ঠিকানা লেখা। সে খানা যে খোলা হয় নি, তা দেখে মনে হচ্ছিল—শোভন মনে করেছিল খামের মধ্যে কিছু নেই! মেয়েটি খামখানা হাতে নিয়ে অতি পরিচিতের মত সে খানা নাড়্‌তে লাগ্‌ল। তারপর তার মুখ ছিঁড়্‌তেই তার ভেতর থেকে অতি ক্ষুদ্র এক টুক্‌রো কাগজ বেরিয়ে এল—তাতে শুধু লেখা ছিল "প্রস্তুত।"

যে বার্ত্তা এই ছোট্ট কথাটি বয়ে নিয়ে এসেছিল, তা পূর্ণ হয় নি।

এক হাতে কাগজের টুক্‌রোটুকু, আর এক হাতে খামখানা নিয়ে মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রোদের আভা তার কোঁকড়ানো চুল আলো করে তুল্‌ল। তার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠ্‌ল।

পরিচয়

—শ্রীভূপতি চৌধুরী।

পাড়ার ললিত বোস্‌ যখন মেডিকেল কলেজ-হাঁসপাতালে মারা গেল; তখন পাড়ার বুড়োর দল—"একটা পাপ গেল" বলে নিশ্বাস ছাড়্‌লেও, পাড়ার তরুণদল তার মৃত দেহটার যথারীতি সৎকার করে এল।

প্রাচীন ও নবীন দলের এই ছুটো কাজের এই যে পার্থক্য এর একটা মস্ত কারণ আছে। প্রাচীনের দল যে তার উপর খুসী ছিল না; তার কারণ সে একটা এক নম্বরের মাতাল। ললিতের বাপ যখন মারা যান তখন ললিতের নাবালকত্ব ও সাবালকত্বের মাঝামাঝি অবস্থা। তখন কিন্তু তার কোন রকম বেচাল দেখা যায়নি। বাপ মারা যাওয়া সত্ত্বেও সে যথাসময়েই এক একটা করে এম, এ, পর্য্যন্ত পাশ করে ফেল্‌লে; তখন তার বাহবা পড়ে গেল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একদিন তার মাতলামির পরিচয় পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। তখন আবার বাহবার বদলে ছিঃ ছিঃ রব উঠ্‌ল।

সে কিন্তু কোনটাতেই ভ্রূক্ষেপ করেনি। নিন্দা প্রশংসা ছুটোকেই সমান ভাবে উপেক্ষা করেছিল।

কেমন করে ও কবে থেকে যে তার অধঃপতন স্থুরু হয়েছিল তা কেউই জান্‌ত না। অনেকেই অনেক কিছু কল্পনা কর্‌ত; সঠিক খবর কারুরই জানা ছিল না। এমন সময় সে তাদের বড় বাড়ীখানা বেচে ফেল্‌লে।

লোকে বুঝ্‌লে সে যে শুধু মাতাল তা নয়, বয়াটেও বটে।

সন্ধ্যাবেলায় তার বার হওয়া ও রাত নটা দশটায় বাড়ী ফেরা, পাড়ার একদল ছেলের দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল। তারপর তাও পুরাণো হয়ে গেল।

ক্রমে ললিতদের বৈঠকখানায় তার বান্ধবদের বৈঠক জমে উঠ্‌ল। অনেক রাত পর্য্যন্ত আড্ডা চল্‌ত আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ত গানের ফোয়ারা। কিন্তু সে গানের গর্‌রার কোন প্রকারের অসভ্যতা অসংযত ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যেতনা। এইটুই ছিল তার বিশেষত্ব।

কিন্তু একদিন সে এক পুলিশের নোটীশ পেলে, পাড়ার লোককে বিরক্ত

করার অপরাধে। সে নোটীশ প'ড়ে হেসে ফেলে দিলে সেই কাগজখানকে কিন্তু তার পর হ'তে তার বৈঠকখানার জমায়েত বন্ধ হয়ে গেল। তার এক বন্ধু এসে খবর দিলে, যে এ নোটীশের মূলে আছে, তার বাড়ী যে কিনেছে সে। শুনে সে হাঁ বা না কিছুই বল্‌লে না। চুপ্‌ করে গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

তারপর থেকে তার মাতলামী বেড়ে উঠ্‌ল।

ক্রমশঃ সে সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তার খবরও কেউ রাখ্‌ত না, রাখা প্রয়োজন ও মনে করত না। শুধু তার বাড়ী যে কিনেছিল, সেই মাঝে মাঝে খোঁজ নিত তার শারীরিক অবস্থার নয় তার আর্থিক অবস্থার। তার এ ব্যবহারে সে কঠিন হয়ে উঠ্‌ত কিন্তু কিছু মুখে বল্‌ত না।

প্রতিদিনকার মত সেদিনও সে সন্ধ্যায় বাড়ী হ'তে বার হচ্ছিল, এমন সময় পাড়ায় একটা হট্টগোল লেগে গেল। তার বিক্রী করা বাড়ীটায় আগুন লেগেছিল।

শীতকালে দরজা জানালা বন্ধ ঘরে গ্যাসের পাইপ ফেটেছিল। অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বালতেই সারা ঘর ধরে উঠে। আগুন দেখে, সকলেই বাড়ী হ'তে বার হয়ে আসে শুধু আসা সম্ভব হয়নি সেই বুড়ী ঝির, যে বন্ধ ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বালতে গিয়েছিল। চারিদিক ঘন ধোঁয়ায় অন্ধকার। আর সেই নিবিড় ধুমের পর্দ্দা ভেদ করে এল শুধু একটা তীব্র করুণ আর্ত্তনাদ।

সে আর্ত্তনাদ কাণে গিয়েছিল সকলেরই কিন্তু একটা ঝিয়ের জন্তে এ বিপদ মাথায় নিয়ে তাকে উদ্ধার করার চিন্তা কেউই মনে স্থান দেয়নি। শুধু একটা কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হল "আহা ঝিটা পুড়ে মল।"

মাতাল ললিতের মনের উপর কথা গুলো যেন চাবুকের মত ঘা মেরে তাকে উত্তেজিত করে তুল্‌লে। কোনদিকে না চেয়ে, সে তীরের মত সেই আগুনের জলন্ত চিতার মধ্যে ছুটে গেল। . . . আর ভীরু দর্শকের দল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর তাদের উদ্ধার করে আন্‌লে ফায়ার ব্রিগেডের লোক। তারা ললিতের অজ্ঞাত দগ্ধ দেহটাকে এম্বুলেন্স ডেকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দিলে।

সে মুহূর্ত্তের একটী কাজে তার প্রাণের দেবত্বের পরিচয়ের চিরন্তন ছাপ্‌ দিয়ে গেল।

চম্পা

অন্তহীন আলোর ছটায় শিশির-ভিজা পাতাগুলি ঝক্‌মক করিতেছে। কুটীরের সম্মুখে উঠানে বাঁধা গরুগুলির গা দিয়া শীতের প্রভাতে ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠিতেছে। আস্তাকুঁড়ের ছাইয়ের গাদার ভিতর ডোরাকাটা বিড়ালটা শুইয়া শুইয়া হাই তুলিতেছে। কয়েকটা কাক থালার উপর হইতে পরিত্যক্ত আহার্য্য খুঁটিয়া খাইতেছে। তখনও কন্‌কণে শীত। সকাল বেলা ফুল তুলিয়া আসিয়া চম্পা দেখিল, নারাণ অত বেলাতেও বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে।

ভিজা ঘাসের উপর চলিতে চলিতে তাহার পা ভিজিয়া গিয়াছে, কপালের চুলের উপর বিন্দু বিন্দু শিশির জমিয়াছে। নারাণকে এখনও এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চম্পা যেন একটু চিন্তিত হইল। ধীরে ধীরে পিতার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, তুমি এখনও নাও নি? অনেক বেলা হয়ে গেছে যে আজ।

নারাণ একবার চম্পার মুখের দিকে চাহিল। হুঁকাটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেকাইয়া রাখিয়া, কল্‌কি নামাইয়া রাখিল। চম্পা বলিয়া উঠিল, এখনও মুখ ধোঁও নি?

নারাণ হাত দুইটি উর্দ্ধে তুলিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, না, আজ যেন বড় কুঁড়েমি ধরেছে।

চম্পা আশ্চর্য্য হইল। তাহার জ্ঞানাবধি নারাণকে সে কখনও আলস্যে সময় নষ্ট করিতে দেখে নাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নানাদি সারিয়া নবীন সূর্য্যের আলো দেখা দিতেই সে পূজায় বসিত। চম্পাও সেই জন্য, জল বৃষ্টি শীতে গ্রীষ্মে, এত কাল ধরিয়া নারাণের পূজার ফুল যোগাইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে স্নান করিয়া এ গাছে সে গাছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চম্পা ফুল লইয়া আসিত। যেদিন ভাল ফুল পাইত সেদিন চম্পার আর আনন্দ ধরিত না। নারাণও সেদিন যেন প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে পারিত। পূজা সারিয়া চম্পার কপালে চন্দনের

তিলক আঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকত। চম্পা গড় করিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিত, নারাণ স্মিতমুখে তাহাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত। ঠাকুরপ্রণাম হইয়া গেলে চম্পা প্রত্যহ নারাণেরও পায়ের ধূলা গ্রহণ করিত। নারাণের বুক স্নেহ ও করুণায় ফুলিয়া উঠিত। চম্পাকে কাছে টানিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া নীরবে তাহার কল্যাণ কামনা করিত। এমনি ধারা নিয়মের ভিতর তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের সব কাজ সম্পন্ন হইত। কিন্তু আজ নারাণের এরূপ অনিয়ম দেখিয়া চম্পার মনে যেন কেন একটু ভয় আসিল। পূজার পাট্‌ সাজাইতে সাজাইতে সে কত কি ভাবিতে লাগিল। কত যে ছিন্ন ছিন্ন বিভীষিকার ছবি তাহার মনে আসিয়া দেখা দিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। চম্পা অনেক চেষ্টা করিয়াও যেন সেগুলি তাড়াইতে পারিলনা। বারে বারে সে চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চোখ ভরিয়া জল আসিল। আঁচল দিয়া বারে বারে মুছিয়াও সে কান্না থামাইতে পারিল না। কিসের জন্য যে তাহার এমন কান্না আসিল তাহাও সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। একটা অস্পষ্ট উতলা বিষাদের অবসন্নতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

নারাণ স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, চম্পার কপালের চুলের উপর ফোঁটা ফোঁটা শিশিরবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার চোখ ভরিয়া জল টল্‌ টল্‌ করিতেছে। নারাণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সস্নেহে ডাকিল চম্পা, কি হ'য়েছে রে?

চম্পা কথা বলিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবা, বলিয়া নারাণকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার রুদ্ধ অশ্রু যেন এতক্ষণে ছাড়া পাইল। নারাণের বুকের উপর পড়িয়া সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নারাণ একটু নড়িল না, একটি সান্ত্বনার কথা বলিল না। পূজার থালায় ছোট মৃন্ময় বিগ্রহের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারাণের স্ত্রী রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া কাজকর্ম্ম সারিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই ঘরের ভিতর ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ শুনিল। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে কাঁদ্‌ছে?

কেহ উত্তর করিল না। নারাণের স্ত্রী আরও দুই তিনবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সব নিস্তব্ধ, ঘরের ভিতর কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না, তবু যেন সমস্তটুকু নীরবতাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া একটি অস্ফুট কান্নার সুর শুনিতে

লাগিল। সে কিছু বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, এবার চীৎকার করিয়া বলিল, তোমরা কি সব মরে গেছ ? কে কাঁদছে বলনা। চম্পা কাঁদছে বুঝি ? কি জ্বালা, বাসি কাপড়ে আমি যে ঘরে যেতে পারছিনা।

চম্পাকে ধরিয়া নারাণ আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। নারাণের চোখেও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। চম্পা যেন আজ গা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া নারাণের বুকের উপর তাহার আকুলতাকে কান্নার মুখে ভাসাইয়া দিয়াছে। নারাণের চোখের পলক পড়িতেছে না। দুইটি ক্ষীণ অশ্রু-ধারা তাহার দুই চোখ বাহিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার দৃষ্টি শূন্যে স্থাপিত, চম্পার এই অবিশ্রান্ত দুঃখের উৎসকে যেন বুক ফুলাইয়া পাতিয়া লইয়াছে।

তাহাদের দেখিয়া নারাণের স্ত্রী একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতখানি যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, সেও যেন বর্ণহীন প্রভাত-আকাশের মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়াই রহিল। উঠানে বাঁধা গাভীটা ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ছাইয়ের গাদা ছাড়িয়া বিড়ালটা উঠিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাকগুলি হঠাৎ কা-কা শব্দ করিয়া চালের উপর উড়িয়া বসিল। নারাণের স্ত্রীর মনের মধ্যেও যেন একটা বিপুল ব্যথা অস্থির হইয়া উঠিল। কিসের ব্যথা সে কিছুই বুঝিল না। নিরুপায় হইয়া সেও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নারাণের পাশের বাড়ীতে বসন্ত কবিরাজ থাকিত। কান্নার শব্দ শুনিয়া সে আসিয়া নারাণের উঠানে দাঁড়াইল। দু'একবার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাইল না। একে একে আশে পাশের সকল গৃহস্থ বাড়ী হইতে পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা নারাণের বাড়ীতে ছুটিয়া আসিল। সকলেই জানিত নারাণের বাড়ীতে মাত্র এই তিনটি প্রাণী। সকলকেই উপস্থিত দেখিয়া কেহ কিছু ঠিক্ করিতে পারিল না, কি হইয়াছে। অগত্যা বসন্ত কবিরাজ বারান্দায় উঠিয়া নারাণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে হে— নারাণ ?

নারাণ জলভরা চোখে কবিরাজের দিকে চাহিয়া বলিল, কিছু না, ওদের সকলকে যেতে বলে দাও।

বসন্ত একবার মুখ বিকৃত করিয়া কি একটা অস্পষ্ট কথা বলিল। পাড়ার সকলকে বাড়ী যাইতে বলিল। সকলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে যে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া নারাণ বলিয়া উঠিল, বিষ্ণু ?

নারাণের স্ত্রী ফিরিয়া চাহিতেই আগন্তুক ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া নারাণের স্ত্রীকে প্রণাম করিল। নারাণের স্ত্রী নিজের ঠোঁটের উপর আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিল, চুপ্।

নারাণ আজ পনর ষোল বছর এ গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে। সে যখন এ গ্রামে আসে তখন চম্পা অত্যন্ত শিশু। নারাণ প্রথম গ্রামে আসিয়া তাহার উঠানের কোণে বড় একটা কাঁঠাল গাছের নীচে পাঠশালা খুলিল। গ্রামের লোক প্রথমে তাহার বিপরীত আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে একটু অবিশ্বাসের ভাবেই দেখিত। ভিন্ন জাতীর সব ছেলেরাই একাসনে বসিয়া তাহার কাছে শিক্ষা করিত। অথচ নারাণ প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া খুব নিষ্ঠার সহিত পূজা আহ্নিক করিত ইহাও সকলে জানিত। সন্তানদের মুখে উৎসাহের কথা শুনিয়া গ্রামের সকলে ছেলেদের নারাণের পাঠশালায় পাঠাইতে বাধ্য হইল। এক রকম করিয়া দিন কাটিয়া যাইতে ছিল, কিন্তু যেদিন একটি চাঁড়ালের ছেলে আসিয়া সকলের সঙ্গের একাসনে বসিল, সেদিন গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর গ্রামের গণ্য, মান্য ব্যক্তিরা মণ্ডপে সভা করিয়া বসিল। পাঠশালার কয়েকজন ছেলেকে ডাকিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইল। নানারূপ আলোচনা করিয়া প্রায় অর্দ্ধ রাত্রিতে সকলে সেদিন বাড়ীতে ফিরিল। নারাণের এ সংবাদ অজ্ঞাত রহিল না। প্রথমে তাহারও একটু ভাবনা হইয়াছিল। মনে একটু ভয় হইয়াছিল। এতদিন এত চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা যদি আজ একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর চোখ বুঁজিয়া বিছানায় পড়িয়া যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই সাহস বাড়িতে লাগিল, যাহা মনে সত্য বলিয়া জানিয়াছে, নিজের জীবনে যাহা প্রকাশ করিতে দারিদ্র ও ক্লেশ সহ্য করিতেছে তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিবে ইহাই স্থির করিল।

পরদিন সকাল বেলা পাড়ার লোক আসিয়া যখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, তখন নারাণ প্রস্তত হইয়াই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন নারাণকে আদেশের সুরেই বলিল, চাঁড়ালের ছেলেকে তাহার পাঠশালায় স্থান দিলে, এ গ্রামে তাহার স্থান হইবে না। নারাণ বিনীত হইয়া উত্তর করিল, গাঁয়ে চাঁড়ালরা না থাকলে যখন তোমাদের চলে

না, তখন পাঠশালা থেকেই বা চাঁড়ালকে বাদ দি কেমন করে? যে জ্ঞানের জন্য তোমরা অভিলাষ কর, চাঁড়ালও যদি একটু আধটু সে জ্ঞান পেতে চায়, তাকে তা থেকে বঞ্চিত করি কোন ক্ষমতায়?

একজন রুখিয়া উঠিয়া বলিল, তাহলে তুমি এ ভাবেই চল্‌বে, গ্রামের মোড়ল যারা তাদের কথা শুন্‌বে না?

নারাণ হঠাৎ একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল। কি ভাবিয়া আবার সংযত হইয়া বলিল, আমি ত বলিনি তা। সবার কথা শুন্‌তেই আমি প্রস্তুত, সেকথা যদি কাজের কথা হয়। এ গ্রাম আমার না। এ গ্রামের অধিবাসী তোমরা। তোমাদের গ্রামে এসে আমি বাস কর্‌ছি মাত্র। তবে এটা জেনো, এ গ্রামে থাক্‌তে না পেলে আমি চলে যাব বটে কিন্তু তোমাদের সহজে ছেড়ে দেব না। যদি অন্যায় গুলি বেড়েই চলে, তোমাদের অত্যাচার যদি সীমা ছাড়িয়ে ওঠে, আমার প্রাণ তা' বেশিদিন সহ্য করবে না।

নারাণের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের ভিতর একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল। কয়েক জন অগ্রসর হইয়া নারাণের মাথার উপর লাঠি তুলিল। বসন্ত কবিরাজ হাঁকিয়া বসিল, দেখ নারাণ, তোমার অনেক অনাচার আমরা সহ্য করে আস্‌চি। চম্পা তোমার মেয়ে নয় তা' আমরা জান্‌তে পেরেছি। সে একটা জেলের মেয়ে। তাকে তুমি ঘরে রেখেছ। তোমার মত্‌লব আমার জান্‌তে বাকি নেই। যুবতী সুন্দরী মেয়েকে অনাথা পেয়ে তোমার কুবাসনা চরিতার্থ কর্‌বে মনে করেছ। কিন্তু এ গ্রামে তা চল্‌বে না জেনো। পূজা আহ্নিকের খোলস চড়িয়ে পরোপকারের জয়ঢাক বাজিয়ে এ গ্রামে পাপের অভিনয় কর্‌বে তা হ'তে দেব না জেনো।

নারাণ এতক্ষণ অতিশয় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। রাগে ও অপমানে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। বসন্ত কবিরাজের এ কথার পর সে আর স্থির থাকিতে পারিল না? এক লাফে সে বসন্ত কবিরাজের ঘাড়ের উপর পড়িল। উঠান হইতে চম্পা ছুটিয়া আসিয়া নারাণকে জড়াইয়া ধরিল নারাণের উদ্যত বজ্র-মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। সে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, চম্পা তুই ঘরে যা মা।

চম্পা কঠোর ভাবে বলিল। না, যাব না। তুমি এদিকে সরে এস। আমি আজ নিজের অপমাণের শোধ নেব। তার পর বসন্ত কবিরাজের

দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি কি মনে কর, এমনি ক'টা কথা বলে গ্রামের লোকদের কাছে বাহাদুরী নেবে? এতদিন আমি একটি কথা বলিনি। মনে করেছিলাম একদিন তোমার জ্ঞান ফিরে আস্‌বে। সত্যি তোমার মনে হবে আমি অনাথা আশ্রয়হীনা। তাই ভেবেও তুমি আর আমার ওপর অত্যাচার কর্‌বে না। কিন্তু, বলিতে বলিতে চম্পার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একে বারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অপমানে, ক্ষোভে তাহার বুক ভরিয়া আসিল।

একজন বৃদ্ধ আগাইয়া আসিয়া সস্নেহে বলিল, তুমি ঘরে যাও মা। আমাদের এতদিন বসন্ত ভুল বুঝিয়েছে। এর মধ্যে আরও অনেকে আছে, যারা জোর করে বলেছে যে তারা তোমাকে অনেক অন্যায় কাজ কর্‌তে নিজের চক্ষে দেখেছে। আমি তা বিশ্বাস করেছিলাম আর তাতে তোমার যে অপমান কর্‌লাম, এ আর মুছে ফেল্‌বার কোনও উপায় নাই। তবে—

চম্পা বাধা দিয়া বলিল, না তা মুছে দিতে হবে। আর আজই তা' চাই। সে আপন জ্যোতিতে আপনি মহিয়সী হইয়া উঠিল, তাহার চোখে মুখে পরিপূর্ণ শক্তির এক অপূর্ব্ব শোভা উজ্জল হইয়া উঠিল। যাহার মুখে সারা দিন রাতে দুই চারিটি কথা ফুটিত না, আজ যেন সে কেমন করিয়া কথার পর কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। সে আঙ্গুল দিয়া বসন্ত কবিরাজকে দেখাইয়া বলিল, ঐ তোমাদের গ্রামের একজন মোড়ল। সকলেই তোমরা জান, এর মত গ্রামের হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই! কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, ঐ কবিরাজ তোমাদের গ্রামে পাপের স্রোত বাড়িয়ে চলেছে। তার ঔষুধে কত শিশু যে বাইরের নিশ্বাস গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বেই আপন জীবনদান করে মায়ের কলঙ্ক মোচন করেছে তার সীমা নাই। ঐ কবিরাজ, কত দুর্বৃত্তের পশুত্বকে যে সাহায্য করেছে তার হিসাব হয় না। গ্রামের মেয়েদের কাছে ত শুনেইছি এসব কথা, তা ছাড়া ঐ কবিরাজ নিজের মুখে ঐ সব কথা আমাকে বলেছে। তার বাসনাকে চরিতার্থ কর্‌বার জন্য দিনের পর দিন উত্যক্ত করেছে, ঐ সব ঔষুধ পত্রের নাম করে সে আমাকে লওয়াতে চেয়েছে। এতদিন কোনও কথা বল্‌তে পারিনি, আমার ঘৃনায় লজ্জায় মন বিষিয়ে উঠেছিল। জেলের মেয়ে হ'লেও, আমারও লজ্জা আছে; অনাথা হ'লেও আমার যেমন ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, তেমনি নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে একটা

গৌরবও আছে। আমাকে তোমরা অনাথা বল, তা' বলে ক্ষুধা আমাকে ছেড়ে দেয়নি, তৃষ্ণা আমাকে রেহাই দেয়নি ; সকল মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক আমারও সব ঠিক্ তাই আছে। তা' হয়ত তোমরা ধারণাই করতে পার না। তোমরা হয়ত ভুলে যাও সমস্ত মানুষের ক্ষুধার অন্ন এই মাটিতেই ফলে, সমস্ত মানুষের মনুষ্যত্ব একই জীবন-ধারা থেকে জন্মলাভ করে।

বসন্ত কবিরাজ সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ্‌ছ, কেমন তৈরী মেয়ে! কেমন গুছিয়ে সব বলে যাচ্চে ?

সেই বৃদ্ধ বসন্তকে টানিয়া আনিয়া বলিল, আর মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা ঢাকৃতে চেষ্টা করোনা। সকলের সাম্‌নে স্বীকার কর, তুমি দোষ করেছ। তাতে কিছু লজ্জা নাই। মানুষ তুমি, হয়ত দুর্ব্বলতা এসেছিল, আর তা' স্বীকার করতে কোনও অপমান নাই। চম্পাকে যদি অনাথা বলেই মনে করে থাক, তাকে আশ্রয় দেবে তোমরা।

গ্রামের অন্য যাহারা ছিল তাহারাও অনুতপ্ত হইয়া বসন্ত কবিরাজকে অনুরোধ করিল চম্পার নামে যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে।

বসন্ত কবিরাজ তখন জোর করিয়া বলিল, চম্পার সব কথা মিথ্যা।

বিষ্ণু এতক্ষণ উঠানের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে উঠিয়া আসিয়া চম্পার সম্মুখে দাঁড়াইল। গ্রামের লোকেরা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিষ্ণু মাথার গাম্‌ছাটা খুলিয়া কোমরে বাঁধিয়া ফেলিল। চম্পাকে এক ধাক্কা দিয়া উঠানের বেড়ার পাশে সরাইয়া দিল। তাহারপর এক লাফে বসন্ত কবিরাজের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। বসন্ত কবিরাজের চোখ লাল হইয়া উঠিল। মুখে রক্ত ফুটিয়া উঠিল! সেও বিষ্ণুকে লইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। একবার বসন্ত নীচে, আবার বিষ্ণু নীচে পড়িতেছে। এমনি করিয়া মারামারি চলিতে লাগিল। কেহ বাধা দিল না। নারাণ উঠানের দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। একবার বসন্ত বিষ্ণুর বুকের উপর উঠিয়া বসিল। একহাতে বিষ্ণুর গলা টিপিয়া ধরিয়া, আর এক হাতে বিষ্ণুর বুকের পাশে ঘুঁষি মারিতে লাগিল। জনতা একেবারে স্থির, ধীর। কাহারও মুখে একটি কথা নাই।

বিষ্ণু বহু কষ্টে বসন্তের হাত তাহার গলা হইতে খুলিয়া দিল। হুঙ্কার

করিয়া বলিল, তবে আমার দোষ নাই। একবার খুন করে দশবছর জেল খেটে এসেছি। না হয় আর একবার যাব। তাহারপর সে বিপুল বিক্রমে বসন্তের কব্জি মুষ্ঠি করিয়া ধরিয়া তাহাকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলিল। যেন বিষ্ণুর ইঙ্গিতে বসন্ত মাটির উপর চিৎ হইয়া পড়িল। বিষ্ণু তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। দুই পায়ে বসন্তের কোমরে চাপ দিতে লাগিল। এক হাত তাহার গলার উপর দিয়া নিয়া বসন্তের ডান হাত খানি পিঠের দিকে মোচ্‌ড়াইয়া দিল। অন্য হাতে বসন্তের একটা পা তাহার কোমরের তলা দিয়া পিঠের কাছে আনিয়া, গোড়ালিটা মোচ্‌-ড়াইয়া ধরিল। তাহারপর চীৎকার করিয়া হাঁকিল, এদিকে আয়ত চম্পা। নারাণ চম্পাকে যাইতে নিষেধ করিল। বিষ্ণু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল, জেলের মেয়ে, বাপ মা নেই বলে একেবারে ভেসে এসেছে ?

হাতের চাপে কবিরাজের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার দুই চোখ যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। সে অনেক কষ্টে বলিল, আমাকে ছেড়ে দাও। বিষ্ণু আর এক বার জোরে চাপ্‌ দিয়া বলিল, ছাড়্‌ছি, এই নাও।

সেই বৃদ্ধ তখন আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া আসিয়া বিষ্ণুকে বলিল, ছেড়ে দাও বাবা। যে হারমান্‌ছে তাকে আর কেন মার্‌ছ ? বিষ্ণু বসন্তের মুখের দিকে চাহিল। বসন্ত কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও।

বিষ্ণু এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, আবার প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, বসন্ত যদি উঠিয়া আবার আক্রমণ করে।

বিষ্ণু ছাড়িয়া দিলেও বসন্ত অনেকক্ষণ উঠিতে পারিল না। বার বার চেষ্টা করিয়াও সে মাথা তুলিতে পারিল না।

বিষ্ণু বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গিয়া এক ঘটি জল আনিয়া বসন্তের মুখে চোখে দিতে লাগিল। বসন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া হাঁ করিল।

বিষ্ণু একবার কি ভাবিল। তাহারপর বসন্তের মুখে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বসন্ত ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া অনেক খানি জল খাইয়া যেন একটু সুস্থ বোধ করিল।

বিষ্ণু তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া দাঁড় করাইল। বসন্ত এদিক ওদিক চাহিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল।

বিষ্ণু তাহা বুঝিতে পারিয়া ডাকিল, চম্পা, এদিকে আয় ত মা।

চম্পা আসিয়া বিষ্ণুর পাশে দাঁড়াইল। বসন্ত তবুও আবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল, সে যেন কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে একটা বিভ্রম দৃষ্টি। নারাণকে দেখিতে পাইয়া সে কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নারাণ ধীরে ধীরে আসিয়া বসন্তের হাত ধরিল। বসন্তের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে শূন্য দৃষ্টি তুলিয়া নারাণের চোখের দিকে চাহিল।

নারাণ খুব স্নেহভরে বলিল, কিছু বল্‌তে চাও? এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বে চল। তারপর না হয় বলো।

বসন্ত যেন হঠাৎ স্বর ফিরিয়া পাইল। সে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া একেবারে নারাণের পায়ের উপর শুইয়া পড়িল।

নারাণ ব্যস্ত হইয়া মাটীতে বসিয়া বসন্তের মাথাটি তাহার কোলে তুলিয়া লইল। চম্পা একখানি হাতপাখা আনিয়া বসন্তের মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। নারাণের স্ত্রী একবাটী গরম দুধ আনিয়া বসন্তকে খাওয়াইয়া দিল।

বসন্ত ক্ষুদ্র শিশুর মত নীরব হইয়া চোখ বুঁজিয়া মহাশান্তিতে যেন পড়িয়া রহিল। তাহার দুই চোখের কোণ দিয়া কেবল দুইটী ক্ষীণ অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই বসন্ত অঘোর নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল।

গ্রামের লোকেরা কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, ঐ বিষ্টুটাত কি জাত তার ঠিক্ নেই। তার হাতে ত্ জল খেতে হোল! কি জানি বাবা ধর্ম্ম কেমন?

আরেকজন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ধর্ম্ম! এতকাল নিষ্ঠা করেও গেল বছর শীতলঠাকুরের কি দশা হোল! সেই বিঘোরে বিদেশে হাঁসপাতালে মোল। এরা গিয়ে পৌঁছতে পার্‌ল না, সাহেবরা ডোম্ হাঁড়িকে দিয়ে ঐ লাশ পোড়ালে! ধর্ম্ম! ধর্ম্মই যদি থাকবে তাহলে তার ঐ দশা হয়!

কেহ কেহ উঠিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। আর কতগুলি লোক মাটির উপর নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পড়িল। শেষটা কি হয় তাহা দেখিয়া যাইবার জন্য তাহাদের কৌতুহল। যেন সব টুকু না জানিয়া তাহারা কিছুতেই যাইবে না।

নারাণ আস্তে আস্তে ডাকিল, শিবুদা—সেই বৃদ্ধ নারাণের মুখের কাছে মুখ নামাইয়া বলিল, কি ?

নারাণ জিজ্ঞাসা করিল, এম্‌নি এখন থাক্‌বে ? শিবনাথ একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, তার চাইতে ওর ঘরে শুইয়ে দিলে হয় না ? এরকম করে আর কতক্ষণ নিয়ে বসে থাক্‌তে পার্‌বে !

নারাণ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কয়েকজন ধরা-ধরি করিয়া আস্তে আস্তে বসন্তকে ধরিয়া তাহার ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

আর কিছু হইল না দেখিয়া, যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা এক এক করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

চম্পা নারাণকে হাত দিয়া ইসারা করিয়া বলিল, সে বসন্তের কাছে থাকিবে।

নারাণ ঘাড় নাড়িয়া বাহিরে আসিল। চম্পা বসন্তের মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

অনেক বেলা বাড়িয়া গিয়াছিল। দলে দলে ছেলে মেয়ে আসিয়া কাঁঠাল গাছের তলায় ভীড় করিল। নারাণ তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল, আজ তোমাদের ছুটি। আজ আর পাঠশালা বস্‌বেনা। বসন্ত কবিরাজের শরীরটা ভাল না। গোলমাল হলে তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

ছুটির কথা শুনিয়া ছেলেরা স্বাভাবিক আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিবে উপক্রম দেখিয়াই নারাণ হাতের ইসারায় বলিল, চুপ্‌, একটু গোল কর্‌বেনা। আস্তে আস্তে যে যার ব্যড়ী চলে যাও। ছেলেরা যতক্ষণ না সকলে চলিয়া গেল, নারাণ ততক্ষণ কাঁঠাল তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর গাছটাকে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িল।

বিষ্ণু এক কলিকা তামাক সাজিয়া নারাণকে দিল। নারাণ হুঁকা টানিতে টানিতে কি ভাবিতে লাগিল।

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিল, ওরা সব জান্‌ল কেমন করে চম্পার কথা !

নারাণ হুঁকাটা নামাইয়া বলিল, এ আর জানাজানি কি ? কেমন করে কেউ খবর পেয়েছে আর কি, যে একজন জেলের কাছে এ মেয়েটা আমি পেয়েছি।

চম্পা ত জানে না আমি কে ?

তাই বা কেমন করে বল্‌ব? আর আমিইত ভাল করে জানি না তুমি কে?

বিষ্ণু এইবার একটু হাসিল। তারপর নেহাৎ বালকের মত বলিল, আচ্ছা, চম্পা যদি আমারও মেয়ে না হয় তাহলে তুমি কি কর?

মাঠের রৌদ্র কিরণে উদ্ভাসিত ঘাসের উপর কাল সাদা লাল গরুগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস বাছিয়া বাছিয়া খাইতেছিল, নারাণ তাহার দিকে চাহিয়াছিল। বিষ্ণুর কথায় মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি আবার করব? এমনি থাকবে। কেউ যদি বিয়ে করতে চায় বিয়ে কর্‌বে।

বিষ্ণু নারাণের হাত ধরিয়া বলিল, কারুকেও যেন বলোনা। চম্পা আমারও মেয়ে নয়। যে লোকটাকে বৈঠাদিয়ে মেরে ফেলেছিলাম চম্পা তারই মেয়ে। চম্পাকে নৌকায় তুলেই আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরি। লোকটা বল্লে সে কায়স্থ। আমি তাকে জোর করে বল্‌লাম, তোমার মেয়ে তুমি ঘরে নিয়ে যাও। ওবেটা আমার উপর রুখে উঠ্‌ল। আমাকে একটা গালাগালি দিয়ে জলে ঠেলে ফেলে দিলে। আমি রাগে অন্ধ হয়ে বৈঠাটা দিয়ে তার মাথায় ঘা বসিয়ে দিলাম। আমি বুঝ্‌তে পরিনি ওতেই ও মরে যাবে। তবে শুনেছি ও নাকি মর্‌বার আগে বলে গেছে, চম্পা এক কায়স্থ কন্যা।

চম্পা ঘর হইতে ডাকিল বাবা। নারাণ ও বিষ্ণু ছুটিয়া গিয়া দেখিল, বসন্ত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে—তাকে যদি রাখ্‌তাম, চম্পার মতই এতদিনে সে বড় হোত। রঘু যদি তাকে জলে না ভাসিয়ে দিত। আজ তাহলে আমার একটা মেয়ে থাকৃত!

চম্পা নারাণের মুখের দিকে চাহিল। নারাণ চম্পাকে বলিল, তুমি এখন যাও মা, আমি থাকি। তুমি খেয়ে এলে, আনি যাব।

চম্পা উঠিয়া গেল। বিষ্ণু নারাণের কাণে কাণে বলিল, কবিরাজ ভাল হয়ে উঠ্‌লে তাকে বলো, চম্পাই তার সেই মেয়ে। সে লোকটা বলেছিল বটে, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ঝড়ের রাতে

—শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে চায়ের মজলিসে তিন বন্ধুর ভিতর সহসা তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। তর্কের আলোচ্য বিষয় ছিল—মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব।

নির্ম্মল ছেলেটি একবারে আধুনিক তন্ত্রের, সে বিশ্বাস্য যুক্তি প্রমাণ না থাকিলে কোন বিষয় মানিয়া লইতে রাজি নয়। তাহার মতে মৃত্যুর পরে সবই শেষ, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। পরেশ এ কথায় খেপিয়া গিয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে।

পরেশ গোঁড়া হিন্দু, সে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সমস্ত কথাই নির্ব্বিচারে মানিয়া লয়, কেহ প্রতিবাদ করিলে সে রাগিয়া বলে, হ্যাঁ সেকালে আর্য্য ঋষিরা সব তোমাদের মত গোমূর্খ ছিলেন কিনা! তাঁরা তাঁদের অসীম জ্ঞান ও যোগের সাহায্যে যে সব সত্য প্রত্যক্ষ করে শাস্ত্র রচনা করে গেছেন, তোমরা দু পাতা ইংরিজি পড়ে সে সব কথা উড়িয়ে দিতে চাও? ভারি সব বিদ্বান, বুদ্ধিমান এসেছেন। অর্ব্বাচীন্ আর কাকে বলে?

যে হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, আজন্মের সমস্ত সাধনা পরকালের সদ্গতি ও আত্মার ক্রমিক উন্নতির নির্দ্দেশেই বিভোর, সেই হিন্দুসন্তান হইয়া নির্ম্মলের এত বড় একটা গভীর সত্যে অনাস্থা দেখিয়া পরেশ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া গিয়াছিল। সে নানা যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণের সাহায্যে তাহাকে বুঝাইতেছিল—মৃত্যুর পরে সমস্ত নিঃশেষ হওয়া দূরে থাক্ সবই তার বজায় থাকে। মানুষের প্রকৃতি আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই সদ্য সদ্য বদল হয় না, মৃত্যু কেবল তার স্থূল দেহটা নষ্ট করে মাত্র।

নির্ম্মল বলিল—কিন্তু তুমি যা বল্ছো তা যে সত্য তার এমন কি প্রমাণ আছে? শুধু শাস্ত্রে আছে বল্লেই তো বিচার ফুরিয়ে যায় না আমাদের নিজেদেরও তো সেটা বুঝে দেখ্তে হবে?

পরেশ বাধা দিয়া বলিল—কি অবিশ্বাসী মন তোমার! এর মধ্যে বোঝ্‌বার যে কি আছে, তা তো কিছু ভেবে পাই না! এ যদি সত্য না হয়, তা-হলে এতদিনকার সমস্ত শাস্ত্র অনুষ্ঠান সবই ভেস্তে যাবে যে! মর্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যদি সব শেষ হয়, তাহলে পুনর্জন্ম কর্ম্মফল বাদ—এ সব কিছুরি মানে হয় না! সৎ অসৎ কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ থাক্‌বে না—সাধু ও চোর, দুজনের জীবন ঠিক একভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে—কেমন? চমৎকার বিচার যা হোক্! মানুষ প্রতিনিয়ত জন্মাচ্ছে ও মর্‌ছে—এটা যেমনি সত্য, প্রত্যক্ষ ঘটনা—তেমনি মৃত আত্মাকে মানুষে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসমাজে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছে, জান্‌ছে—এটাও ঠিক তেমনি সত্য ও বিশ্বাস্য ব্যাপার—মর্‌বার পর যে সব শেষ হয় না—এ কথার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রমান আর কি চাও তুমি? বিশ্বাস হয় না?

কি করে হবে? নিজে যতক্ষণ না দেখি ততক্ষণ কিছুই স্থির করে বলা যায় না। গল্প ত অনেক শোনা যায়—আমিও শুনি, তুমিও শোন, সকলেই শোনে। নিজে দেখেছ কিছু কখনো?

পরেশ রাগিয়া বলিল—শোন কথা! আমি দেখিনি বলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল না কি? আমি যেমন দেখিনি, তেমনি হয়ত একশোজন লোকে দেখেছে তার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের কথা খুব বিশ্বাস যোগ্য জোর করে বলা যায়। তুমি যে এত বড়াই কর্‌ছো, তুমি ইটালীর আল্‌স্ পাহাড় দেখেছো কখনো? বল তো?

নির্ম্মল নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসি দেখিয়া পরেশ বিষম উত্তেজিত হইয়া বলিল—কি? কথা নেই কেন? যাওনি ত ইটালীতে, কাজেই তুমি ও পাহাড়শ্রেণী চোখে দেখ নি! অতএব আল্‌স্ পর্ব্বতমালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার বিশেষ সন্দেহ আছে—কেমন?

নির্ম্মল ধীরভাবে বলিল—না তা নেই। কারণ আমি না দেখ্‌লেও যাঁরা দেখেছেন ও এখনো দেখ্‌ছেন তাঁদের এটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যাপার—কাজেই অবিশ্বাস কর্‌বার কোন কারণ নেই, কিন্তু তুমি যে বিষয় তর্ক করছ, ওর সবই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া গোছের—বিশ্বাসযোগ্য ত বিশেষ কিছু দেখ্‌তে পাই না। কিহে নলিন! তুমি তো কোন কথা বোল্‌ছো না? তোমার এ বিষয়ে কি মত বলো?

নলিন এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে চা খাইতেছিল, সে সহজেই কথা বলে কম, ও কোন তর্কে বিশেষ যোগ দেয় না।

নিঃশেষিত পেয়ালা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া সে বলিল—আমার পক্ষে তোমাদের দুজনের কথাতেই কোন কথা বলা শক্ত, কারণ জীবনে একবার আমাস ... এ একটা অবস্থায় পড়্‌তে হয়েছিল, যে সাহস করে তোমার মত একবারে আ...ার অস্তিত্ব নাই এ কথা বল্‌তে পারিনি, আবার—

পরেশের মু... উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে আগ্রহের সহিত বলিল—তা হলে তুমি নিজে দেখেছ কিছু নিশ্চ... ...য়! নয় কি?

নলিন বলিল—হ্যাঁ দেখেছি! ...ন্তু সেটা যে কি ব্যাপার—তা আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি না, কাজেই জোর ক... ...র নেই বল্‌তেও পারিনি—অথচ ঠিক যে আছে বলে বিশ্বাস করি তাও নয়। ...ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম, শোন তোমরা— ... এলাহাবাদে

আমি এলাহাবাদে মামার বাসায় থেকে কলেজে পড়্‌তুম মনে আছে। যে বছর প্রথম প্লেগ আরম্ভ হল, সেকথা বোধ হয় তোমাদের ...দখ্‌তে অল্প সে যে কি ভীষণ মড়ক—না দেখ্‌লে বোঝান যায় না। দেখ্‌তে ... প্রথমটা কয়েকদিনের ভিতর এমন উৎকট ভাবে চার দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল, ...াক কূল সকলে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। কি কর্‌বে—কোথায় যাবে—... পড়্‌ছে, কিনারা পায় না। এক এক বাড়ীতে চার জন পাঁচ জন করে জ্বরে ... পথে দু ঘণ্টা-তিন ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ! পাড়ায় পাড়ায় কেবল কান্নার রোল। ...তার চারদিকে হরিবোল—রাম নাম সত্য হ্যায়—এই শব্দ। দু দশদিন চল্‌ল— ...ীতে পরে এমন অবস্থা, সৎকার কর্‌বার আর কেউ লোক রইলো না—বা... ...ারে বাড়ীতে পরিবার শুদ্ধ লোক মরে পড়ে আছে—পথের উপর, নর্দ্দামার ... ...াড়ী শব গড়াগড়ি যাচ্ছে—পুলিশের লোকে, মিউনিসিপ্যালিটির লোকে গরুর গ... এই করে লাস তুলে বোঝাই করেও সহর পরিষ্কার রাখ্‌তে পাচ্ছে না—... ...ায় অবস্থায় সহরের তিন ভাগ লোক মরে গেল। যারা বাঁচলো, তারা কে কো... ...কে পালালো! সেই ভীষণ মড়ক গরমের হাওয়া পড়্‌তে যখন একটু কমের দি... এলো—তখন সকলে মাথা স্থির করে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাব্‌তে লাগ... ...ীত যাতে এমন ভয়ানক কাণ্ড আর না হতে পারে। গবর্ণমেণ্ট থেকে ... ...হতে পড়্‌বার আগেই সমস্ত সহর ফাঁকা জায়গায় তুলে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত ... ...হতে ...াগলো—মিউনিসিপ্যালিটি, সহরে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ক...

সুরু করলে—আমরা যত সব ছেলেরা মিলে 'সেবক সমিতি' নাম দিয়ে একটা দল গড়ে তুললুম! আমাদের কাজ হলো—যাদের দেখ্‌বার বা সেবা কর্‌বার লোকের অভাব—তাদের সেবা করা। যাদের সৎকার কর্‌বার লোকের অভাব—তাদের সৎকার করা। প্রথমবার সহরের যে অবস্থা দেখেছিলুম, আর যাতে তার পুনরভিনয় না হয়, তারই চেষ্টা করা ছিল আমাদের লক্ষ্য।

দু চার বছরের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে শীতকালে প্লেগের প্রকোপ ক্রমেই কমে আস্‌তে লাগ্‌লো—আমাদের সেবক সমিতির কাজ কিন্তু সমানই থেকে গেল। এলাহাবাদে প্রায় সকলেই চাকরী উপলক্ষ্যে বাস কর্‌তে গেছে। নিজে, স্ত্রী আর দু চারটি ছেলে মেয়ে এই নিয়েই বেশীর ভাগ লোকের সংসার, তার মধ্যে যদি বাড়ীর কর্ত্তার বা তাঁর স্ত্রীর অসুখ হলো—তা হলে দেখ্‌বার লোক আর কেউ থাকে না। আগে এ ক্ষেত্রে কি হ'ত জানি না, আমাদের দলের কাজ কর্ম্ম দেখে সহরের বাঙ্গালী পরিবারে এমন একটা ভাব দাঁড়ালো—যেন সেবা করার ভারটা আমাদেরই একচেটে! কারু বাড়ী কিছু হলেই তাঁরা আমাদের সমিতিতে খবর দিয়েই নিজেদের দায়মুক্ত ভাব্‌তেন। আমরাও তখন পরোপকারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কাজেই খবর পাওয়া মাত্র গিয়ে হাজির হতুম, তার পরে নিজেরা পালা করে রাত জাগা—সেবা করা—রোগীর মৃত্যু হলে তার শেষকৃত্য সম্পাদন পর্য্যন্ত সবই আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের পক্ষ থেকে এ সব কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হ'ত না।

একদিন সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে খেতে বসেছি, এমন সময় সমিতি থেকে একখানা চিঠি পেলুম। চারু লিখেছে—শাহগঞ্জের নেপালবাবুর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অসুখ। সে ডাক্তার নিয়ে সেখানে যাচ্ছে, আমি যেন চিঠি পাওয়া মাত্র সেখানে যাই—আজ রাত্রে নেপালবাবুর বাড়ী থাকবার আমাদের দুজনের পালা পড়েছে।

নেপালাববুকে আমি চিন্‌তুম। উপস্থিত সময়ে তাঁর বাসায় তিনি নিজে, আর তাঁর বয়স্থা বিধবা ভগ্নী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁর একমাত্র ছেলে বিদেশে কাজ করে। সম্প্রতি সে এসে তার স্ত্রী পুত্রকে কর্ম্মস্থলে নিয়ে গেছে, এ খবর দিন চার পাঁচ আগে নেপালবাবুর কাছেই পেয়েছি। এর মধ্যে তাঁর কি এমন অসুখ হলো!

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সব সেরে তাঁর বাড়ী যখন পৌছলুম—তখন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে দেখ্‌ছেন, চারু কাছে দাঁড়িয়েছিল, তার কাছে শুনলুম—

হঠাৎ পড়ে গিয়ে নেপাল বাবু অজ্ঞান হয়ে যান—তার পর থেকে আর জ্ঞান হয়নি, দিনের বেলা এই ভাবেই কেটেছে, সন্ধ্যের সময় সে খবর পেয়ে এই মাত্র ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছে।

ডাক্তারবাবু বাইরে এসে বল্‌লেন—মাথায় পক্ষাঘাত, জীবনের কোন আশা নেই—আজ রাত্রিশেষেও মৃত্যু হতে পারে, কিংবা এই অবস্থায় আরো দু এক দিন কাটাও অসম্ভব নয়।

তিনি ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলে চারু বল্‌লে—আমি একবার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসি, ও আস্‌বার সময় ওষুধ নিয়ে আস্‌বো, তুমি এখানে থাক—প্রথম রাতটা তুমিই থেকো, আমি শেষের দিকটায় জাগ্‌বো।

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। নেপাল বাবুর সঙ্গে অনেক দিন থেকেই পরিচয় ছিল—তাঁর ছেলের সঙ্গে কত দিন এসে এঁদের কাছে কত উৎপাত করেছি—নিরীহ সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ নিজের ছেলের মতই আমাদের ভালবাসতেন, আজ তাঁর এই পরিণাম!

চারু চলে যাবার পর উপরে গিয়ে দেখি—পিসীমা রোগীর মাথার কাছে বসে। আমায় দেখেই আগ্রহের সহিত বল্‌লেন—ডাক্তার কি বল্‌লে বাবা?

আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম! কি বল্‌বো! ঘরের মাঝখানে খাটের উপর নেপাল বাবু শুয়েছিলেন। একবার তাঁর দিকে চাইলুম—কোন চৈতন্য নেই। দুই চোখ মুদ্রিত। নিশ্বাস খুব দ্রুত পড়্‌ছে! অবস্থা খুবই খারাপ!

পিসীমা উত্তরের আশায় চেয়েছিলেন, আমি একটু মাথা চুল্‌কে একটু ভেবে বল্‌লুম—বিশেষ কিছু বলেননি পিসীমা! তবে অসুখটা একটু বাঁকা রকম বলে বোধ হচ্ছে—তাই—

সে আমি সবই বুঝ্‌তে পার্‌ছি! বলে, পিসীমা সশব্দে নাক ঝাড়্‌লেন, তারপর আঁচলে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—আজ কদিন থেকেই চারদিকে যে সব অলক্ষণ হতে আরম্ভ হয়েছে—আমি ত ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি! বলি না জানি কি না কপালে আছে। রাতে ভিতে বেরোতে পারিনি। গা ছম্‌ ছম্‌ করে, এ ঘর ও ঘর কর্‌তে গা যেন ভারি হয়ে ওঠে, আর পোড়া দাঁড়কাকেরি বা কি আস্পদ্ধা বেড়েছে! দিবে রাত্তির মাথার উপর খা-খা করে ডেকে ডেকে মচ্ছে! তখুনি আমি জানি—একটা কাণ্ড ঘটবেই—তা হ্যাঁ বাবা! ডাক্তার কি বুঝে গেল? আর কি দাদার জ্ঞান চৈতন্য হবার আশা নেই?

আমি বল্‌লুম—ওঁর মাথায় পক্ষাঘাত হয়েছে পিসীমা—অসুখটা বড় শক্ত

রকম। তবে আমাদের যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। চেষ্টা ত করতে হবে? চারু ওষুধ আনতে গেছে—আজ রাতভোর পালা করে জেগে এঁকে তদ্বির করে দেখ্‌তে হবে। তারপর বরাতের কথা কিছু বলা যায় না।

তাই দেখ বাবা! যদি কিছু করতে পার! আমার ত আর হাত পা আস্‌ছে না! বলে পিসীমা কিছুক্ষণ সজলনেত্রে নেপাল বাবুর অচৈতন্য মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন। আমার যেদিন কপাল পুড়্‌লো, পাঁচ পাঁচটা অপোগণ্ড নিয়ে যেদিন পথে দাঁড়ালুম, সেদিন দাদা গিয়েই আমায় বাঁচালেন, তারপর থেকে তাঁর আশ্রয়ে এতদিন নির্ভাবনায় কাট্‌লো, কোন দিন কোন দুঃখ পাই নি, আজ সেই দাদা চলে যাচ্ছেন—আমি কিনা বসে বসে তাই দেখ্‌ছি! কি পোড়া কপাল রে!—পিসীমার কান্না উচ্ছ্বসিত হবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—এখানে বসে কাঁদ্‌বেন না পিসীমা! যদি ওঁর ভিতরে জ্ঞান থাকে, তা হলে বড় কষ্ট পাবেন।

কাঁদ্‌ছি আর কই রে বাবা! বলিয়া পিসীমা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রাত দশটার পর চারু ফিরে এল। একবার ওষুধ খাইয়ে দিয়ে সে পাশের ঘরে শুতে চলে গেলে আমি রোগীর মাথার কাছে জেগে বসে রইলুম। সন্ধ্যে থেকেই মেঘ করেছিল—এখন জোরে হাওয়া উঠে বৃষ্টি সুরু হলো।

উত্তরের হাওয়াটা বড় খারাপ! এ দুয়োরটা বন্ধ করা থাক—দাদার গায়ে না লাগে! বলে পিসীমা আবার ঘরে ঢুক্‌লেন। উত্তর দিকের বারাণ্ডার দিকে একটা মোটা চটের পর্দ্দা ফেলা ছিল, তবু পিসীমা দরজাটি বন্ধ করে বিছানায় বসে বল্‌লেন—ঘরে গিয়ে টেঁক্‌তে পার্‌ছি না বাছা! প্রাণ যেন আন্‌ চান্‌ কর্‌ছে! পোড়া চোখে আর ঘুম আসে না—যত সব পুরোণ কথাই মনে হচ্ছে। তা তুমি একলাটি বসে আছ—তোমার কিছু ভয় হচ্ছে না?

আমি বল্লুম—নাঃ ভয় আর কিসের?

পিসীমা পানের ডিবে থেকে দুটো পান নিয়ে আমায় দিয়ে বল্‌লেন—তা ভয় হয় বৈকি! এমন একটা রুগী ঘরে থাকলে—ওরা সব আনাগোনা করে কিনা—তা দিনক্ষণ যার যে টুকু আছে, সে টুকু না ফুরোলে ত নেবার যো নেই! হয় ত আমাদের আশ পাশেই ঘুর্‌ছে সব—দৈবি সৈবি কারু চোখে পড়ে গেল! এই কাল ভোর রাতে কি আমি কম ভয়টা পেয়েছিলুম?

পিসীমার সঙ্গে কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে তিনি রোগীর ঘরে বসে অনর্গল বক্‌বেন সেই জন্য আমি তাঁর সঙ্গে বেশী কথা বলিনি, তবে এ কথাটা শুনে কি ব্যাপার জান্‌তে একটু কৌতূহল হ'ল। বল্লুম—কি ভয় পেয়েছেন পিসীমা ?

পিসীমা বল্লেন—তোমরা হলে সেইখানে অজ্ঞান হয়ে যেতে। এই আমাদের বউ—অরুণকে ছমাসের রেখে মারা যায়—শুনেছ ত ? তা এমন সব অল্প বয়সে সাজান সংসার ফেলে যে সব মেয়েরা মরে তাদের কি আর গতি হয় ? তারা যতদিন না তাদের সোয়ামিকে ফিরে পায়—ততদিন আনাচে কানাচে সিঁদুরচুপড়ি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ মায়ার বাঁধন কি সহজে কাটান যায় গা ? এই ত আমাদের বউকে কত দিন লোকে মাঝ রাতে ছাতে সিঁড়ীতে ঘরে ঘুর্‌তে দেখেছে। তবে আমি এর আগে কোন দিন দেখিনি।

পিসীমা খানিক চুপ করে রইলেন—তার পরে চুপি চুপি বল্লেন—বল্‌লে না পেত্যয় যাবে বাছা ! ভোরের দিকে এতদিন পরে বউকে কাল স্বপন দেখলুম ঠিক যেন সে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে ! টক্‌টকে লাল পাড়ের সাড়ী পরা, সিঁথেয় এতখানি চওড়া সিঁদূর, পায়ে আল্‌তা রগ্‌রগ্‌ কচ্ছে ! চম্‌কে উঠে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, গোবিন্দ মধুসূদন ! বলে চোখ রগ্‌ড়ে দেখি ! ওমা তখনো সে ঠিক সাম্‌নের দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! আমি ত বাছা ! একবারে কাঠ হয়ে গেছি ! সেদিক থেকে যে চোখ ফিরিয়ে নেব, কি কারুকে ডাক্‌বো—এমন ক্ষ্যামতাটি আর আমার নেই ! অবাক্‌ হয়ে সেইদিকে চেয়ে আছি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল ! তারপর দিনই দাদা যখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন, আমি তখনি জানি—এ যাত্রা আর দাদার রক্ষে নেই !

আমি বল্লুম কেন পিসীমা ?

এ আর বুঝ্‌তে পার না ? পিসীমা অবাক্‌ হয়ে বল্লেন—কি বোকা ছেলে গো ! এ তো জানাই কথা ! এবার সে দাদাকে নিতে এসেছে ! ঘুর্‌ছে আশে পাশে, সময়টা হবে আর সঙ্গে করে নিয়ে যাবে !

পিসীমা নিজের মনে আরো এম্‌নি অবান্তর কত কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, আমি তাঁর কথায় বিশেষ মন না দিয়ে রোগীর দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলুম, তবে তাঁর একটা কথা বার বার ঘুরে ফিরে আমার মনে পড়্‌ছিলো।

এই ঘরের যে তরুণী বধূটি একদিন তার অসম্পূর্ণ জীবনের খেলা ফেলে রেখে কোন অজানা লোকে চলে গিয়ে ছিল, সে এই দীর্ঘকাল তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার প্রিয়ের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে, এবং আজ মৃত্যুর স্পর্শে তাদের মিলন নিশ্চিত জেনে সে উল্লাসে ও অধীর আগ্রহে এই ঘরের চারদিকে সেই মিলনের সন্ধিক্ষণটির আশায় আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পিসীমার এই কল্পনাটি আমার কাছে বড় মধুর, বড় করুণ বলে মনে হচ্ছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজ্‌লো। সেই শব্দে চকিত হয়ে আমি নেপাল বাবুর মুখের দিকে চাইলুম। তাঁর সেই একই ভাব—কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, কেবল তাঁর নিশ্বাসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ছিলে, আর মাঝে মাঝে গলার ভিতর থেকে ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে একটা শব্দ হচ্ছিল।

বাইরের দুর্য্যোগ ক্রমেই বেড়ে উঠলে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার—নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ঝড়ের সন্‌ সন্‌ শব্দ ও মুষল ধারে বৃষ্টির ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দের সঙ্গে মিশে একটা প্রলয় কাণ্ডের সুচনা সুরু করে দিয়েছিল। ঘরের বন্ধ দরজা জানালা গুলো ঝড়ের বেগে ঠক্‌ ঠক্‌-ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠ্‌ছে, যেন বাইরে থেকে কে প্রবল বলে সে গুলো ভেঙ্গে ফেল্‌বার জন্য প্রচণ্ড ধাক্কা ধাক্কি আরম্ভ করেছে!

হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে কড়-কড়-কড়াৎ-শব্দে একটা ভীষণ বজ্রপাত হলো! সেই শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে আমার মনে হলো—উত্তর দিকের বন্ধ দরজটা কে যেন বাহির থেকে ঠেল্‌ছে!

একটা আকস্মিক ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌লো! কাণ পেতে স্থির হয়ে শুন্‌লুম—সত্যিই একটা শব্দ হচ্ছে! টক্‌ ঠক্‌ টক্‌! কি এ কিসে শব্দ? ঝ ড় যেমন জানালা দরজা কাঁপছে—এ তো সে শব্দ নয়?

দু হাতে চোখ রগ্‌ড়ে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম! কোণে একটি পিতলের পিলসুজের উপর একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছিল—সেই স্তিমিত মৃদু আলোয় দেওয়ালের গায়ে আমার নিজের ছায়াটা দীর্ঘতর দেখাচ্ছে! ঘরের মেঝের উপর আঁচলটা পেতে পিসীমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চারু অন্য দিককার ঘরে ঘুমোচ্ছে—এদিকে আর কেউ কোথাও নেই! তবে এ কিসের শব্দ?

ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ প্রবল হয়ে উঠলো—বাইরে কোথায় যেন খানিকটা

দেওয়াল কি ছাদের কার্ণিস হুড় মুড় করে ভেঙ্গে পড়্‌লো! তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উত্তরের বারাণ্ডার দরজায় সেই শব্দ—ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌!

আমার সর্ব্ব শরীর ঘামে ভিজে গেল! স্পষ্ট বোধ হলো—কেউ যেন ঘরের ভিতরে আস্‌বার জন্য বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে!

অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা আমার মনে জেগে উঠ্‌লো! মনে হ'ল—কে একটি স্ত্রীলোক বন্ধ দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে—আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম—চওড়া লাল পাড়ের সাড়ী তার পরা, সিঁথের সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখা দপ্‌ দপ্‌ কর্‌ছে! মুখে তার একটা আকুল আগ্রহের ভাব!

আমার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হয়ে হিম হয়ে এলো! চেঁচিয়ে চারুকে ডাক্‌বো মনে কর্‌লুম—গলা একবারে রুদ্ধ—কোন শব্দ বেরোল না। বোধ হলো—যেন ঘরে বিছানার চার পাশে কারা সব বেড়াচ্ছে!

আসন্নমৃত্যু রোগীর বিছানার পাশে কতদিন একা রাতভোর জেগে কাটিয়েছি, কোন দিন এমন ভয় পাই নি, এ সব কথা নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামিয়েছি বলেও মনে হয় না—কিন্তু সেদিন যে রকম ভয় পেয়েছিলুম, জীবনে কোন দিন তা ভুল্‌তে পার্‌বো না!

মুমূর্ষুর অন্তিমশ্বাস ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠ্‌ছিল! আমার আশ পাশে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের অস্পষ্ট কথা কি সব কানাকানি আমার চোখে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে! আমার দেহের রক্ত চলাচল আতঙ্কে বন্ধ হয়ে আস্‌ছে! মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করে শব্দ হচ্ছে! নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসে সমস্ত শরীর টল্‌মল করে কেঁপে উঠ্‌ছে।

কি একটা শব্দে চকিত হয়ে উঠে আমি নেপাল বাবুর মুখের দিকে চাইলুম! তাঁর তখন দুই চোখের তারা স্থির হয়ে এসেছে! গলার ভিতর ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে একটা বিকট শব্দ হচ্ছে!

সেই সময় একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় উত্তরের বারাণ্ডার পচা খিল্‌টা ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ভেঙ্গে পড়্‌লো!

সেই খোলা দরজা দিয়ে লাল পাড়ের সাড়ী পরা একটি মেয়ে ধীর পদে এসে নেপাল বাবুর শিয়রে দাঁড়ালো! তার কপালে চওড়া সিঁদুর—পায়ে টক্‌টকে লাল আল্‌তা!

সেই মুহূর্ত্তে নেপাল বাবুর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার থর থর করে কেঁপে উঠে তখুনি সব স্থির হয়ে গেল!

আমি অস্ফুট কণ্ঠে 'চারু'! বলে ডেকে সেই খানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম!

জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি—ভোরের আলোয় ঘর ভরে গেছে। বাইরের বারাণ্ডা থেকে পিসীমার উচ্চ বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। নেপাল বাবুর মৃত দেহের পাশে চারু একা বসে আছে!

নলিনের বলা শেষ হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর পরেশ সহসা বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল এইবার বিশ্বাস হয়েছে ত? ভারি যে চাক্ষুষ প্রমাণের দোহাই পেড়ে বড়াই কর্‌ছিলে, এর চেয়ে বিশ্বাস্য আর অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে? এখন এ ব্যাপারটাকে কি বোলে ব্যাখ্যা কর্‌বে—শুনি?

নির্ম্মল মৃদু হাসিয়া বলিল—এর মধ্যে ব্যাখ্যা কর্‌বার তো কিছুই দেখ্‌ছি না, তবে যা ঘটেছিল—সেটির মধ্যে প্রধান হচ্ছে নলিনের মনের আতঙ্ক—সেই দুর্য্যোগের মধ্যে নিশীথ রাতে ঐ রকম রোগীর কাছে একা বসে থাকৃতে থাকৃতে পিসীমার বর্ণিত বিষয়গুলি ওর মাথায় বেশ কাজ করেছিল। ও যে শব্দটাকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে বলে ভয় পেয়েছিল, সেটা শুধু পর্দ্দার ঠক্ ঠক্ শব্দ! ঝড়ের বেগে ভারি পর্দ্দাটা দুলে দুলে উঠে আবার দেওয়ালের বা কপাটের গায়ে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছিলো, তাতেই ও রকম একটা শব্দ হচ্ছিল! ভয় পেলে আমাদের মনটা তখন এমন চঞ্চল হয়ে উঠে, যে এ সব খুঁটি নাটি ব্যাপার তখন বিচার করে দেখ্‌বার মত অবস্থা থাকে না। আর সেটাকে চাক্ষুষ প্রমাণ বলে তুমি চালাবার চেষ্টা কর্‌ছো, সেটার পক্ষেও এই কথা বলা যায়। খুব বেশী ভয় পেলে বা কোন বিষয় অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা কর্‌লে মানুষ অনেক সময় যে ভয়ের বা চিন্তার মূলীভূত বিষয়টি স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় ও প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়, এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। কি বলো হে নলিন? তোমার কি মনে হয়?

নলিন মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—খুব সম্ভব!

গ্রেপ্তার

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্যাচার্য্য।

শীতকালের সন্ধ্যেবেলা!

উত্তর দিকের জানালাটা খোলা! তার ভেতর দিয়ে হু হু করে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস্ আস্‌ছে—তাতে হাড়ের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে যায়!

আরাম কেদারাটায় বসে বসে রতনের দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল! মোটা কম্বলটা আগাগোড়' মুড়ি দিয়েও শীত তার ভাঙ্গছিল না! কিন্তু শীতের চেয়েও আর একটা ভাবনা তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে তুল্‌ছিল—যে ভাবনাটা আজ দুটী বছর ধরে তার ঘাড়ে ভুতের মত চেপে বসে' চোখের কোলে তার কালি পড়িয়ে দিয়েছে!

দু বছর আগে ঠিক এমনি একশীতের রাতে, মরিয়া হয়ে সে লাফিয়ে পড়েছিল—ট্রেণের জানলা গলে, অসীম এক তেপান্তরের মাঠে! তারপর জ্ঞানহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুট! ছুট! কত ঝোপ জঙ্গল কাঁটা গাছে পা তার ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিছিল! সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না! তারপর যখন গ্রামে ঢুকে এই বাড়ীটায় আশ্রয় পেলে তখন তার দুচোখ থেকে অশ্রু আর থামে নি—সে কথাটা এখনও তার মনে জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে!

গৃহস্বামী রঘুমুচির উদার-প্রাণতায় সে গলে গেল। মানুষের প্রাণ যে কত সুন্দর হতে পারে তা সে এই প্রথম দেখ্‌লে! প্রথমটা সে তার পরিচয় দিতে ভরসা করেনি! কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্‌ল ততই তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগ্‌ল। অনুতাপের আগুনে মনটা তার পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে বুঝি! শেষকালে থাকৃতে না পেরে একদিন সে রঘুর কাছে প্রকাশ কর্‌লে—নোট জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তাকে বিচারের জন্য সহরে পাঠান হচ্ছিল—কিন্তু সে পলাতক আসামী!

পরিচয় পেয়ে, রঘুর মনে কিন্তু একটুও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নি! যে শুধু আকাশের দিকে একবার হাত তুলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বল্‌লে।

তারপর পরের দিন তাকে নিজের কাজে লাগিয়ে দিয়ে, হাসিমুখে উৎসাহ দিতে লাগ্‌ল—এবং আগের মতই সদয় ব্যবহার করে যেতে লাগ্‌ল।

তারপর ছ বছর কেটে গেছে।

সমস্ত ঘটনাটা একে একে বায়স্কোপের ছবির মত তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঠাণ্ডায় তার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে! কিন্তু উঠে গিয়ে জান্‌লাটা বন্ধ করে দেবার শক্তিটাও যেন আজ তার নেই!

বাইরে রুদ্র-প্রকৃতির ভীষণ দৌরাত্ম্য চল্‌ছিল! সমস্ত জগৎটা নৈশ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন—শীতের দারুণ প্রকোপে নিঃস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে! জীবনের চিহ্ন যেন আজ ধরণীর বুক থেকে ধুয়ে মুছে গেছে!

বাইরের একটা কাজ সেরে ঘরে ঢুকেপড়ে রঘু বল্‌লে—দিন দিন হচ্ছিস্ কি বল্ দেখি! —জান্‌লাটাও বন্ধ কর্‌তে পারিসনি?

দূরের বাঁশবনের কাছে কি একটা খস্ খস্ শব্দ হল। রতনের পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে উঠ্‌ল। ভয়ে সে অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌ল!

—নাঃ ভয়েই তুই মারা যাবি দেখ্‌ছি। এত ভাব্‌লে মানুষ বাঁচে কি করে বল্ দেখি! ছ বছরের মধ্যে একটা দিনও দেখ্‌লুম না যে তোর মনটা হাল্কা হয়ে আছে! পুলিশ কি বাড়ীর পাশে বাসা বেঁধেছে নাকি রে!—বলে রঘু রতনের পিঠে হাত বুলোতে লাগ্‌ল!

হঠাৎ মাঠের পথে যেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাওয়া গেল। রতনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে হল যেন পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা শোধ কর্‌বার আজকেই তার শেষ দিন। জীবনের ভার আজ যেন তার কাছে হাল্কা হয়ে আস্‌ছে!

বন্ধ দুয়ারে ঘা পড়্‌ল—বাড়ীতে কে আছ?

হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরটা অসীম শূন্যতায় ভরে উঠ্‌ল! নিষ্কম্প দৃষ্টিতে রঘু দেখ্‌লে—রতনের মুখটা মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে—যেন তাতে আর এক ফোঁটাও রক্ত নেই!

সে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে তক্‌মাআঁটা পুলিশকনেষ্টবল সঙ্গে দারোগা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়্‌ল। তারপর রতনের দিকে চোখ পড়্‌তেই দারোগা বল্‌লে—তাইত বলি বাছাধন—আজ পাঁচ বছর ধরে আমাদের কি নাকালটাই দিচ্ছ—সব

'বিকলে যাবে! মনে করো না যে দাড়ী রেখেছ বলে তোমায় চেন্‌বার কিছু কষ্ট হচ্ছে।

রঘুর মনে কি রকম একটা সন্দেহ উপস্থিত হল। সে আবেগের সহিত তীব্রস্বরে বলে উঠল—কিন্তু কোন্‌ অপরাধে আপনি আমার নির্দ্দোষী ভাইকে গ্রেপ্তার কর্‌তে এসেছেন দারোগাবাবু!

—কোন্‌ অপরাধে! কচি খোকা আর কি! স্ত্রীকে খুন করে আজ পাঁচ্‌টা বছর ধরে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—আর বলে কিনা কোন্‌ অপরাধে!—রামশিং! হাতকড়ি লাগাও!

রঘুর নির্ব্বাক বিস্ময়দৃষ্টির সাম্‌নে কনেষ্টবল রতনের রক্তহীন তুষারশীতল হস্তে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। *

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্ম্মল প্রাণে পৌছায় আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগ্‌ল।

"মেঘ-মল্লার"

---

* কোন ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

সংসার

—শ্রীমিনতি দেবী।

ওগো, তুমি আজ দূরে, দূরে, কতদূরে! আমার বিজয়ার প্রণাম সহস্র সহস্র মাইল দূরে তোমার চরণে পাঠাচ্ছি। মন আজ এত খারাপ লাগ্‌ছে কেন জানিনা, সন্ধ্যে থেকে যেন কান্নায় গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে। চারিদিকে আজ বিদায়ের সুর বাজ্‌ছে। বিজয়ার বাঁশী করুণসুরে বেজে বেজে থেমে গেছে। তার শেষ রেশটুকু কেঁপে কেঁপে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। সারা সহরটা যেন আজ ব্যাথার ভারে মুষ্‌ড়ে পড়েছে! জনহীন রাস্তার মাঝে মাঝে দু'একটা ভাড়াটে গাড়ী তার কর্ম্মক্লান্ত ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ঠক্, ঠক্ ঠক্! তার পায়ের শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দশমীর চাঁদ বিশাল আকাশে পাড়িদেবার জন্য হাসিমুখে তার আলোর আঁচল উড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে বকের ঝাঁক কোথায় কোন্ অজানার উদ্দেশে উড়ে চলেছে। কি নীরব কি জনহীন আজ এই কোলাহলমুখরিত সহরটা! সত্যি! মনটাকে যেন কিছুতেই আজ আমি বশে আন্‌তে পার্‌ছি না। কি করি বলত? কোন কাজ নেই। এই কর্ম্মহীন জীবনটা যেন অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। পড়াশুনা ছিল যতদিন, দিন এক রকমে চলে যেত। এখন যেন আমার আর দিন কাটেনা! সত্যি এত খারাপ লাগে!—তুমি ত বেশ সাগর পারের অতিথি হ'য়ে আছ।

গলির উপরের ছোট্ট ঘরখানি আমার। দিন কাটে কখনও গানে, কখনও বাজিয়ে কখনও বা রাস্তার ধারের জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থেকে। সাম্‌নের ছোট বাড়ীটাতে এক স্কুল মাষ্টার থাকেন। সংসারটি তাঁর ছোট। স্ত্রীটি যেন একটি নির্ম্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখ, পরনে লালপেড়ে শাড়ী। ছোট্ট সংসারের, ছোট্ট গিন্নী হয়ে, সারাদিন মনের আনন্দে সংসারের কাজ ক'রে বেড়ায়। ধনী বাপের একটিমাত্র আদুরে মেয়ে, স্কুলের পড়া শেষ ক'রে অনেক ধনী-দুলালকে প্রত্যাখ্যান ক'রে এই গরীবের গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে আসে, সকলের অমতে। বাপের রাগ মায়ের অশ্রুজল

কিছুই তাকে টলাতে পারেনি। শত কাজের মধ্যেও মুখের হাসি আর গানের সুরকে এ ভুলতে পারেনি। খোকা খুকীকে কাপড় পরাতে পরাতে রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে তার গানের সুর ভেসে আসে। সারাদিন যেন প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বেড়ায়। দুপুরে স্বামী বেরিয়ে গেলে, কখনও সেলাই করে, কখনও ছেলেমেয়ের জামায় সাবান দেয়, কখনও বা ঘর দুয়ার ঝাড়তে থাকে। মেয়েটি চার বছরের, আট মাসের ভাইটিকে খেলা দেয়। রান্না করতে করতে এসে মা ছোট ছেলেটিকে বুকে নিয়ে আদর ক'রে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দোল্‌নায় শুইয়ে দিয়ে চলে যায়, তার স্বামীর স্নানের তেল, কাপড়, সব এগিয়ে দিতে। খুকী জান্‌লায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে, আর আপন মনে মায়ের কাছে শেখাদুচারিটী গানের লাইন মিষ্টি সুরে গায়। তার কোঁকড়া চুলের গোছা সুন্দর মুখখানির আশেপাশে বাতাসে দুলে দুলে ওঠে। মায়ের স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে 'অনু—মা! অত চেঁচিয়ো না, খোকা উঠে পড়বে।' মেয়েটি উত্তর দেয় 'না মা, আমিত ভাইটিকে ওঠাচ্ছিনা।'—সত্যি! কি সুখী পরিবার! দেখলে হিংসা হয়।

সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা, সারাদিন বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ, ঝম্, ঝম্, ঝম্।—মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস দুরন্ত শিশুর মত ঘরে ঢুকে সব এলো মেলো ক'রে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বৃষ্টির ছাঁট্ এসে ঘরটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। খুব দূর থেকে একটা বাঁশীর মেঠো সুর ভেসে আস্‌ছিল, বাতাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনটা আমার কি যেন এক অবসাদে নুয়ে পড্‌ছিল, কোন কাজে লাগ্‌ছিল না। এস্‌রাজটা হাতে নিয়ে জানালায় বস্‌লুম। সেই বাদল-সন্ধ্যায় তার সুর পর্দ্দায় পর্দ্দায় বারিধারার সঙ্গে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। জানি না কতক্ষণ আমি বিভোর হ'য়ে বাজিয়েছিলুম। যখন বাজনা থামিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে তার সেই অবিরল অশ্রুবর্ষণ দেখ্‌ছিলুম, তখন শুন্‌তে পেলুম কে যেন ডাক্‌ছে, "মা! কতক্ষণ আর এখানে বসে থাক্‌বে? বাবা যে অনেকক্ষণ এসেছেন।" তখন আমার দৃষ্টি সেই বাড়ীর জানালার উপর পড়্‌ল। বোধ হয় মেয়েটি আমার বাজনার সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে জানালায় এসেছিল। যাবার আগে আমার দিকে একবার ব্যাথাভরা চোখে তাকিয়ে সে তার কাজে চলে গেল। জানি না সে আমায় কি ভেবেছিল। তারপর থেকে প্রায়ই দেখি সে এসে আমার ঘরের সাম্‌নের জানালায় দাঁড়ায়, আর সহানুভূতি-ভরা চোখে আমার দিকে তাকায়।

*　　　*　　　*

তোমার সব চিঠিগুলিই পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি। ওগো বল্‌তে পার, জেনেও কেন মানুষ সব জান্‌তে পারে না? সব বুঝেও সে কেন সব বুঝ্‌তে চায় না। সে কি জানে না, মানুষ এপারে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পরপারে যাবার ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। তবে কেন সে এমন অস্থির হয়? কি ভ্রান্তি দিয়ে বিধাতা এই অবোধ, অজ্ঞ মানুষকে ঢেকে রেখেছেন। তিনি সত্য স্বরূপ হ'য়েও মিথ্যাকে এত ভালবাসেন? তাঁঃ সৃষ্টিকে খালি মায়া ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে ইচ্ছা হয় না। আজ যাকে আনন্দের মূর্ত্তি মনে করি, কাল তাকে মূর্ত্তিমতী বিষাদ ছাড়া আর কিছুই দেখিনা। এত মিথ্যার উপর এত ধ্বংসের উপর তাঁর রাজ্য স্থাপিত তা জেনেও কেন জানি না, বুঝেও কেন বুঝ্‌তে চাই না। হঠাৎ সেদিন রাত্রে তাদের বাড়ীর গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি যে হয়েছে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—লোকজনের আনাগোনায় বুঝ্‌লুম কাহার কিছু অসুখ হয়েছে। ভোর বেলায় কান্নাকাটিতে চম্‌কে উঠ্‌লুম। খবর নিয়ে জান্‌লুম মেয়েটি হঠাৎ কলেরাতে কয়েক ঘণ্টার ভিতর মারা গেল। উঃ! সে যে কি দৃশ্য তা বলা যায় না। স্বামী কিন্তু স্থির নির্ব্বাক! তার মা বাবাও এসেছিলেন, সেকি কান্না তাঁদের। সিঁদুর-আলতায় ফুলে চন্দনে নববধুর মত সেজে গুজে আনন্দের মূর্ত্তিটি বাঁশের চতুর্দ্দোলায় চড়ে মহাকালের পথে চলে গেল।

আজ কদিন হ'ল তার স্বামী ও চলে গেছেন ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে দেশে তাঁর মার কাছে।

আনন্দ-পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ছোট বাড়ীটা আজ খালি, চারিদিক খাঁ খাঁ কর্‌ছে। তার খোলা দুয়ার জানালাগুলো বাতাসে হা হা ক'রে এসে আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে। একদিন যেটা ছিল পূর্ণ, আজ সেটা শূন্য। একদিন যেখানে ছিল আনন্দ, আজ সেখানে নিরানন্দ।

একদিন যেটা ছিল স্নেহের আশ্রয়, আজ সেটা শ্মশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে কতকগুলি হাসি মুখ ঘুরে বেড়াত, সেখানে আজ পেঁচা আর চাম্‌চিকের আড্ডা। মেয়েটির সুন্দর হাসিমাখা মুখখানি আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছিনা। কি নিষ্ঠুর খেলাটাই খেল্‌লেন বিধাতা এদের উপর দিয়ে! ওদের নিত্যিকার সংসারের সঙ্গে আমার যেন অনেক খানি জড়িয়ে ছিল। ওদের বাড়ীর দিকে আমি তাকাতে পার্‌ছি না। তাই ওদের দিকের জান্‌লাটাকে আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি। বিধাতার এ খেলা, এ উপহাস, সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না। এই কি সংসার—?



পান্থবীণা

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

পরদিন বেলা তখন দ্বি-প্রহর।

আহারাদির পর বংশী কোথাও বাহির হইয়া যায় নাই, তাহার ঘরের ভিতর বিছানায় শুইয়া কি একটা বই খুলিয়া সবেমাত্র পড়িতে সুরু করিয়াছিল। গায়ত্রী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিল, পড়ে' দ্যাখ্ কি লিখ্‌ছে।

বংশী বইখানা বন্ধ করিয়া দিয়া মনে মনে চিঠিখানা পড়িয়া ঈষৎ হাসিল। পুনরায় সেখানি গায়ত্রীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া সে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

গায়ত্রী বলিল, হাস্‌ছিস যে? যাবি না?—

না।

কেন? তোকে যাবার জন্যে লিখেছে যে?

কি লিখেছে আর একবার পড়ে' শোনা ত?

সেই তোর বন্ধু অমরেশ লিখেছে, নয় ?

হ্যাঁ। পড়্ না দিদি, কি লিখেছে ?

গায়ত্রী পড়িল,—

ভাই বংশী,

আবার লিখ্ ছি, একবারটি আস্‌বি ভাই ? অনেক দিন তোকে দেখিনি।

ইতি, অমরেশ—

না বংশী, তোর যাওয়া উচিত।

উচিত ? বলিয়া বংশী বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার টেবিলের ভাঙ্গা ড্রয়ারখানা টানিয়া তাহার ভিতর হইতে প্রায় দশ বারোখানা চিঠি বাহির করিয়া গায়ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, এগুলো সব পড়ে' দ্যাখ্।

বংশীর খাটের উপর বসিয়া গায়ত্রী একটি একটি করিয়া চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিল। প্রত্যেকটি চিঠিতেই সেই এক কথা,—একবারটি এসো ভাই।

গায়ত্রী একবার বংশীর দিকে ফিরিয়া হাসিল। কহিল, অথচ, একদিনও তুই যাস্‌নি ?

না।

দুষ্টু কোথাকার! বলিয়া গায়ত্রী আবার হাসিল। বলিল, আজ তুই যা বংশী।

বংশী খাটের একপাশে বসিয়া উদাস ভাবে তাহার বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, আচ্ছা যাব।

না, যাব নয়, তুই যা।

এক্ষুনি ? এক পেয়ালা চা'ও খেতে দিবি নে ? তিনটে তো বাজ্‌লো।

চা আমি এনে' দিচ্ছি। বলিয়া গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল।

এই অবসরে বংশী তাহার হাতের পুস্তকখানা একবার খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু পড়া তাহার হইল না। তাহার মন তখন অতীত পাঠ্যাবস্থায় তাহারই গত জীবনের কয়েকটা অধ্যায়ের পৃষ্ঠায় ঘুরিয়া মরিতেছিল। কলেজে পড়িবার সময় অমরেশের সহিত তাহার যে কোন্ সূত্রে এবং কেমন করিয়া পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, সেকথা ঠিক তাহার স্মরণ নাই। বন্ধু তাহার অনেক ছিল, কিন্তু একে একে সকলের সঙ্গেই তাহার প্রয়োজনের দিন শেষ হইয়া গেছে। অমরেশকেও ভুলিবার চেষ্টা বংশী কম করে নাই। কিন্তু অমরেশ তাহাকে মনে করিয়া মাঝে মাঝে যেসব চিঠি লিখিয়াছে,—

বিস্মৃতির মর্ম্মে বসিয়া তাহার প্রত্যেকটি লিপি বংশীর রক্তে দোলা দিয়া গিয়াছে, তথাপি সে তাহার একখানি চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই। কেন দেয় নাই, সে প্রশ্নের উত্তর বংশী তাহার নিজের কাছেই দিতে চায় না।

গায়ত্রী চা আনিল। ইতিমধ্যে জামা, জুতা পরিয়া বংশী প্রস্তুত হইয়াছিল। চা খাইয়া আজ বহুদিন পরে আবার সেই পুরাতন বন্ধুর বাড়ীর দিকে সে যাত্রা করিল।

বেয়ারা বলিল, বাবু উপরে আছেন।

বংশীর নিকট এ বাড়ীর কোনও স্থান অপরিচিত ছিল না। একেবারে দোতলায় উঠিয়া গিয়া মার্ব্বেল বারান্দায় সে তাহার জুতা খুলিয়া অমরেশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কার্পেট বিছানো মেঝের উপর একটা সোফায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে অমরেশ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। দরজার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিল বলিয়া বংশীকে সে প্রথমে দেখিতে পায় নাই।

বংশী তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ পাশের দেওয়ালে একখানা ছবির দিকে তাহার নজর পড়িতেই বংশী দেওয়ালের নিকট গিয়া একাগ্র মনে ছবিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। Miliasএর আঁকা একটি বন্যার ছবি। রাত্রির অন্ধকারে দুরন্ত বন্যা, কোন এক দরিদ্রের কুটীরে প্রবেশ করিয়া একটি শিশুর শয্যা ভাসাইয়া লইয়া আসিয়াছে,—কাঠের শয্যা জলের উপর ঘুমন্ত শিশুটিকে লইয়া ভাসিতেছিল,—শিশুর পায়ের নীচে একটি বিড়ালের ছানা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ প্রভাতের আলোকে দুইটী শিশুই জাগিয়া উঠিল। বিড়াল শিশু তাকাইয়া দেখিল, চারিদিকে শুধু জল আর জল,—পলাইবার পথ নাই!—নিতান্ত অসহায়ের মত সে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্নার শব্দে মানবশিশুর ঘুম ভাঙ্গিল। সেও কাঁদিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কাঁদিতে পারিল না। চোখ মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে আনত নিবিড় নীলাকাশ গভীর দৃষ্টিতে তাহারই দিকে, ঠিক তার মায়ের মত স্নিগ্ধ সকরুণ ভাবে তাকাইয়া আছে! . . . উর্দ্ধে তাহার কচি হাত দুইটী প্রসারিত করিয়া সে এই নিস্তব্ধ নীলিমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

এম্‌নি পরের পর দু' তিনখানি ভাল ভাল ছবি দেখিয়া অবশেষে লর্ড লেটনের The last watch of Heron ছবিখানার উপর তাহার নজর পড়িতেই বংশী যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, বলিল, বাঃ! এখানা কবে আন্‌লি অমর?

বংশীর কণ্ঠস্বরে অমরেশ সহসা চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। তাহাকে

চিঠি দিয়া সে নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছিল যে, বংশী আসিবে না, কিন্তু আজ এমন অকস্মাৎ তাহার সেই সুদুর্লভ বন্ধুটি যে স্বয়ং আসিয়া তাহার সে ভুল ভাঙিয়া দিবে, অমরেশ যেন তাহা চোখে দেখিয়াও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বেশ, যা হোক্ ভাই। বলিয়া অমরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতে ধরিয়া বংশীকে তাহার কাছে টানিয়া আনিয়া সে যে কি বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সোফার উপর উভয়ে চাপিয়া বসিলে, অমরেশ কহিল, আমাকে মনে আছে তোর? যাক্, সে কথা তোকে জিজ্ঞেস করে' কোন লাভ নেই। সব ভালো ত' বংশী?

বংশী বলিল, হ্যাঁ।

বাবা কেমন আছেন?

বংশীর বাড়ী অমরেশ নিজে কোন দিন যায় নাই, বংশীও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোন দিন পীড়াপিড়ি করে নাই। রত্নেশ্বরকে সে নিজের চোখে না দেখিলেও বংশীর নিকট শুনিয়াছিল যে, তিনি অসুস্থ; তাই মাঝে মাঝে দেখা হইলেই সে তাহাকে তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিত না, কিন্তু ইহার উত্তরে এতদিন ধরিয়া বংশীর নিকট যে কথা সে শুনিয়া আসিতেছে, আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

সে বলিল, তেম্‌নি আছেন।

এত কাছে রয়েছিস্ বংশী, অথচ একদিনও এদিক্ মাড়াস্ না,—আমার সময়টা কেমন করে' কাটে বল্ ত?

বংশী তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কোন কথা বলিল না।

অমরেশ কহিল, অফিসে যাস্?—

না।

চাক্‌রী নেই?

না।

চলে কেমন করে?

এতদিন যেমন করে চলেছিল।

বংশীর নিকট হইতে এম্‌নি কাটা কাটা উত্তরগুলো অমরেশের ভাল লাগিত না, এবং ইহার জন্য উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগ্‌ড়া বিরোধ যে না

ঘটিয়াছে, এমন নয়। তথাপি, সুগভীর জলাশয়ের প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যের প্রতি মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, একবার তাকাইলে সহজে সেদিক হইতে কেহ মুখ ফিরাইতে পারে না,—অমরেশও তেম্‌নি তাহার এই গম্ভীর প্রকৃতি বন্ধুটির শত ঔদাসীন্য সত্ত্বেও মন হইতে তাহাকে কোন দিন দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই, তাই সে বারে বারে জবাব না পাইয়াও চিঠি দিয়াছে,—একজন মৌন হইয়া বসিয়া থাকিলেও আর একজন কথা কহিয়াছে। অমরেশের মনে হইত, এই দুনিয়ায় বংশীর সহিত তাহার দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ চুকিবার নয়।

অমরেশ আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি তোর চাক্‌রী গেছে বংশী?

হাঁ, বল্‌লুম ত!

অমরেশের আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। বংশীর সংসার যে কেমন করিয়া চলিতেছে, সে বেশ বুঝিতে পারিল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমরেশ অন্য কথা পাড়িল। বলিল, এর মধ্যে কত ছবি এঁকে ফেলেছি, দেখ্‌বি?

বংশী বলিল, দেখি?

আয়। বলিয়া অমরেশ তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল। ঘরখানা ছোট হইলেও ছবি এবং বই দিয়া ঘরটা সে মুড়িয়া ফেলিয়াছে। বংশী বলিল, এ যে সব নূতন ছবি রে! আগে তো দেখিনি?

অমরেশ বলিল, কি কর্‌ব বল্? তোকে তো পাবার জো নেই, এই নিয়েই আছি।

বেশ। বলিয়া অমরেশের আঁকা একখানা ছবির পানে তাকাইয়া বংশী দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা টেবিলের ড্রয়ার হইতে কতকগুলা ওয়াটার কলার পেন্টিং বাহির করিয়া অমরেশ ও বংশী একটি একটি করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে বেহারা আসিয়া টেবিলের উপর চা, রুটি ইত্যাদি রাখিয়া গেল। অমরেশ একটা চায়ের পেয়ালা বংশীর হাতের নিকট আগাইয়া দিয়া বলিল, এগুলো আগে খেয়ে নে। বলিয়াই সে একবার মুখ তুলিয়া ডাকিল, বেয়ারা!

বেয়ারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ডাক শুনিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, দিদিমণি এলো?

আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র এলেন।

বেয়ারা চলিয়া গেলে অমরেশ বলিল, আমার দেখাদেখি নিভাও মাঝে মাঝে ছবি আঁকে। তার ছবি দেখ্‌বি? বলিয়া তাহার নিজের আঁকা ছবিগুলার মাঝখান হইতে একখানা ছবি টানিয়া বাহির করিয়া বংশীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, এইটা নিভা এঁকেছে।

কিছু হয়নি। বলিয়া বংশী সেখানা টেবিলের উপর সরাইয়া দিল।

অমরেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বাপ্‌ রে বাপ্‌ কিছু হয়নি তার কাছে বল্‌বার জো আছে? ভালো না হলেও আমায় ভালো বল্‌তে হবে।

বংশী গম্ভীর ভাবে অমরেশের ছবিগুলা উল্টাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বংশী উঠিয়া বলিল, আমি আজ আসি ভাই।

সে বসিবে না জানিয়া অমরেশ তাহাকে আর বৃথা অনুরোধ করিল না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বলিল, আবার আসিস্‌ যেন বংশী, ভুলে যাস্‌নে।

আস্‌ব। বলিয়া বংশী তাহার জুতার সন্ধানে বারান্দার এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

অমরেশ বলিল, কি খুঁজ্‌চিস্‌ রে? জুতো?

হ্যাঁ। কোথায় গেল? এইখানেই তো খুলেছিলুম!

একটা চাকর পার হইয়া যাইতেছিল, অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ রে কৈলাস, বাবুর এখানে জুতো ছিল, দেখেচিস্‌?

কৈলাস হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে জুতো কি বাবুর? দিদিমণি বল্‌লেন, ছেঁড়া জুতো, এখান থেকে সরিয়ে নর্দ্দামায় ফেলে দিগে যা।

হঠাৎ রাগিয়া অমরেশ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাই বুঝি ফেলে দিয়েছিস্‌ হতভাগা?—নিভা!—বলি তোর আক্কেলটা কি রকম শুনি। বলিতে বলিতে অমরেশ তাড়াতাড়ি নিভার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

নিভা বলিল, হ্যাঁ, আমার বুদ্ধি এম্‌নিই। দেখ ত' জুতোর কাদায় বারান্দার মার্ব্বেল কি হয়েছে?

দেখেছি, বেশ হয়েছে। কার জুতো জানিস্‌? বংশীর।

নিভা ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার বংশীকে বল দাদা, কাল আমি নূতন জুতো কিনে দেব।

'অমরেশ বাহিরে আসিয়া ডাকিল, বংশী!

কৈলাস বলিল, তিনি চলে' গেলেন বাবু।

খালি পায়েই? ছি ছি! বংশী বংশী! বলিয়া অমরেশ বারান্দার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্য ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

৩

রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। ঈষৎ উন্মুক্ত জানালার পথে সহসা একটা বড় তীব্র শীতল বাতাস ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই গায়ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সে জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর পশ্চাৎদিকের এই জানালাটার বাহিরে খানিকটা বাগানের মত জায়গা পড়িয়া ছিল। বহুদিনের অযত্নে সে স্থানটা এখন আগাছায় আর ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। জানালাটা খুলিয়া দিতেই গায়ত্রী দেখিল, রাত্রির ঘন অন্ধকার ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিতেছে—প্রভাতের বেশী বিলম্ব নাই। কয়েকটা ছোট-ছোট গাছের পাতা বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছিল। রাত্রে কখন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে সে বুঝিতে পারে নাই! সেই শীত-প্রভাতে ভিজে-মাটি এবং ঘাসের গন্ধ-ভরা আর্দ্র বাতাস আবার গায়ত্রীর গায়ে আসিয়া লাগিতেই শির্ শির্ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে শীতের শিহরণ তাহার রক্তের সহিত মিশিয়া তাহাকে একেবারে উন্মনা করিয়া দিল। গায়ে কাপড় খানা টানিয়া লইয়া জানালার একখানা কবাট ধরিয়া গায়ত্রী দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সেই বর্ষা-বাদল! . . . বিধাতার অর্থবিহীন প্রলাপ-বচনের মত এমন অসময়ে এ ক্ষ্যাপাখেয়ালী আবার কেন আসিল? . . . এই সজল-ঘন বর্ষার দিনগুলা যে তাহার কাছে বড় নিষ্ঠুর হইয়া দেখা দেয়! তাহার অভিশপ্ত জীবনের যে বিদ্রূপ, যে পরিহাসের বেদনা সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, এই নিবিড় ধারার মাঝখানে তাহা যেন আবার জাগিয়া উঠে! যে দুয়ার সে বারে-বারে বন্ধ করিয়া দেয়, এই উদাস-পাগল, সে বন্ধ-দুয়ারের রুদ্ধ-আগল ভাঙ্গিয়া দিয়া পথহীন কোন্ গহন অন্ধকারে হা-হা করিয়া নিজেও কাঁদিয়া মরে,—তাহাকেও কাঁদায়! . . .

দেখিতে দেখিতে গায়ত্রীর চোখের সম্মুখে রাত্রিশেষের সে ধূসর-ঘন

তিমিরান্তরণ কাটিয়া গেল। এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘোলা আকাশ ধীরে-ধীরে কালো হইয়া উঠিতেছে। মেঘে মেঘে বাদলের আয়োজন, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া আবার মহাসমারোহে ঘনাইয়া আসিতেছে!

আকাশের গায়ে অগ্নিরেখা কাঁপিয়া উঠিল। গুরু গর্জ্জনে মেঘ ডাকিল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার বাদল নামিল। সেই ঘন-বর্ষণের আড়ালে সমস্ত জাগ্রত-জগৎ যেন গায়ত্রীর চোখের সম্মুখে লুপ্ত হইয়া গেল।—অফুরন্ত জলধারার মধ্যে তৃষ্ণাদীর্ণ কণ্ঠে পান্থবিহীন পথের প্রাণান্তকারী বিজনতায় সে শুধু একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার চোখের সম্মুখে বাদলের বিষাদ-ঘোর, উতলা বাতাসের হতাশ নিশ্বাস, এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহারই ভাঙা বুকের উপর ভাঙা বাদ্যের মত ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে লাগিল!... জীবনের অতৃপ্ত ক্ষুধা অনন্ত তৃষ্ণা, তাহার বুকের মাঝে বিষের মত জ্বলিতেছিল। কাতর মিনতিমাখা দুটি সজল চক্ষু তুলিয়া ধরিয়া গায়ত্রী এই বাক্যহীন অনন্ত বিরহীর অবিশ্রান্ত অশ্রুধারার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, কে তুমি উৎসুক! আজ মিলন-কৌতুক দেখিবার আশায় এই উদাসিনীর ঘুম ভাঙাইয়া দিলে?—

গায়ত্রী বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানা তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, পিতা ইহারই মধ্যে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বংশী হয়ত তখনও ঘুমাইয়া উঠে নাই।

ফুটা টিনের পথে জল প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের মেঝেটা জলে থৈ থৈ করিতেছিল। গায়ত্রী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে জলটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বংশীর ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, বংশী!

দরজা খোলাই ছিল। গায়ত্রী ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, তোমায় একটি কাজ করতে হবে লক্ষ্মী ভাইটি আমার, এসো।

মুখ হাত ধুইয়া বংশী জানালা খুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বৃষ্টি দেখিতেছিল, বলিল, সকাল বেলা এত খোসামোদ কেন শুনি? বাজারের সময় তো এখনো হয়নি।

না, বাজার নয়, এসো, তা নইলে চা খেতে পাবে না।

ও, বুঝেছি। তোমার রান্নাঘরে বান ঢুকেছে বুঝি? তা কি করতে হবে? বলিয়া বংশী ধীরে ধীরে দিদির পশ্চাতে উঠিয়া আসিল।

ঘরের কোণ হইতে ছাতাটা তুলিয়া লইয়া গায়ত্রী তাহার হাতে দিয়া বলিল,

ওই ভুলির ঘরে যে ভাঙা টিন্‌টা পড়ে আছে, সেইটি এনে আমার রান্নাঘরে তুলে দিতে হবে। পারবি তো?

ছাতা না লইয়াই বংশী উঠানে নামিয়া গেল। বৃষ্টির বেগ তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছিল।

গায়ত্রী বলিল, বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে তো বলিনি! ছাতিটা নিয়ে যা।

ছাতি নিয়ে দেওয়ালের উপরে তো ওঠা যায় না! বলিয়া বংশী ভুলির ঘর হইতে টিনের ছোট টুক্‌রোখানা আনিয়া বলিল, তোকে এটা তুলে দিতে হবে কিন্তু। বলিয়া অতি সাবধানে বংশী রান্নাঘরের দাঁত বাহির করা প্রাচীরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

টিন্‌টা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া গায়ত্রী বলিল, দেখিস্‌, সাবধানে নেমে আসিস্‌ যেন। বৃষ্টির জলে সব পিছোল্‌ হ'য়ে আছে। বলিয়া গায়ত্রী একদৃষ্টে বংশীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভাল করিয়া টিনখানা ছাতের উপর বসাইয়া দিয়া বংশী নামিয়া আসিতেই গায়ত্রী বলিল, এবার কাপড় ছেড়ে চুপ করে বসো গিয়ে,—আমি চা দিচ্ছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক পেয়ালা চা ও দু'খানা বাসি পরোটা টেবিলের উপর রাখিয়া গায়ত্রী বলিল, আজ বাদলের দিনে খিঁচুড়ি খাবি বংশী?

বেশ তো! বলিয়া বংশী ভাঙা চেয়ারখানা সরাইয়া লইয়া টেবিলের নিকট বসিল।

গায়ত্রী তাহার খাটের একপ্রান্তে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তুই বেশ ছেলে যা-হোক্‌ বংশী, বলি হাঁরে, নিজের পায়ের জুতো আবার কেউ ফেলে আসে? আজ এই বর্ষার দিনে খালিপায়ে হাঁটলে সর্দ্দি হবে না?

বংশী গায়ত্রীর মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, জুতো ফেলে তো আসিনি।

ফেলে আসিস্‌ নি তো কোথায় গেল? কাল যে বল্‌লি, ফেলে এলুম।

বংশী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, শুন্‌বি, কি হয়েছিল? অমরেশের বাড়ীটা কেমন জানিস্‌ দিদি, খুব প্রকাণ্ড, সুন্দর বাড়ী। মার্ব্বেল পাথরের বারান্দার উপর জুতো দুটো খুলে তার ঘরে ঢুকেছিলুম,—ঘরের মেঝেটা কার্পেট দিয়া মোড়া কিনা! তার বোন নিভা তখন ঘরে ছিল না। আমি বেরিয়ে এসে দেখি, আমার জুতো জোড়াটা সেখানে নেই! ভাব্‌লুম, কেউ সরিয়ে রেখেছে। তারপর শুন্‌লুম, মার্ব্বেল বারান্দার উপর ছেঁড়া জুতোদুটো

দেখে নিভা সেগুলো ফেলে দিয়েছে!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বংশী হাসিতে লাগিল।

কিন্তু গায়ত্রী হাসিতে পারিল না। নির্ব্বাক গম্ভীরভাবে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, সে আবার কেমন মেয়ে! তাহার ভাই না-হয় গরীব,—নূতন জুতো পায়ে দিয়া বড়লোকের বাড়ী যাইবার সঙ্গতি তাহার না থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি গরীবের শেষ সম্বলটুকুও ঘৃণায় ফেলিয়া দিতে হইবে? বুকে এতটুকু বাজিল না? বড়লোকের বোন বলিয়াই কি সে এম্‌নি পাষাণ? . . .

গায়ত্রীকে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যাইতে দেখিয়া বংশী বলিল, তার আজ হয়েছে কি? ভাব্‌ছিস্ কেন দিদি?

মুখ তুলিয়া গায়ত্রী বলিল, বা, তাই বলে সে ফেলে দেবার কে?

বংশী আবার হাসিল। বলিল, তার সঙ্গে ঝগড়া করিস্ ত দেখ্, তাকে একদিন ডেকে আন্‌তে পারি দিদি।

গায়ত্রী এইবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার একটু বুদ্ধি হলো না? কচি খুকি তো নয়?

কচি খুকি কেন হতে যাবে, ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করেছে।

গায়ত্রী বলিল, তবে?—

বংশী সেখান হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া একবার বাহিরের পানে তাকাইল। দিদির কাছে আসিয়া বলিল, বৃষ্টি ধরে' গেছে দিদি, বাজারে কি আন্‌তে হবে বল্ এবার।

মাছ আর আলু ছাড়া আর-কিছু আন্‌তে হবে না। বলিয়া আঁচলের খুঁট্ হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া গায়ত্রী তাহার হাতে দিয়া বলিল, এত তাড়াতাড়ি নেই বা গেলি বংশী, একটু পরে যাস্।

আধুলিটা নাড়িতে নাড়িতে বংশী বলিল, আচ্ছা দিদি, সত্যি করে বল্ দেখি আর কদিনের মত খরচ-টাকা না পেলেও তুই চালাতে পারিস্। ধর্ চাকরী পেতে যদি আমার দেরীই হয়।

গায়ত্রী বলিল, একমাসের মধ্যে তুই চাকরী জোগাড় করতে পারবি না?

বংশী অনুমানে বুঝিল, তাহার এই দিদিটি এখনও একমাসের মত খোরাক্ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। সে আনন্দে একপ্রকার লাফাইয়া উঠিল'। বলিল, একমাস? আমি তো ভাবছিলুম আর একদিনও—তুই এমন হিসেব্ করে চলিস্ দিদি?

ভাইএর আনন্দ বুঝিতে পারিয়া গায়ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, শুধু আমি কেন রে ক্ষ্যাপা, তোর বৌ এলে দেখ্‌বি, সেও এমনি হিসেব করে চল্‌বে।

ঘাড় নাড়িয়া বংশী বলিল, আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি দিদি তোর মত কেউ যদি পারে—

না পারে, শিখিয়ে নেব বংশী, বৌ তুই একটি এনেই ছাখ্‌ না।

আচ্ছা, আন্‌তে চল্লুম। বলিয়া ছাতিখানি হাতে লইয়া খালি পায়ে বংশী বাহির হইয়া গেল।

গায়ত্রী যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, বংশীর উন্মুক্ত পা-দুইটির দিকে তাকাইয়া গায়ত্রী মনে-মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিল। দুঃখ-বেদনা গায়ে লাগে না বলিয়াই কি এই আপন-ভোলা মানুষটিকে এমন করিয়া রহস্যের ছলে কষ্ট দেওয়া উচিত! . . . একজোড়া ছেঁড়া জুতার দাম হয়ত বড়লোকের কাছে কিছুই নয়, তাহাদের মত দরিদ্রের কাছে যে তাহার মূল্য অনেক বেশী!

গায়ত্রী উঠিয়া সদরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। বঁটি লইয়া কয়েকটা আলু কুটিয়া রাখিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরে সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। বংশী ফিরিয়া আসিল ভাবিয়া গায়ত্রী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই যাহার সহিত তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল তাহাকে সে জীবনে কোনদিন দেখে নাই! সম্মুখে ভদ্রবেশী এক অপরিচিত যুবককে দেখিয়া গায়ত্রী সন্ত্রস্ত হইয়া দরজার আড়ালে একটুখানি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চান আপনি?

বংশী আছে? আমার নাম অমরেশ।

নাম শুনিয়া গায়ত্রী বুঝিতে পারিল। বলিল, এইমাত্র সে বাজারে বেরিয়ে গেল, এক্ষুনি ফির্‌বে।

গায়ত্রীর কথা শেষ হইতে-না-হইতেই ঝপ্‌ ঝপ্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিল। গলির মোড় হইতে তাহার গাড়ীটা বিদায় করিয়া দিয়া বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে পায়ে হাঁটিয়াই অমরেশ এই রাস্তাটুকু আসিয়াছিল। হাতে ছাতা ছিল না। সে বড় বিপদে পড়িয়া গেল। গায়ত্রীও কম বিপদে পড়ে নাই। জলে ভিজিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া গায়ত্রী বলিল, যাবেন না, আপনি ভেতরে আসুন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া অমরেশ তাহার সহিত উঠানটা পার হইয়া আসিয়া

বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারই এক কোণে রত্নেশ্বর একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কত কথাই না বলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ এই অজানা আগন্তুককে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

অমরেশ ধীরে ধীরে একটি প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতেই রত্নেশ্বর বলিলেন, কে বাবা? বসো, বসো, চিন্‌তে তো পার্‌লুম না? বলিয়া তিনি যে কম্বলের উপর বসিয়াছিলেন সেইখানা তক্তাপোষের উপর ভাল করিয়া বিছাইয়া লইবার জন্য নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অমরেশ সশব্যস্ত হইয়া তক্তার একপ্রান্তে বসিয়া বলিল, না না কিছু করতে হবে না, এই আমি বেশ বসেছি, আপনি বসুন।

রত্নেশ্বর কিন্তু নিরস্ত হইলেন না, কম্বলখানা ভাল করিয়া বিছাইয়া অমরেশকে তাহার উপর চাপিয়া বসিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এণ্ডারসনের কাছ থেকে? তা বেশ, বেশ,—এই বাদলের দিনে লোক না পাঠালেই পার্‌তো সে।

একমাত্র এণ্ডারসনের নিকট হইতে লোক দিয়া তাঁহার পেন্‌সেন্ পাঠানো ব্যতীত তাঁহার বাড়ীতে যে আর কোনও আগন্তুকের আগমন সম্ভবপর, ইহা তিনি প্রথমে ধারণা করিতেই পারেন নাই, কিন্তু অমরেশের কথায় তাঁহার সে ভ্রান্তসংশয় দূর হইতেই তিনি কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত এবং অন্যমনা হইয়া পড়িলেন।

অমরেশ বলিল, আমি বংশীর বন্ধু, আমার নাম অমরেশ। আজ তাকে আমাদের বাড়ী খাবার জন্যে ডাক্‌তে এসেছি।

রত্নেশ্বর কিয়ৎক্ষণ আপন মনে যে-কথাগুলা বলিয়া গেলেন, অমরেশের নিকট তাহার প্রত্যেকটি বর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইলেও, এই অথর্ব্ব বৃদ্ধের দারিদ্রক্লিষ্ট বিষাদ-ছায়া-ঘন মুখের পানে তাকাইয়া মন তাহার করুণায় এত বেশী আর্দ্র হইয়া গেল যে, তাহার চোখ দুইটা পর্য্যন্ত জলে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কোনরকমে মুখ ফিরাইয়া কোঁচার খুঁটে চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া অমরেশ তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই, সহসা তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বংশীর বন্ধু তুমি? বেশ বাবা বেশ। নামটি কি বল্‌লে?

অমরেশ।

অমরেশ,—বেশ নামটি। আমার বংশীধরের নামটিও বেশ। বংশীধর অর্থাৎ মুরলীধর। বংশী ধারণ করেন যিনি, তার মানেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের নাম। অনেক ভেবে চিন্তে নামটি রেখেছিলুম। আমার ওই এক ছেলে আর ওই এক বিধবা মেয়ে, আর কেউ নেই বাবা। দেখ, কথায় কথায় কেমন ভুলে যাচ্ছি।—বংশী! বংশীধর!

অমরেশ বলিল, সে বাজারে গেছে, এক্ষুনি—

বাজার? হেঁ হেঁ তা হবে,—বাজারই গেছে তাহ'লে। এক্ষুনি ফিরবে সে, বসো তুমি বসো। দু একদিন আমিও যাই বাজারে, তবে কিনা আমার কাছে নাকি পয়সা-টয়সার গোলমাল হয়ে যায় তাই গায়ত্রী মা আমায় আর যেতে দেয় না। সেই সেদিন কি করে ফেলেছিলুম পরেশকে একবার শুনিয়ে দে তো মা!

এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে মুখ তুলিয়া দেখিলেন গায়ত্রী ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছে। বলিলেন, যাক্, তোমার বাবা কি করেন পরেশ?

অমরেশ ধীরে ধীরে বলিল, আমার নাম অমরেশ। বাবা মা আমার কেউ নেই। আমি আর আমার দুটি বোন আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমরেশ, অমরেশ, আর ভুল্‌ব না; কি বল্‌লে, বাবা, মা, কেউ নেই?

অমরেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

আঃ, ছি-ছি, ছি-ছি, যাকে জিজ্ঞেস্ করি, হয় বাবা নেই, নয় মা নেই। এম্‌নি সব। প্রাক্তন, এ-সব কর্ম্মফল,—আর কি বল্‌ব বাবা, এই যে আমার ছেলে দুটো, মায়ের ভালোবাসা পেলে না,—বাবা বেঁচে রয়েচে। মাত্র জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকা। তা আমার মতন বাবা, বেঁচে থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! বলিতে বলিতে তাঁহার ঠোঁটদুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু তাঁহার কম্পিত হস্তের উপর গড়াইয়া পড়িল।

তিনি আবার অন্যমনস্ক হইয়া আপন মনেই বকিতে লাগিলেন। এমন সময় কর্দ্দমাক্তপদে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বংশী রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই গায়ত্রী বলিল, অমরেশ এসেছে।

কোথায়?

অনুচ্চকণ্ঠে গায়ত্রী কহিল, দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ না, ওই যে বাবার কাছে বসে।

ছাতাটা বন্ধ করিয়া বংশী ঘরের বারান্দার দিকে মুখ ফিরাইতেই অমরেশের সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

চিরদিন সংসারে যাহারা অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্ব্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।

'পথের দাবি'

স্মৃতি-চিহ্ন

—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

তার নাম ছিল মণ্টু। সাধারণ ছেলের তুলনায় মণ্টু ভিন্ন রকমের ছিল। সর্ব্বদাই কি ভাব্‌ত—কারুর সঙ্গে বেশী কথা কইত না—মিশ্‌তেও চাইত না। তার এই রকম কেমন একটা খাপ্‌ছাড়া প্রকৃতি লক্ষ্য করে পাড়ার ছেলেরা তাকে পাগল বল্‌ত। পাঁচ বছর বয়সে মণ্টুর মা মারা যায়। আর তার ঠিক এক মাস পরেই বাপ সিকো আবার বিবাহ করে।

বিমাতা মণ্টুকে দুটী চোখে দেখ্‌তে পার্‌ত না। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় বিব্রত হয়ে শীর্ণ মণ্টু যখন আশ্রয়ের জন্য বিমাতার কোলে ছুটে আস্‌ত, তখন বিমাতা ভর্ৎসনা করে সরে যেতো, ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে—এক গা কাদা মেখে আমার কাপড় চোপড় এখনি নষ্ট করে দিবি। বাপেরও সে চক্ষুশূল ছিল। এমন বেঁটে বোকা বিশ্রী ছেলেটাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতেই তার লজ্জা হত। কিন্তু কি করে? ফেল্‌বার উপায় ছিল না, তাই নিতান্ত দুরদৃষ্টের মতই মণ্টু তাদের উপর ভর করে রইল। সমস্ত পৃথিবীটা তার নিকট লোহের মত কঠিন মনে হ'ত। নিজের মনটাকেও সে তেম্‌নি ভাবে গড়ে ফেলেছিল। মানুষের মধ্যে বাস করে কোন দিন সে সুখের মুখ দেখেনি। সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে, বনে বনে পাখীর গান শুনে, ইতর পশুর মুখে আহার দিয়ে সে যে সুখ পেয়েছে, তার তুলনায় কি সুখ আছে? তার কাছে নিত্য কোলাহল মুখরিত পল্লীর ঘরগুলো যেন অসহ্য বিকটতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে বোধ হ'ত। মণ্টু নিতান্ত নিঃসঙ্গ একলা। তার জন্য ভাব্‌বার কেউ নেই—সেও কারুর জন্যে ভাবে না। গৃহে মাতার একখানা অস্পষ্ট চিত্র ছিল। সে অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখে তার অন্তরখানা আকুল হয়ে উঠ্‌তো। চিত্রখানা বুকে চেপে সে কেমন যেন আরাম পেতো। কি সুন্দর সে মুখখানি! এই যে চারিধারে অসংখ্য নর-নারী—এমন সুন্দর ত কেউ নয়। শান্ত দৃষ্টি, স্নেহ করুণার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরে রয়েছে—নির্জ্জন কক্ষে চিত্রের সম্মুখে; ভূমিতে লুটিয়ে সে কাঁদ্‌তো! কোন্ এক অজানিত দেশে, কার এতটুকু স্নেহস্পর্শের

জন্য তার ক্ষুধিত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু কোথায় সে দেশ? কেমন সে স্নেহ?

শৈশবে মাতৃহারা, মণ্টু এক দিনের জন্য কারুর স্নেহ স্পর্শ লাভ করে নি। অর্থলোভী পিতার অর্থোপার্জ্জনের প্রবল স্পৃহায় পিতার স্নেহ কেমন, তা বোঝ্‌বার সে কোন দিন অবকাশ পাই নি। পিতার লোহার কার্‌বার ছিল, অর্থ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহ ছিল না। তার পিতার হৃদয়খানাও লৌহের মত কঠিন ছিল। একলা নিঃসঙ্গ মণ্টু সমুদ্র তীরে বন জঙ্গলেই জীবন কাটিয়ে দিত। কারুর সঙ্গে মেশ্‌বার তার প্রবৃত্তি ছিল না। সে ভেবেছিল তার এই ছন্নছাড়া অভিশপ্ত জীবনের শেষ সে এমনি ভাবেই করবে। কিন্তু তা হল কই? মণ্টু একদিন তার নিজের ঘরে মার ছবিখানার দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদ্‌ছিল, আর মনে মনে বল্‌ছিল, 'মা! তোমার ছবিতে যদি প্রাণ থাক্‌তো—তা হলে কি আজ আমাকে এমন ভাবে পিতার নির্য্যাতন বিমাতার গঞ্জনা সহ্য করতে হত?' এমন সময় তার পিতা সিকো দরজার পাশ থেকে গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লে 'মণ্টু'! মণ্টু চম্‌কে উঠ্‌লো। পিতার এমন রুক্ষস্বর শুনে সে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে 'কেন বাবা?' সিকোর চক্ষু রক্তবর্ণ কেশ রুক্ষ। কর্কশ স্বরে বল্‌লে 'মণ্টু আজ থেকে তোমায় বাড়ীর সব কাজ করতে হবে। আমি চাকরদের সব ছাড়িয়ে দিইছি বুঝ্‌লে?' মণ্টুর বুক কেঁপে উঠ্‌লো। সে উত্তর দিলে 'আচ্ছা'। সিকো পূর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ স্বরে বল্‌লে 'আচ্ছা' নয় এখনই যাও—মাঠ থেকে গরুগুলোকে ঘাস খাইয়ে আন।' মণ্টু ত্রস্থ পদে চলে গেল।

সেই দিন থেকে মণ্টু গৃহের সব কাজ করতো। গ্রীষ্মের তপ্ত মধ্যাহ্নে —বর্ষার ভীষণ সন্ধ্যায়—শীতের কঠোর রাত্রিতে—নানা দুর্য্যোগে মণ্টু অবিচলিত হৃদয়ে অকম্পিত চিত্তে তার কর্ত্তব্য পালন করতো। দিনের মধ্যে সে নিমিষের জন্য সময় পেতো না, তার স্নেহময়ী জননীকে ভাব্‌তে। সকাল বেলা উঠেই তার কাজ ছিল গরুগুলোকে মাঠ থেকে ঘাস খাইয়ে আনা—তারপর বাড়ীর দোকান, বাজার করা, পুকুর থেকে জল আনা—বাসন মাজা সমস্ত গৃহের কাজ মণ্টুকে একাই করতে হত। তারপরও নিস্তার নেই। সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে যখন শ্রান্ত হয়ে বাইরে মাঠের উপর শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে ভাব্‌তো 'মা! তোমার আদরের মণ্টুকে ফেলে কোথায় গেলে?' বিমাতা এসে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌তো 'বলি—সমস্ত

দিন শুয়ে থাকলেই কি চলে? সেই যে মানুষটা সমস্ত দিন না খেয়ে দোকানে বসে রয়েছে তার কাছে একবার যাও না?' মণ্টু আস্তে আস্তে পিতার দোকানে যেতো। তারপর যখন রাত্রি হ'ত—অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যেতো দোকান থেকে সে তখন একা ঘরে ফির্‌তো।

এই রকমে বিমাতার শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও পিতার তিরস্কার আর নির্য্যাতনের মধ্য দিয়ে মণ্টুর দিন কাটতে লাগ্‌ল। সে সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছিল—কেবল স্নেহময়ী জননীর ছবিখানার মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারে নি। সেই ছবিখানার জন্যই সে এত কষ্ট সহ্য কর্‌ছিল। প্রত্যেক দিন সে বনফুলের মালা গেঁথে ছবিখানাকে সাজাত—আবার সবার অলক্ষ্যে তখনই ছিঁড়ে ফেল্‌তো। ছবিখানার উপর একটা সোনার হার টাঙ্গানো ছিল। সেই হারটা সিকো স্ত্রীর স্মৃতির স্বরূপ গড়িয়ে ছবিখানার উপর ঝুলিয়ে রেখেছিল। যখন ঘরে কেউ থাকতো না, মণ্টু আস্তে আস্তে ছবিখানার উদ্দেশে প্রণাম কর্‌তো আর তার মনে হত তার নিজের হাতে গাঁথা বনফুলের মালাতেই মাকে মানায় ভাল! সোণার হারটা যেন কাল সাপ! তারই উষ্ণ নিঃশ্বাসে মার বুকখানা পুড়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে মণ্টুর ইচ্ছে হ'ত সোনার হার ছুঁড়ে করে টেনে ফেলে দেয়—কিন্তু কেবল সেটা সে কর্‌তে পার্‌তো না পিতার ভয়ে।

একদিন সে ভোর বেলা শিশির মাখানো সদ্য প্রস্ফুটিত কতকগুলো ফুল দিয়ে ছবিখানাকে পূজো কর্‌তে বসেছিল। এমন সময় সিকো হঠাৎ কেমন ভাবে সে ঘরে এসে পড়্‌লো। মণ্টুর এই ব্যাপার দেখে সিকো রাগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। কর্কশ কণ্ঠে বল্‌লে 'এই হচ্ছে বুঝি? সকাল বেলা ঘরের কাজ চুলোয় গেল—খেলা হচ্ছে?' ব'লে সিকো ফুলগুলো ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে কাণ ধরে মণ্টুকে ঘর থেকে বার করে দিলে। মণ্টুর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে যে বড় আশা করে ফুল তুলে এনেছিল—মায়ের পূজোর জন্য! অভিমানের ব্যথায় তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌লো। সে আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো। সে ভুলে গেল মাঠে গরু নিয়ে যাবার কথা—পিতার তিরস্কারের কথা—মা'র জন্য তখন তার হৃদয় আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল।

ঘুরে ঘুরে সে গ্রাম ছাড়িয়ে সমুদ্রের তীরে এসে পড়্‌লো। চারধারে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়—আর ভীষণ সমুদ্রের কি উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ! পাহাড়ের উপর বসে সে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখ্‌ছিল। ভোরে এসে সে পাহাড়ে বসেছিল।

ক্রমে মাথার উপর সূর্য্য উঠ্‌লো—সূর্য্যের তেজ বাড়্‌লো, তবু তার সেদিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল উড়্‌ছিল—সূর্য্যের কিরণে পাখীগুলোর সাদা পালক ঝিক্ ঝিক্ কর্‌ছিল—এক দৃষ্টে মণ্টু তাই দেখ্‌ছিল। সে ভাব্‌ছিল—মানুষ না হয়ে সে যদি পাখী হ'ত—তাহলে পৃথিবীর বাহিরটা দেখ্‌বার তার অবকাশ মিলতো। মানুষের সঙ্গ তার বিষের মত বোধ হ'ত। পৃথিবীর উপর ঘৃণা জন্মে গেছ্‌লো। যখন দ্বিপ্রহর হয়ে গেল—বেলা ক্রমে পড়্‌তে লাগ্‌ল মণ্টু আস্তে আস্তে উঠ্‌লো। তারপর সে তার জননীর উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সমুদ্র ছাড়িয়ে সে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়্‌লো, তখন রাত হয়েছে। আকাশ বাতাস চারদিক চাঁদের শুভ্র আলোকপাতে ঝক্ ঝক্ কর্‌ছিল। মণ্টুর কোন দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সে এক জায়গায় থেমে পড়্‌লো। সেখানে একটা মাটীর ঢিবি ছিল। সেইটিই তার মা'র কবর। এতদিন সে আস্‌তে পারে নি—এতদূরে পিতার ভয়ে। সেদিন সে মরিয়া হয়ে গেছ্‌লো। মাতার কবর দেখে তার মাতৃশোক উথ্‌লে উঠ্‌লো। কবরের উপর দু' চারটা বনফুল শুকিয়ে পড়েছিল। চাঁদের আলোয় সেগুলো চক্ চক্ কর্‌ছিল। মণ্টু 'মা মা' বলে কবরের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌লো। হৃদয়ের মধ্যে যে অশ্রু এতদিন জমাট হয়ে ছিল—আজ শতধারে গলে পড়ে মায়ের কবর ভাসিয়ে দিলে।

সে কবরের উপর কতক্ষণ পড়েছিল জানে না। চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেল। চারিদিক আঁধারে ছেয়ে গেল। মণ্টু তবু কবরের উপর পড়ে। সারাদিন অনাহারে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবশ দেহখানা মায়ের শান্তির কোল ছেড়ে কোথায়ও যেতে চাইছিল না। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল কার পদশব্দে। নিস্তব্ধ নিশীথে উন্মুক্ত প্রান্তরে পদশব্দ শুনে মণ্টুর বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌লো। সে ধড়ফড় করে উঠে বসে দেখ্‌লে—লণ্ঠন হাতে করে কে একজন আস্‌ছে। ক্রমে মনুষ্যমূর্ত্তি আরও নিকটে এল। লণ্ঠনের আলোকে মণ্টু স্পষ্ট চেয়ে দেখ্‌লে—এ যে তার পিতা! তার বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটুতে লাগ্‌ল। মাথার রক্ত চন্ চন্ করে উঠ্‌লো। ইচ্ছে হচ্ছিল সে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। সিকো কাছে এসে পড়েছিল। মণ্টুকে দেখে সিকো রাগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মণ্টুর কাণ দুটো ধরে, সজোরে গালে দুই চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে 'হতভাগা

ছোঁড়া—এইখানে আসা হয়েছে—আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম—সকাল থেকে টিকির নাগাল নেই—কেবল খাবার সঙ্গে সম্বন্ধ! কোন বাপ্‌ খুড়ো আছে রে তোর—যে দুপুর রাতে আলো নিয়ে খুঁজ্‌তে আস্‌বে? চল্‌ হতভাগা বাড়ী' বলে সিকো মণ্টুকে খুব দুচার ঘা বসিয়ে দিলে।

মণ্টুর তখন জ্ঞান ছিল না। সে স্পষ্ট উত্তর কর্‌লে 'বাবা—আর আমি বাড়ী যাব না—আমায় ছেড়ে দাও—আমার এই মার কবরই ভাল।' কথা শুনে সিকো আরও রেগে গেল। তারপর দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে 'বেশ—তোমায় যেতে হবে না—এই কবর নিয়েই থাক—শীগ্‌গীর যেন তোমাকে এই কবরেই যেতে হয়।' বলে সিকো লণ্ঠন নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। মণ্টুর মনে হল 'ভগবান! আমার সেদিন কি হবে? যে এই কবরে যেতে পারব।'

সেদিন থেকে মণ্টু সিকোর বাড়ী ছাড়া। সে কবরে থেকেও যেন তার আশ মিট্‌তো না। বাড়ীর সেই মা'র ছবিখানার জন্যে তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। জড় আলেখ্যর মধ্যে সে যেন জননীর জীবন অনুভব কর্‌তো। ছোট ঠোঁট দুখানিতে মৃদু হাস্য দেখ্‌তে পেয়ে সে যেন আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌তো। তার মনে হ'ত সর্ব্বদাই যেন তার মা—তার দুঃখ দেখে কাঁদ্‌ছে। সে কথাটা ভাব্‌তেও মণ্টুর চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌তো। সেই অমূল্য রতন মায়ের স্মৃতি ছবিখানার জন্য তার প্রাণ ছট্‌পট করতে লাগ্‌ল। সে মনস্থ কর্‌লে—যে করে হ'ক—সে মার ছবি পিতার হস্ত থেকে উদ্ধার করে নিজের বক্ষে চেপে—তপ্ত প্রাণ শীতল কর্‌বে। মার ক্ষুদ্র স্মৃতি-চিহ্নে শান্তি পাবার জন্য সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌লো।

* * *

চারিধার নিস্তব্ধ! ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফুটে ওঠে নি। বিস্ফারিত চক্ষে—একবার চার্‌ধার চেয়ে মণ্টু মাঠের উপর দিয়ে বনের পানে ছুট্‌লো। তার শুষ্ক মূর্ত্তি—চক্ষু কোটরে ঢুকে গেছে—ওষ্ঠ কাঁপ্‌ছিল। প্রাণপণে বুকের মাঝে মার ছবিখানা চেপে ধরে প্রায় আধ ঘণ্টা দ্রুত ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ঝোপের কাছে সে বসে পড়্‌লো। কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়্‌ছিল—কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছ্‌ল। সে পা ছড়িয়ে বসে পড়্‌লো। বসে—কাণ্‌ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল কোন শব্দ নেই! চার্‌দিকে তখন অবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ কর্‌ছিল। সূক্ষ্ম পর্‌দার মত রাত্রির অন্ধকার সরে যাচ্ছিল—

আর ধীরে ধীরে তার পেছনে অস্পষ্ট আলো ফুটে উঠ্‌ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোকে চারধার ছায়ার মত দেখাচ্ছিল। মণ্টুর মনে হল জগতের শেষ দিনে—শেষ মুহূর্ত্তে যেন সে এই বিশাল প্রান্তরে একা বসে আছে—জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই—জীবনের এতটুকু চিহ্ন কোথায়ও নেই। মূক প্রকৃতির সম্মুখে সে যেন আজ কার আহ্বানের জন্য বসে আছে। কি এক মোহ তাকে ঘিরে ফেলেছিল!

আজ সে চোর! ছবি চুরি করে আজ সে পালাচ্ছে! যদি কেউ ধরে ফেলে? মণ্টু উঠে দাঁড়ালো। তার দেহ কাঁপ্‌ছিল—মাথা ঘুর্‌ছিল। কাঁটার ঝোপ ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে অমনি সে দেখে—সর্ব্বনাশ দুটো লোক! উপায়? একজন বল্‌লে 'কে হে তুমি বনের মধ্যে?' আর একজন বলে উঠ্‌ল 'ওরে এ যে সিকোর ছেলে মণ্টু?' তারপর মণ্টুর দিকে ফিরে চেয়ে বল্‌লে 'হ্যাঁরে মণ্টু—বনের মধ্যে কি নিয়ে যাচ্ছিস্ রে? আর তোর বাপ তোকে খুঁজ্‌ছে—চল্ তোর বাবার কাছে।' মণ্টু কিছুতেই যাবে না। তখন তাদের সন্দেহ বাড়্‌লো—তারা জোর করে মণ্টুকে ধরে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। সিকো মণ্টুকে ছবিশুদ্ধ দেখে একেবারে জ্বলে উঠ্‌লো। তারপর নির্দ্দয় করে প্রহার দিয়ে 'চোর' বলে পুলিশে ধরিয়ে দিলে।

থানায় মণ্টুকে ধরে নিয়ে গেল। মণ্টুর প্রাণে ধিক্কার এল। মায়ের ক্ষুদ্র স্মৃতি-চিহ্ন বুকে রাখার জন্যে তাকে আজ চোর অপবাদও মাথায় পেতে নিতে হল! বিচারকের কাছে মণ্টুর মাথা দারুণ অভিমানে কষ্টে দুঃখে আপ্‌না হতেই নুয়ে পড়েছিল—সে একটি কথাও তখন নিজের স্বপক্ষে বল্‌লে না। সিকো বল্‌লে—তার স্ত্রীর সোনার হার ছবিতে ছিল—সেইটে মণ্টু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল—পাড়ার লোকেরা ধরে ফেলে। মণ্টুর মনের কথা কেউ বুঝ্‌লে না। বিচারক তার ছ মাস জেলের হুকুম দিলেন। মণ্টু স্থির-নিশ্চল ভাবে সে আজ্ঞা মাথায় পেতে নিয়ে যোড়হাত করে বল্‌লে "হুজুর ধর্ম্মাবতার! জেলে দিন আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার সোনার হার ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই ছবিখানার জন্য আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। এ ছবিখানা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না। দোহাই আপনার—এই আমার শেষ মিনতিটুকু রাখুন। ভগবান আপনার ভালো কর্‌বেন।"

সত্য

—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রশান্ত—অবিবাহিত যুবক

মিনি—কুমারী, কিশোরী

মাধা—ভৃত্য

স্থান—প্রশান্তর কক্ষ

[মিনি ও মাধার প্রবেশ]

মিনি—কি রে মাধা, কেমন আছিস্? দাদাবাবু আছেন?

মাধা—দিদিমনি যে! খবর কি? এসো—এসো, বাবু পাশের ঘরেই আছেন।

মিনি—যা, না—আচ্ছা বল্‌গে আমি এসেছি। হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছিস্, আমায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছিস্, না রে?

মাধা—আমি?—মোটেই না!

মিনি—দাদার কাছে আর কেউ এখন নেই তো?

মাধা—না কেউ নেই। বামুন-ঠাকুরও চলে গেছে।

মিনি—আচ্ছা মাধা, এসময় তো কেউ আসে না, কেমন না?

মাধা—বাবুর বন্ধুরা আস্‌তে পারেন, তাঁদের আসার তো কোন ধরাবাঁধা সময় নেই।

মিনি—আচ্ছা বল্‌তে পারিস্, রোজ কারা কারা আসেন?

মাধা—নিখিলবাবু আর রথীবাবুই রোজ আসেন।

মিনি—রথীবাবুর আসা বোধ করি একদিনও কামাই যায় না, কেমন?

মাধা—সে কথা তুমিই তো জান বেশী, দিদিমণি!

মিনি—তুইও তা হ'লে জানিস্?

মাধা—হাঁ, বাবুদের মধ্যে সেদিন সেই কথাই তো হচ্ছিল, আমি শুন্‌লুম। তোমার নাকি শীগ্‌গিরই রথীবাবুর সাথে বিয়ে হবে।

মিনি—আচ্ছা মাধা, কি কি কথা হচ্ছিলরে?

মাধা—সকল কথা আমি শুন্‌তে পাইনি। বাবুরা অমন কত রকম গল্প গুজব করেন, চাকর-বাকরের কি সব কথায় কান দিতে আছে?—তাছাড়া ওঁরা এলেই চা আন্‌, পান আন্‌ সিগারেট আন্‌,—এরকম কতশত হুকুম তামিল্‌ কর্‌তে হয়, তাই ইচ্ছা থাকলেও সব কথা শুনবার ফুর্‌সৎ কই? আর ওঁদের কথাবার্ত্তার আদ্ধেক কথাই ইংরাজী!

মিনি—আচ্ছা, তুই তো বাঙ্‌লা লিখ্‌তে পড়্‌তে জানিস্‌, কেমন নয়?

মাধা—তা একটু একটু জানি, তবে ভদ্দর লোকের সব কথার মানে বুঝিনে আর এঁরা কথা কইতে গেলেই তার পোনেরো আনা শব্দ বলেন ইংরাজী! আমি মিথ্যে বল্‌ছিনে, দিদিমণি, তুমি দেখে নিতে পার।

[পাশের ঘর থেকে শোনা গেল, "ওরে মাধা, এ দিকে আয়!]

মিনি—ও প্রশান্তদা,' শোন, এদিকে এসো, আমি—

[প্রশান্তর প্রবেশ]

প্রশান্ত—তুই! মিনি! কতক্ষণ? বস্‌, বস্‌! (মাধাকে) আমায় কেন এতক্ষণ খবর দিস্‌নি?

মিনি—ওর অপরাধ নেই, ও আমায় দেখে তোমার মতই অবাক্‌ হ'য়ে গেছে, কি কর্‌বে ভেবে পায়নি!

প্রশান্ত—না, এ ওর ভারী অন্যায়। কেন, ওকি তোকে কখনো দেখে নি?

মাধা—কি চাই?

প্রশান্ত—না, এখন যা, দরকার হ'লে ডাক্‌ব'খন। হ্যাঁ শোন্‌, নিখিল আর রথী ঐ আস্‌ছে, তাদের নীচের বৈঠকখানায় বস্‌তে বল্‌, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আর দেখ্‌ চা'র জলটা—না, এখন থাক্‌। হ্যাঁ দেখ্‌, ওর আসার খবরটা যেন ওদের বল্‌বিনে বুঝ্‌লি?

[মাধার প্রস্থান]

প্রশান্ত—তারপর মিনি,তুই একা এসেছিস্‌? কি ক'রে এলি, কাকা-কাকীমা জানেন যে, তুই এসেছিস্‌?

মিনি—ওরে বাপ্‌রে, বল কি প্রশান্তদা', তাঁরা জান্‌লে কি আর রক্ষা আছে! কেউ যদি জানে যে, আমি একা দুপুর বেলায় তোমাদের বাড়ী এসেছি, তাহ'লেই হয়েছে আর কি! এখানে মেয়েরা কেউ নেই, এটাকে মেসের বাসা বল্‌লেই চলে, আর মেসের বাসার যে কেমন সুনাম আছে তা

তো জানই। ভদ্রলোকের মেস সম্বন্ধে ধারণা এর মত সাংঘাতিক জঘন্য জায়গা আর ত্রিসংসারে দু'টি নেই ; সেই মেসের বাসায় একা আসা আমার পক্ষে খুব দুঃসাহসের কাজ হয় নি ? —যাক্, এখন সবকিছু বল।

প্রশান্ত—তা ঠিক। তবে তুই কেন এলি ?

মিনি—এসে যখন পড়েছি তখন তো আর চারা নেই।

প্রশান্ত—কেন এলি ?

মিনি—এটা তোমার শোবার ঘর, নয় প্রশান্তদা ? বাঃ সুন্দর সুন্দর ছবি দেখ্‌ছি যে ! এসব কাদের ফটো ? . . . দেখ্‌ছি সব বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদের ছবি। এ কুকুরের ছবিটার মানে কি ?

ও আমার টমার ছবি। জানিস্‌নে, সেই যে সাদায় কালোয় লম্বালোম ওয়ালা কুকুরটা, যাকে তোরা কত আদর কর্‌তিস্—এ তারই ছবি। সেবারে বেচারী হঠাৎ একদিন মারা গেল !

মিনি—আচ্ছা প্রশান্তদা', মাথাটা ঘরদোর তো ভাল পরিষ্কার রাখে না ! তুমি কিছু বলও না বোধ হয় ! তোমরা সব কি ! কোন দিকেই খেয়াল থাকে না ? টেবিলের উপর যতরাজ্যের সিগারেটের আধ্‌খাওয়া টুক্‌রা, দিয়াশলাইর খালি বাক্স, ওখানে কতকগুলি পোড়া দিয়াশলাইর কাঠি, বইপত্র কাগজ, চিঠি, ট্রামের টিকেট, টুথ্‌পাউডারের কৌটো, খবরের কাগজ—কত কি সব ছাই পাঁশ সারা ঘর-ময় ছড়ানো ! জামা কাপড়গুলি এখানে সেখানে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, শেল্‌ফের বইগুলি এলোমেলো ! আচ্ছা তোমার কি অসুবিধা হয় না কিছু !

প্রশান্ত—স'য়ে গেছেরে, স'য়ে গেছে। ব্যাটাছেলের কি অত সব পোষায় বাপু ! যাক্ সব বাজে কথা, এখন তোর কথা বল্।

তা বল্‌ছি কিন্তু আগে তো এমন ছিলে না, জ্যেঠাইমারা সবাই যখন ছিলেন, তখন তো রোজই প্রায় আস্‌তুম, সে বেশ ছিল। এ সব কি অনাছিষ্টিকাণ্ড তোমার !

প্রশান্ত—লোকজনের হাঙ্গামা সইতে পারি নে। কেন, এ তো বেশ আছি, আমার তো কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না ! তারপর, তুই কেন এলি, কি ক'রে এলি তা তো বল্‌লিনে !

মিনি—বিবি-মাসি আমাদের ওখানে গেছ্‌লেন কিনা, অনেক বলে ক'য়ে তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়ী এসেছিলুম। তুমি পাশেই রয়েছ, তাই এলুম।

প্রশান্ত—তা বেশ করেছিস্! কিছু দরকার আছে?—বলে পাঠালেই তো হ'ত।

মিনি—হুঁঃ, তোমার নাকি টিকি দেখ্‌বার জো আছে! ভুলেও তো সাতজন্মে আমাদের বাড়ীর দোরগোড়া মাড়াওনা! এত কি কাজ তোমার?

প্রশান্ত—যাক্, ভূমিকা রেখে এখন কি করতে হবে তাই বল্।

মিনি—একটু দরকার আছে তোমার সঙ্গে।

প্রশান্ত—বে-দরকারে এসে থাক্‌লে ভাল করিস্ নি। তোদের মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান তো খুব কমই আছে।

মিনি—এসে ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, জানি নে, সে আস্‌বার সময় মনেও হয় নি। আর তুমি তো আর পর নও। জ্ঞান অবধি তোমাকেই আপন দাদা বলে জেনে আস্‌ছি। তোমার বাড়ীতেই তো এসেছি, তাতে আর কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে তাতো বুঝিনে বাপু। তোমার বয়েস হয়েছে, চার-চারটে পাশ ও দিয়েছ, তাই তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি।

প্রশান্ত—তোকে আর জেঠামো করতে হবে না। কি বল্‌তে চাস্ বলেই ফেল্ না। তোর সার্টিফিকেটে চাই কি একটা হাকিমী-টাকিমীও মিলে যেতে পারে।

মিনি—তোমায় ঠাট্টা করতে হবে না।

প্রশান্ত—ঠাট্টা কোথায় পেলি?

মিনি—তা যাক্, না হয় ঠাট্টাই নয়। শুনেছ তো আস্‌ছে অঘ্রাণ মাসে—

প্রশান্ত—তোর বিয়ের কথা তো, সে শুনেছি। রথী রোজই এখানে আসে, আজও এসেছে। তা কি হয়েছে, কি বল্‌তে চাস্ তুই?

মিনি—তিনি কেমন দেখ্‌তে, কি তাঁর স্বভাব চরিত্তির, কেমন তাঁর মেজাজ তা কি একবার আগেই জেনে নেওয়া ভাল নয়? বিশেষতঃ—

প্রশান্ত—এখন আর তা জেনে কি লাভ? সব যখন পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। তোকে তো আজকাল বেশ দেখাচ্ছে রে!

মিনি—যাও!

প্রশান্ত—কেন, কি অন্যায়টা হ'ল?

মিনি—এখন শোন। তুমি যে আমায় স্নেহ কর, আজ তার প্রমাণ হ'য়ে যাবে। পার্‌ব না বল্‌লে শুন্‌ব না কিন্তু।

প্রশান্ত—অসম্ভব কিছু বলে বস্‌লে স্নেহের খাতিরেই 'না' বল্‌তে হবে। তা কি কর্‌তে হবে?

মিনি—তোমার বন্ধুর সব কিছু আমায় বল্‌তে হবে।

প্রশান্ত—কি বল্‌তে হবে, কি জান্‌তে চাস্?

মিনি—মেয়েরা বিয়ের আগে যা জান্‌বার জন্যে কৌতূহলী হ'য়ে থাকে। কদিন বাদে বিয়ে হবে অথচ তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে। তিন তিনটে পাশ দিয়েছেন তিনি, আর তোমার বন্ধু—এইমাত্রই শুনেছি। বিয়ে হ'লে তাঁর সঙ্গে আমায় মনের মিল হবে কিনা, কি তাঁর স্বভাব, কি তাঁর মেজাজ—সব কিছুই জান্‌তে চাই।

প্রশান্ত—কি ক'রে জান্‌বি?

মিনি—কেন, তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে।

প্রশান্ত—কি ক'রে শুন্‌বি?—আমার ঘরে লুকিয়ে থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে? তাতে কি লাভ হবে?

মিনি—বিয়ের কথাটাই আজ পেড়ো, কেউ সন্দেহও করবে না, কেননা তা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না—

প্রশান্ত—দূর বোকা কোথাকার! তুই কি ছেলে মানুষ! এখনো এ বুদ্ধিটুকু তোর হ'ল না? তুই কি ভেবেছিস্ তাহ'লেই তুই তোর মত্‌লব হাসিল্ করতে পার্‌বি! তুই মনে কর্‌ছিস্ যুবকরা যখন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, আড্ডা দেয়, তখন তারা সকলেই এক একজন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, কেমন? মানুষ সময় সময় নিজের কাছেই সরল অকপট হ'তে পারে না, অন্যের কথা তো দূরেই থাক্। রথী তোর নাম শুনেই হয়তো এমন ভাবে নাক সিঁট্‌কে হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দেবে বা এমন একটা মত প্রকাশ ক'রে বস্‌বে—যা নাকি সত্যিই তার প্রাণের কথা নয়, হয় তো বলে বস্‌বে যে, তোকে সে বিয়ে কর্‌ছে তোর জন্যে নয়—তোর বাবার অগাধ ঐশ্বর্য্যের খাতিরে। হয় তো সে তোকে ভালোবাস্‌বে না, বাস্‌তে পারে না, তাও বলে বস্‌তে পারে, অথবা তুই তাকে ভালোবাস্‌বি কি না সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্ব্বিকার ভাবও দেখাতে পারে। এর যে কোন কথাকেই হয় তো তুই সত্যি বলে নিবি, আসলে কিন্তু তার মনের কথা তা নয়।

মিনি—তিনি বলেছেন যে—

প্রশান্ত—বল্‌তেও তো পারে, কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এখানে না বলেও অন্য কোথাও যে বলেছে তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই।

মিনি—তাই নাকি!

প্রশান্ত—আমরা সবাই এ রকম ক'রে থাকি। আমাদের জীবনে সব চাইতে দামী যা কিছু—যেমন স্বদেশ প্রেম, পরিবার, ভালোবাসা—সব গুরুতর বিষয়েই আমরা হাল্‌কা ভাবে দেখে থাকি! কেউ যদি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে বা আমাদের মৌখিক আলাপে বা বাইরের ব্যবহার দেখে আমাদের বিচার করে, তাহলে তার চোখে আমরা নেহাৎ অপদার্থ বলেই গণ্য হব। কিন্তু আসলে আমরা তা নই—আমরা হচ্ছি যাকে বলে কাপুরুষ। আমার মনে হয়, ভালর ভণ্ডামির চাইতে মন্দর ভণ্ডামি অনেক বেশী অথচ এটা কেউ তেমন ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে না। এর জন্যে অবশ্য অবাক হবার কোনই কারণ নেই। এ কেবল মন্দর একটা বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র, সুতরাং একে ভণ্ডামি বলা যায় না। আমার বিশ্বাস এই যে, দু'শ্রেণীর ভণ্ড আছে, এদের মধ্যে যারা আসলে মন্দ কিন্তু ভালর ভাণ করে, তাদের দ্বারা জগতের অনেক কুচিন্তা গুপ্ত থাকে, অনেক অসৎ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় কিন্তু এদের তুলনায় যারা আসলে ভাল কিন্তু মন্দর ভাণ করে, তাদের দ্বারাই জগতের বেশী ক্ষতি, কেননা এরা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক কিছুই দিয়ে যেতে পার্‌তেন কিন্তু ভণ্ডামির দোষে তা পারলেন না। মন্দ যারা, তারা তো মন্দই, এতে তো কিছুমাত্র সন্দেহই নেই কিন্তু সৎ সাহস দেখাতে যেয়ে ভালরা মন্দের ভাণ করে। যারা মিথ্যা ভাণের ধার ধারে না, তুলনায় তারাই কিন্তু বোকা বলে সাব্যস্ত হয়।

মিনি—তাহ'লে বল্‌তে চাও, মানুষ মাত্রেই মন্দ?

প্রশান্ত—অন্ততঃ বাইরেটা দেখে তো তাই মনে হয় কিন্তু আমাদের বাইরেটা দেখে বিচার কর্‌লেই তো চল্‌বে না, বাইরের সঙ্গে ভিতরকার যে অনেকটা গরমিল। মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন সকল মিথ্যার আবরণ ভেদ ক'রে সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটে ওঠে, তখন মন্দর পক্ষে ভালর আর ভালর পক্ষে মন্দর মুখোস পরা নিষ্ফল। আমি অনেক সময় দিনের বেলায় যেসব ব্যাপার হেসে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিয়েছি, রাত্তিরবেলায় তারই জন্যে অনুতাপে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছি। কাঁদ্‌তে আমায় কেউ দেখেনি কিন্তু হাসি সবারই চোখে পড়েছে! এর মধ্যে সত্য কোন্‌টা?

মিনি—কেন, এইমাত্র না বল্‌লে—কাপুরুষতা ; তুমি সত্যি বল্‌তে ভয় পেয়েছিলে। এ হচ্ছে কেবল—

প্রশান্ত—কাপুরুষতা ? ঠিক তাই। যাক্‌ তার জন্যে দুঃখ নেই। সময় সময় তাতে বিনয় প্রকাশ পেলেও বেশীর ভাগ সময়েই তা কাপুরুষতা। আমাদের দৈহিক সম্বন্ধে আমরা যতটাই না কেন আস্থাবান হই, এটা ঠিক যে, কোন অজানার কাছে তা নগ্ন ক'রে ধরে দিতে পারি নে। এখানে তোর সঙ্গে আশা করি আমার মতের মিল আছে ?

মিনি—নিশ্চয়ই না।

প্রশান্ত—এমন কি, পাষাণী যে নারী, নারীদের মধ্যে পাষাণীর অভাব নেই, তারাও অনেক সময় দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে কিন্তু সরল ভাবে মনের কথা খুলে বলা—. . .

মিনি—তার জন্যে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

প্রশান্ত—লজ্জারও একটা নৈতিক দিক আছে। কেউ কখনো সজ্ঞানে একজন অজানার কাছে আপনাকে খুলে ধর্‌তে পারে না।

মিনি—আমি কিন্তু তা মনে করি নে। প্রকাশ করা এক কথা আর নিজেকে ঢেকে রাখা আর এক কথা, অবশ্য যতক্ষণ না মানুষে মনে করে যে তার কিছু গোপন কর্‌বার আছে।

প্রশান্ত—যার মনে কোনরূপ ছল্‌-চাতুরী নেই তার মনে কখনো কোন অবস্থাতেই বড় একটা অশান্তি এসে হানা দিতে পারে না। তা অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে, লোকে তা নির্ব্বুদ্ধিতা বলে মনে করে, কিন্তু অনেক সময় ভণ্ডসাধুর বেশ ধরে বেজায় গম্ভীর হ'য়ে সমাজে মিশ্‌তে যায়। সে সকল ভদ্রলোক নিজেদের বড়াই করে এবং সময়ে অসময়ে আপনার সম্মান ও ইজ্জতের দোহাই দেয় আমি তাদেরকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। নিজেদের শক্তির পরিচয় ততক্ষণ পাওয়া যায় না যতক্ষণ না আমরা কাজের ষোল আনা ভার গ্রহণ করি।



গ্রীষ্মকালে কলিকাতা সহরে, উষাদেবীর স্নিগ্ধ-ছবি বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার কনকাঞ্চলখানি নীল আকাশের গায়ে মেলিবার বহু পূর্ব্বেই যেন জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা সহস্র জিহ্বা দিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে; ভোরের পথিক পথ চলিতে চলিতে আতঙ্কে শিহরিয়া বলিয়া উঠে—'রাত না-পোহাতে পোহাতেই রোদ উঠেছে দেখেছ? যেন খাই খাই করছে! এখনও সমস্ত দিনটা প'ড়ে রয়েছে।' এই ভোরের বেলাতেই তাহারা পথের ধারের গাছগুলির ছায়ায় ছায়ায় যাইবার জন্য একদিক হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতে থাকে, মাঝ-পথের ধূলা ইহারই মধ্যে তাতিয়া উঠিয়াছে!

এমনই এক সকালে মিত্র পরিবারের চায়ের পার্ট্ বসিয়াছিল বাড়ীর পিছন দিককার একটি বারাণ্ডায়। ঘরের ভিতরকার পাখার বাতাস অপেক্ষা এখানকার খোলা হাওয়া বেশী শীতল বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সাম্‌নে টেনিস্ কোর্ট, ছাঁটাই-করা ডুরেণ্টা গাছের বেড়া এবং ঘন-সবুজ আম গাছের পিছনে একটি সঙ্কীর্ণ লাল খোয়া বিছান পথ, এই পথের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এক জলাভূমি। তাহাতে জলের লেশ মাত্র নাই, স্থানে স্থানে মাটি ফাটিয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট বাঁশ ঝাড়, নারিকেল গাছ, এবং দু একটি লতা গুল্মের ঝোপ। পথের এক পাশে একটি সরকারী কল, সেখানে ভীড় করিয়া সর্ব্ব দেশীয়া এবং দেশীয় নারী ও পুরুষ কলসী বা লোটা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা বাল্‌তি ভরিয়া জল লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া প্রাতঃস্নান সারিয়া লইতেছে। কোনও শুচিবায়ুগ্রস্থ নারীর মনে হইয়াছে ঐ জল বুঝি তাহার শরীরে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে এবং মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে তীব্র ভাবে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার বহু দূরে ঘটিলেও মিত্র পরিবারের এই বারাণ্ডা হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং কলহ ইত্যাদির শব্দও আসিয়া পৌছে।

চা পান শেষ করিয়া করুণা এবং সুবর্ণ অন্য কোন কাজে গিয়াছেন। শ্রীশ কিছু দিন হইতে বাড়ীতে নাই, বিশেষ প্রয়োজন হইলে আসে, কাজ কর্ম্ম সারিয়া বেশীর ভাগ সময় কারখানায় কাটায়, রাত্রে মায়া এবং কমলার চৌকিদারী করে। আর একটি জিনিস প্রায়ই সে করিয়া বসে তাহার জন্য সুবর্ণের নিকট সে তীব্র মন্তব্য শ্রবণ করিয়াছে, এবং শ্রবণ করিবার পর হইতেই সে অনেকটা সাবধান হইয়াছে। সাধারণত যখন সকলের আহার শেষ হইয়া যায় সে গৃহে ফিরে। এই বদ্ অভ্যাস তাহার বহুকাল হইতেই আছে। মায়া যখন ছিল তখন সুবর্ণ বা করুণার নিকট হইতে তাড়া খাইয়া হাসিয়া বলিত—আমি খেয়ে এসেছি মা—লাবু বৌদি কিছুতে ছাড়্লেন না। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক হাতে মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে আর এক হাত পেটে রাখিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সাবধানে একটু চোখ টিপিত। ইহাতেই তাহার ক্ষুধার শান্তি হইতে বিলম্ব হইত না অবশ্য এই ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপনেই হইত।

বীরেন্দ্রনাথ উপরি উপরি শ্রীশের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দীপ্তিকে বলিলেন—শ্রীশটার কি হল? থাকে কোথা, খায় কি, জানিস কিছু?

নানা রংএর কাজ করা চীনা মাটির পাত্র ভাঙ্গা দিয়া চিত্রিত ভূমির উপর একটি কুশন্ পাতিয়া বীরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসিয়া দীপ্তি খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছিল। মাথা তুলিয়া বলিল—পরশুদিন দুপুরে একবার এসেছিল তার পর আর আসেনি।

বীরেন্দ্রনাথ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উদাসভাবে লাল পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপ্তি পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

এই সময় বেয়ারা একখানি ট্রে্তে করিয়া একটা কার্ড বীরেন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিল। বীরেন্দ্রনাথ তাহা লইয়া দেখিলেন লেখা আছে—

Osit Coomar Biswas.

ইহারই নীচে ছোট ছোট বাঁকান ইংরাজী বর্ণমালার বহু বর্ণের সহিত, (Edin) ; (Cantab), (Lond) ; প্রভৃতি বহু সাঙ্কেতিক শব্দ আগন্তুকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত বলিয়া দিতেছে।

কার্ডখানি হাতে করিয়া চিন্তিত ভাবে পিতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দীপ্তি বেয়ারাকে বলিল—বল্ এখন দেখা হবে না।

বীরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে কি বলে তার ঠিক নেই! যাও সাব্‌কো সেলাম্ দেও—দীপ্তি তুই একটু যা, এই খানেই দেখা কর্‌ব, আর উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

দীপ্তি অপ্রসন্ন মুখে কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে বলিল—কিন্তু যদি বেশী দেরী কর আমি বেয়ারাকে দিয়ে তোমায় ওপরে ডেকে পাঠাব।

পাশের ঘরে এই সময় একটি অপরিচিত ভারী জুতার শব্দ শুনিয়া দীপ্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, কিন্তু উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সে বিনয় সহকারে বীরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনাকে বিরক্ত করলাম হয় ত?—

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—কিছু না—কিছু না, বসুন।

বীরেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশিত চেয়ারটি আরো একটু কাছে সরাইয়া লইয়া উপবেশন করিয়া হস্তস্থিত কালোচামড়ার একটি portfolio সামনের টেবিলে রাখিয়া পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বীরেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া আগন্তুক বলিল—মিঃ এন্, এন্, হাল্‌দার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার নাম অসিত।

বীরেন্দ্রনাথ খামখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে হাসিয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন:—

Dear Dok.

The bearer of this letter is a Miracle Man. He seems to have dropped from the sky! But as I am not the suitable ground for him, I pack him off to you . . . Hope you will appreciate him better, I mean, his schemes He is very rich in them. . . .'

বীরেন্দ্রনাথ যখন পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন সেই অবসরে অসিত তাহার পোর্টফোলিও হইতে কাগজ পত্রগুলি ধীরে ধীরে বাহির করিতেছিল। বীরেন্দ্রনাথ পত্রখানি খামে বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই অসিত একখানি 'টাইপ'করা কাগজ বাহির করিয়া বীরেন্দ্রনাথের সামনে ধরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এই দেখুন সাঁওতাল পরগণায় মুড়াকাটি জায়গাটা প্রায় সমস্ত বিনা খাজনায় দশবছরের জন্মে গবর্ণমেণ্ট আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছে, প্রায় দশ হাজার Acre জমি, দরকার হ'লে আরও পাঁচ হাজার Acre দেবে।—একেবারে সোনা ফলাবার জমি! আমার main crop হবে তুলো। ধার্‌ওয়ার আর গুজরাট অঞ্চলে যে তুলো হয়, আমার মনে হয় এখানে তার চেয়ে কিছু কম হবে না। অন্য কোন cropএর কথা আমি

এখনও ভাবিনি। আমার Motto হ'চ্ছে, one at a time—জমি আমি পেয়েছি, লোকও আমি পাব, কিন্তু অভাব হচ্ছে দুটো জিনিসের, একটা হ'চ্ছে জল দ্বিতীয় আর প্রধান হচ্ছে টাকা।

কথাগুলি বলিয়া অসিত তীক্ষ্ণভাবে বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি ডাঃ মিত্র, এ হ'তে বাধ্য, অবশ্য প্রথম বছর কিছুই আশা কর্‌তে পারিনা, কারণ জমি তৈরী আর জলের ব্যবস্থা কর্‌তেই কেটে যাবে, কিন্তু Second year থেকে চাষ হ'তেই থাক্‌বে।

বীরেন্দ্রনাথ বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। নাতিদীর্ঘ ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটি, মোটা মোটা হাতের আঙ্গুল, দেখিলে মনে হয় অতিরিক্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডগার দিকটা ক্ষয়িয়া চোকোন্ হইয়া গিয়াছে। বর্ণ কালো নয় কিন্তু রৌদ্রতাপের একটা ঝল্‌সানোভাব আছে। মাথার চুল জার্ম্মান ধরণে ছাঁটাই করা। বেশ-ভূষা অত্যন্ত পরিপাটি এবং সাবধানতার সহিত পরিহিত, নড়িতে ফিরিতেও বিশেষ সতর্কতার ভাব দেখা যায়। প্রত্যেকটি creaseএর উপর যেন সর্ব্বদা তাহার দৃষ্টি আছে। দাড়ী গোঁফ কামান. চোখের দৃষ্টি কঠিন এবং সর্ব্বদাই যেন লোভনীয় কিছু দেখিতে পাইতেছে, যাহার অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই। কথা সংযত হইলেও উত্তেজনা এবং সময় সময় অধৈর্য্যের আভাস দেয়।

শিকারী যেমন তীব্র উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখে শিকার জালের দিকে আসিতেছে কি না, সেই ভাবে অসিত বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া অত্যন্ত ধীরে এবং হাল্কাভাবে বলিল—ডাঃ মিত্র, to float this, I must have 80 Laks, and in ten years I gaurantee 8 times 80—

লক্ষপতি বলিয়া বাজারে পরিচিত হইলেও, বীরেন্দ্রনাথ ৮০ লক্ষের নামে যেন বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন। বলিলেন আশি লক্ষ! সে যে অনেক টাকা!—

অসিত। অনেক! বলেন কি ৮০ লক্ষ অনেক টাকা? কিন্তু ডাঃ মিত্র এ কথা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব। আমি ইউরোপের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে দেখেছি। এরকম একটা কোন enterprising কাজে তাদের দেশে টাকার অভাব হয় না। তাই তাদের পক্ষে কাজটা সহজ, তারা সব কাজ কর্‌তে পারে, সব কাজে হাত দেয়। You

won't be surprised Doktor, if I say, that I have already received 25 Laks and it is safely deposited in the Bank, 25 more have been promised by the Princes and Chiefs কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা সকলেই বিদেশী। আমি আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীর sympathy পাইনি। কেউ বিশ্বাসও করেনা আমায়, সম্ভবত আমাকে বোঝবার ক্ষমতা তাঁদের নেই বলেই। আপনি আজ পর্য্যন্ত Famine, আর Flood Relief Committeeতে যত টাকা দিয়াছেন তার একটা মোটা মুটি account আমি জোগাড় করেছি, এর মধ্যে আপনার উদারতার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি বলেই আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু ডাঃ মিত্র, ভিক্ষে দিয়ে মানুষকে কতদিন বাঁচাতে পারবেন? ভিক্ষের চাল কতদিন থাকে? তাদের কাজ দিন তাদের খাটতে দিন; ঐ যে লোকগুলিকে এতদিন আপনারা সবাই মিলে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালেন, কি লাভ হ'ল? আজও আবার তাদের ক্ষিদে পাচ্ছে, খেতে না পেলেই তারা আপনাদেরই গালাগাল দিচ্ছে! আপনার মত আমার যদি টাকা থাকত আমি তাদের কাজ দিতাম, আমার সঙ্গে তারা কাজ করত। দশ হাজার একর জমিতে তিন হাজার লোকের দিন রাত্রি পরিশ্রমের ফল ছয় মাসের মধ্যেই পাওয়া যেত। তখন আরো তিন হাজার লোককে কাজ দেবার কোন অসুবিধেই হ'ত না। আমি sentimentএর বাজে খরচ সহ্য করতে পারি না।

বীরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ভৃত্য একটি ছোট চিঠির কাগজে কি কয়টি লেখা আনিয়া তাঁহার সাম্‌নে ধরিল।

অসিত বলিল—আমি বোধ হয় আপনার সময় নষ্ট করছি—

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—মোটেই তা নয় আপনি বসুন, ঠিক আপনার Typeএর লোক এর পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এ সব কথা ঠিক একদিনে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আপনি আস্‌বেন আবার, সকালেই সুবিধে—agricultureই আপনার এখন প্রধান কাজ তাহ'লে?—

অসিত হাসিয়া বলিল—প্রধান করতে চাই, কিন্তু বেঁচে থাক্‌বার জন্যে আরো দুএকটা কর্‌ছি—বলিতে বলিতে অসিত আর একখানি কাগজ বাহির করিল, তাহাতে তুলা, কয়লা, লোহা, পিতল, চিনি, পাট এমন কত জিনিসের বাজার দর আছে, এবং প্রত্যেকটির গায়ে দরের ওঠা নামা অর্থাৎ শতকরা কিভাবে কম বেশী প্রতিদিন হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা আছে।

Share marketএ বহুদিন হইতে বীরেন্দ্রনাথের মন বিকাইয়া ছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলেন।

অসিত বলিল—সমস্ত গুলোতেই risk করা যায় শুধু কয়লা ছাড়া। আপনি জানেন নিশ্চয়ই আজকাল Railway কি ভাবে অত্যাচার আরম্ভ করেছে। আপনার কেনা মাল বার ক'রে বাজারে আন্‌তে পার্‌বেন না—গাড়ী পাওয়া এক সমস্যার কথা। এই গোলমাল না থাকলে খুব সুবিধে হ'ত। চিনির দর এখন নেমেছে এই বেলা কিছু কিনে রাখ্‌তে পার্‌লে—

বীরেন্দ্রনাথের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিলেন—এখন বাইশ টাকা না?

অসিত। হাঁ কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই সাতাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

বীরেন্দ্রনাথ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অসিতের সঙ্গে কথায় মাতিয়া উঠিলেন এবং ইহার মধ্যে আরো দুইখানি পত্র তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

সমস্ত সকাল অসিতের সহিত এই ভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বীরেন্দ্র নাথ আপনার মনের মধ্যে অত্যন্ত শান্তি পাইতেছিলেন। অসিত উঠিলে,তিনি তাহাকে আবার কোন দিন আসিতে বলিলেন এবং তাঁহার যে এই প্রস্তাবগুলি বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাও বলিলেন।

বিদায় লইয়া যাইতে যাইতে অসিত ফিরিয়া আসিয়া বলিল—By the way ডাঃ মিত্র, আস্‌বার সময় আপনার garrageএ দুটো গাড়ী দেখ্‌লাম, খুব old model বলে মনে হ'ল। আমার কাছে কতকগুলো খুব ভাল up-to-date French car আছে, আমি যেটা এখন use কর্‌ছি সেটা একবার দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, জিনিস কি রকম—আসুন না, আপনার গেটেতেই আছে।

বীরেন্দ্রনাথ অসিতের সহিত চলিতে চলিতে বলিলেন—আমি গাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। দরকার ছিল কিনেছি কাজও চলে যাচ্ছে—তাই ত ভারী সুন্দর দেখ্‌তে ত আপনার গাড়ীটা!

অসিত। কিন্তু ওর গুণ ওর চেহারার চেয়েও ভাল। খুব কম তেল পোড়ে আর একেবারে troublesome নয়। খুব strong আর durable, আমি অনেক গুলো গাড়ী এ পর্য্যন্ত use করেছি কিন্তু এটাই সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল—বলিতে বলিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া পায়ের নীচে একটি স্প্রীংএ ঈষৎ চাপ দিয়া steering wheel সংলগ্ন একটি যন্ত্র কয়েকবার নাড়িয়া দিল—এঞ্জিন চলার সঙ্গে সঙ্গে 'একটা শব্দ করিয়া গাড়ী কাঁপিয়া উঠিল।

অসিত হাসিয়া বলিল—Good bye Doktor.

বীরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিতেই দীপ্তি রাগিয়া বলিল—গেটের গায়ে আমি লিখে দেবো—Trespassers will be prosecuted,—কি ছিনে জোঁক রে বাবা, তিন ঘণ্টা ধরে বকিয়ে মারলে! Eighty Laks গেল ত share market এল, তাতে সুবিধে হ'ল না ত মটর দালালি এল; আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে হয়ত বল্‌ত—আমি জমী বিক্রী করি, নয়ত—Raceএর Tip বলে দিই! কে ও লোকটা?

বীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—Man who knows himself.

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল অসিত মিত্র পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন উপরি উপরি বীরেন্দ্রনাথের সহিত সকালে চা-পান করিল, তাহার পর করুণা ও সুবর্ণের সহিত পরিচিত হইল। কিন্তু দীপ্তিকে সে যেন দেখিয়াও দেখিল না! ইহার মধ্যে কোন তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল না কিন্তু সে যে 'Business man' এবং 'আদব-কায়দা' ইত্যাদিতে সে যে একেবারে অনভিজ্ঞ ইহা সে বার বার স্বীকার করিত যদিও তাহার ব্যবহারে তাহা ছিল না।

করুণাকে উদ্দেশ করিয়া সে এক সময়ে বলিল—এক একটা দিন চলে যাচ্ছে আর আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি আমার কাজের কতখানি সে ক্ষতি করে যাচ্ছে। Energy ক্রমেই যত কমে আস্‌ছে difficulties গুলো ততই প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে! কিন্তু আর দেরী করব না ভাব্‌ছি, খুব Small Scaleএই কাজ আরম্ভ করব এই গরমটা একটু কম পড়্‌লেই। আমি ওখানকার মাটি analyse ক'রে দেখেছি, তুলো ছাড়া, আরও কিছু হ'তে পারে; চিনেবাদাম আলু, ডাল এ সবও হবে মনে হয়, Local marketটা যদি ঐ দিয়ে বজায় রাখ্‌তে পারি তাহ'লে অনেকটা সুবিধেও হবে।

এই সমস্ত কথার সঙ্গেই exchange বা share marketএর বিষয়েও অনেক কথা হইত এবং সপ্তাহ না যাইতে যাইতেই দেখা গেল বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন গাড়ী বেচিয়া নূতন গাড়ী খরিদ করিয়াছেন, চিনির কারবারে কয়েক হাজার টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং প্রতিদিন অসিতের সহিত অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কি সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করেন।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা বীরেন্দ্রনাথকে

বলিতে আসিয়া অসিত শুনিল, সকলে বাহিরে গিয়াছেন। কথাটি অত্যন্ত 'জরুরী' ছিল সেই জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল।

কয়েকদিনের আসা-যাওয়াতে এবং মিত্র পরিবারের সহজ ব্যবহারে অসিত আপনাকে এখানে অসঙ্কোচে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং তাহার এই সঙ্কোচহীনতার মধ্যে আত্মীয়তার আভাসও পাওয়া যাইত বিশেষত চাকর বা বাহিরের লোকের সামনে সে এমন ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিত যাহা হইতে বুঝা যায় যেন তাহার বিশেষ কোন দাবীও আছে।

চাকরের দ্বারা মাঠে একটি চেয়ার লইয়া গিয়া সবেমাত্র সে তাহার সোনা-বাঁধান পাইপটিতে একটি সিগারেট সংলগ্ন করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছে এমন সময় রুক্ষমূর্ত্তি খদ্দর পরিহিত একটি লোককে বাড়ীতে ঢুকিতে এবং ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—কাকে চান?

রুক্ষমূর্ত্তি মাথা তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল—আজ্ঞে না কাকেও বিশেষ চাই না, তবে প্রায়ই এখানে আসি—

অসিত একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—আসেন? কৈ আমিত আপনাকে কোন দিন দেখিনি!

রুক্ষমূর্ত্তি। আমার দুর্ভাগ্য।

কথাটি অসিতের ভাল লাগিল না, বলিল—আপনি বোধ হয় খুব স্বদেশী? চেহারায় ত তার Trade mark রয়েছে দেখ্‌ছি। আপনি smoke করেন? অসিত পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া রুক্ষমূর্ত্তির সম্মুখে ধরিল।

কিন্তু এমন সুন্দর জিনিসটির দিকে না তাকাইয়া রুক্ষমূর্ত্তি বারাণ্ডার দিকে অগ্রসর হইয়া বেহারাকে বলিল—ওরে দিদিমণি ওপরে আছেন?—নেই, কি আশ্চর্য্য অথচ দীপ্তিটা আমায় আজ এখানে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখেছে।

এই কথা কয়টির ফল ফলিল, এবং ফলিবে বলিয়াই রুক্ষমূর্ত্তি বলিয়াছিল।

অসিত বলিল—আপনি একটু অপেক্ষা করতে পারেন, আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা ফির্‌বেন। নয়ত আপনার নাম আমায় দিয়ে যান আমি তাঁদের বল্‌ব।

রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—ধন্যবাদ। কিছু বল্‌বার নেই, এমন কোন দরকারও ছিল না, এমনি দেখা কর্‌তে এসেছিলাম। আপনি বুঝি এখানে প্রায়ই আসেন?

অসিত। হাঁ আজ একটা বিশেষ দরকারী কাজের জন্যে wait ক'রে আছি। Dr. Mitraকে আজ আমার চাই-ই। নইলে তাঁর Business ভারী suffer করবে।

কথা কয়টি বলিয়া বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে রুক্ষমূর্ত্তির দিকে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।

এই সময় বাবুর্চ্চি মহম্মদ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবু ছোট দিদিমণি আপনাকে একটু থাকতে বলে গিয়েছেন, আপনি এখুনি যাবোন না।

রুক্ষমূর্ত্তি কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল—কিন্তু আমার ত আর দেরী করলে চলবে না। মামাকে পড়াতে হবে। আচ্ছা, চল্, একটা slip লিখে যাচ্ছি।

বাবুর্চ্চির সহিত ঘরে আসিয়া রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—ও কে রে মহম্মদ ?

মহম্মদ। কি জানি বাবু কিন্তু বড়া ভারী আদ্‌মী, সাহেবের সাথে কি কারবার করছেন! মটরগাড়ী ভী মোল দিয়া—

রুক্ষমূর্ত্তি হাসিয়া একটি কাগজে কি লিখিয়া মহম্মদের হাতে দিয়া বলিল —আচ্ছা এটা দীপ্তিকে দিস্।

মহম্মদ। কিছু খাবোন না বাবু ?—

রুক্ষমূর্ত্তি বলিল—না আমার দেরী হ'য়ে গেছে। আর একদিন আসব— এখন, সবাই ভাল ত ?

মহম্মদ। হাঁ হুজুর।

রুক্ষমূর্ত্তি বাহিরে আসিতেই অসিত গৃহকর্ত্তার মত হাসিয়া বলিল—আপনি চললেন তা হ'লে ? কিন্তু Excuse me আপনার নাম ত জানিনা, তাঁদের কি বলব ?

রুক্ষমূর্ত্তি। বলবেন কর্পূরীটোলা থেকে শ্রীশ এসেছিল। তা হ'লেই হবে। নমস্কার।

তখন একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে গৃহে ফিরিলেন এবং তখনও অসিতকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন—আপনার খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়, এক জায়গায় আটকা পড়েছিলাম।—

অসিত। আপনাকে একটা খবর দেওয়া বিশেষ দরকার মনে হ'ল তাই বসে আছি।

বীরেন্দ্রনাথ করুণাকে বলিলেন—তাহ'লে এক কাজ কর মা করুণা

আজ Mr. Biswasকে এখানেই খাইয়ে দাও, সেই বেশ হবে চলুন আমার ঘরে।

করুণা হাসিয়া বলিলেন—ওঁর অসুবিধে না হ'লে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

অসিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিল,—না আমার কাজ ছিল ডাক্তারের সঙ্গে—কোনই অসুবিধে হবেনা। একটি নোংরা গোছের ভদ্রলোক এসেছিলেন অ'পনার সঙ্গে দেখা করতে Miss Mitra, খদ্দর পরা, খুব রুক্ষ চুল, আর পায়ে পেশোয়ারীদের মত জুতো, হাতে একটা মোটা লাঠিও ছিল। নাম বল্লেন শ্রীশ, কর্পূরীটোলা থেকে—

অসিতের কথা আর শেষ হইল না, বীরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, দীপ্তিও হাসিতে ছিল।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—My son Mr. Biswas, I am proud of him.

অসিত অবাক হইয়া বলিল—আপনার ছেলে? কিন্তু তিনি এমন ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার কর্‌লেন যেন এ বাড়ীর তিনি কেউ নন্! বল্‌লেন, বিশেষ কোন দরকার ছিল না, এমনি দেখা কর্‌তে এসেছিলাম। কি করেন উনি?

বীরেন্দ্রনাথ। কিছু না। I mean আমরা যাকে 'করা' বলি ও তার ধার ধারে না, প্রথমে ছিল, Archeological depertmentএ, Govtএর কাজ বলে কিছুদিন করে ছেড়ে দিল। তারপর Ancient Civilizationএর ওপর এক লম্বা Thesis লিখে University থেকে একট chair পেল, তাও refuse করেছে। ওর এক খদ্দর তৈরী কর্‌বার কারখানা আছে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।

অসিত গম্ভীর ভাবে বলিল— Funny!

বীরেন্দ্রনাথ। No doubt.

তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন।

করুণা প্রভৃতি সকলে চলিয়া গেলে, বীরেন্দ্রনাথ অসিতকে লইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া বলিলেন—Dinnerএর প্রায় এক ঘণ্টা দেরী আছে, এর মধ্যে আমরা আমাদের কাজটা সেরে নিতে পারি।

অসিত মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া একখানি নোটবুক বাহির করিয়া দেখাইল—এই সাতদিনের মধ্যে চিনি বাইশ টাকা হইতে তেইশ টাকা সাত আনা ন'পাই এ উঠিয়াছে।

বীরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—তাহ'লে ?

অসিত। আমার মনে হয় আর দেরী করা উচিত নয়।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ—thirty five thousand কি বলেন ?—

অসিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার উদ্বেলিত বক্ষ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—মন্দ কি ? প্রথমটা দেখাই যাক না! আমি যেটা এঁচে আছি তাতে উঠ্‌লেই ওটা বেচে দেবো।

বীরেন্দ্রনাথ। বেশ আমি আপনার নামে Cross cheque দিচ্ছি, আপনি Draw ক'রে নেবেন—

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার ড্রয়ার খুলিয়া চেকবই বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

অসিতের দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার হাত দুটি প্রবল বেগে ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক একটি হাস্য-রেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। এবং চেক খানি হাতে পাইতেই তাড়াতাড়ি তাহা নোটকেসের মধ্যে পুরিয়া জামার ভিতরের পকেটে রাখিয়া হাসিয়া বলিল—I will let yon know to-morrow Doktor.

সে রাত্রে ডিনার শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া অসিত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর তাহার মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি একবার শূণ্যে মেলিয়া অক্টোপাসের মত ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনিতে আনিতে বলিল—Half a kingdom ?—and why not the Princess ?

পরের দিন সে আর বীরেন্দ্রনাথের কাছে আসিল না কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফোনে জানাইল—আজকের market price আরো এক টাকা দশ আনা তিন পাই বেশী হয়েছে, কিন্তু সবাই বল্‌ছে, দুএকদিনের মধ্যেই আবার পড়্‌বে। আমরা বোধ হয় একটু বেশী দেরী ক'রে ফেলেছি, যাই হোক আপনার যদি না আপত্তি থাকে আমি একটু wait কর্‌তে চাই, কারণ কেনবার পরই যদি দাম পড়ে যায়—

বীরেন্দ্রনাথ জানাইলেন—কিছু ব্যস্ত হবার দরকার নেই—stake it in the right momet.

ফোন্ ছাড়িয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া অসিত একরাশ ফাইল্ বাহির

করিয়া কি সব দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সেসমস্ত সরাইয়া রাখিয়া আপনার মনে যেন কোন একটি ছবি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—Yes, to put the legitimate right on the Kingdom, I must win the Princess and after that ? long live my Shemes—

ক্রমশঃ

শ্রী—

লোভ বর্জ্জন কর্‌বার তুমি উপায় খুঁজছ, কিন্তু লোভটা এখনকার সভ্য সমাজে আর হেয় বস্তু নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্চে লাভের প্রবর্ত্তক হেতু।

'রাজপথ'



কাহিনী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১

একটী ছবি দেখিয়াছিলাম ; ছবিটী গিওত্তোর আঁকা দান্তের মুখ।

গিওত্তোর আঁকা দান্তের মুখ ; একটী নিষ্পেষিত স্থলপদ্ম মলিন শুষ্ক হইয়া আপনার বৃন্তের উপর দিনান্তে শুকাইয়া পড়িয়াছে ; যে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সে রক্তিম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই সূর্য্যের অস্তমিত কিরণের সহিত তাহারও সকল রক্তছটা ম্লান হইয়া আসিল। মাথায় কাঁটার মত স্থির হইয়া রহিয়াছে—লরেল বিজয়মাল্য। কপালে কালের পাংশু রাজরেখা—রেখায় রেখায় অঙ্কিত আছে—নির্ব্বাসনের পুরস্কার—মৃত্যুর দণ্ড—প্রেমের অভিশাপ। সারাদিন মৃগয়ায় বন হইতে বনে ঘুরিয়াও আসন্ন সন্ধ্যায় একটীও মৃগ মিলিল না ; গভীর কালো ছায়া অরণ্যাণী ঢাকিয়া আসিতেছে ; শ্রান্ত ক্ষুধিত নিঃসম্বল ব্যাধ আগত মৌনমুখী সন্ধ্যার দিকে চাহিতেছে—শ্রান্তিতে, ক্ষুধায়, রাত্রির উপবাসের আশঙ্কায়, আবার প্রভাতের আলোর আশায়। সেই শ্রান্ত ক্ষুধিত দৃষ্টি দান্তের চোখে ফুটিয়া আছে। সারা মুখখানিতে ব্যথা যেন স্নেহকাতর শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; একটী নিবিড় ব্যাকুল আহ্বানে হয়ত এখনি জাগিয়া দুরন্ত শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিবে। এই ছবিটিই দান্তের জীবনের প্রতীক্।

২

দান্তের জীবনের সঙ্গে একটী মেয়ের জীবন গাঁথিয়া আছে। সে তাহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্সেরই এক কন্যা, তাহার নাম বিয়াট্রিস্। দান্তের জীবন—দান্তের কাব্য শুধু এই মেয়েটীকে ঘিরিয়া বহিয়া গিয়াছে। বিয়াট্রিসের সহিত তাহার জীবনের যতখানি সম্পর্ক—সেইটুকু দান্তে Vita Nuovaতে লিখিয়া

গিয়াছেন। নয় বৎসর বয়সে ফ্লোরেন্সের এক আনন্দ-উৎসবের মধ্যে প্রথম এই মেয়েটীর সঙ্গে দেখা। সেদিনকার সেই এক মেঘনিষ্পেষিত ব্যর্থঅরুণোদয়ের রক্তআলোর রঙের পোষাক দান্তের বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাহার পর ফ্লোরেন্সের পথে পথে বিয়েট্রিসের সন্ধানে দিন কাটিয়াছে। প্রায় নয় বৎসর পরে একদিন দান্তে এক পথের ধারে বসিয়া আছেন। সম্মুখ দিয়া বিয়াট্রিস্ সখীদের সঙ্গে চলিয়াছে। লজ্জার হিঙুল রঙে রাঙা মুখখানি মাটীর দিকে আবদ্ধ। ধীরে ধীরে বিয়াট্রিস দুইটী হাত জোড় করিয়া দান্তেকে অভিবাদন করিল। সেই দিন হইতে প্রেম সাহসী হইয়া উঠিল।

তারপর ফ্লোরেন্সে যুদ্ধ বাধিল। দান্তে এক দল সৈন্যের অধিনায়ক রূপে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরে দান্তে শুনিলেন বিয়াট্রিসের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দান্তেও বিবাহ করিলেন। দান্তের বিবাহিত জীবন ভয়ানক অশান্তিতে কাটে। অন্তরে যাহার সমাধি রচনা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—কিছুকাল পরে সেই সমাধিরই অন্তর ফাটিয়া সারা দেহে ও মনে হাহাকার জাগিয়া উঠিল! বিবাহের কিছুকাল পরেই বিয়াট্রিস ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যায়। বিয়াট্রিসের স্মৃতি সকল কর্ম্মের অবসানে তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। এধারে ফ্লোরেন্সে বিবাদ বাঁধিয়াছে পোপের সহিত রাজার। বিচারক—দান্তে। বিচার শেষ হইল। দুই দল হইতে প্রত্যেক দলপতি, যাহারা এই বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের নির্ব্বাসন দেওয়া হউক। পোপের দল হইতে বেশী লোক নির্ব্বাসিত হইল। পরে পোপের দলই জয়ী হইল। তখন দান্তের উপর নির্ব্বাসন দণ্ড প্রচারিত হইল। জীবতাবস্থায় দান্তেকে যে ফ্লোরেন্সের মধ্যে দেখিতে পাইবে—সেই যেন দান্তেকে পুড়াইয়া মারে। দান্তে নির্ব্বাসিত হইয়া রাভেনার নির্জ্জন বনে বহুকাল কাটাইলেন। সেই নির্জ্জন বন্ধুবিহীন একাকীত্বে হারানো দিবসের হাজার স্মৃতি ব্যথাভারাতুর হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বিয়াট্রিসের নাম অনন্তকালের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। তাই এই নির্ব্বাসনে দান্তে অমর কাব্য Divina Comedia রচনা করিলেন। ওধারে পোপ কি মনে করিয়া প্রচার করিলেন। দান্তে যদি ক্ষমা চায় ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিতে পারে? "দান্তে উত্তর দিয়াছিলে—তুমি ক্ষমা কর আর নাই কর—ফ্লোরেন্সে আর ফিরিব না!"

এক অদৃশ্য রম্য জগৎ অনন্ত রূপসম্ভারে দান্তেকে ডাকিয়া লইল।

Divina Comediaতে কবি চলিয়াছেন মৃতাপ্রিয়ার সন্ধানে। যেথানে জগতের সমস্ত ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, যেথানে সমস্ত রূপের শিখা সে কোন্ চির রহস্যময় অমার অন্ধকারে নীরবে নিভিয়া যায়, যেথানে ছিন্ন তন্ত্রী রাগিনীর শেষ মূর্চ্ছনার কোলে সমাধি রচনা করে, সেই মৃত্যুর দেশে কবি প্রথমে চলিলেন—প্রিয়ার সন্ধানে। সহস্র সুরের ঝঙ্কারে রহস্যের চির মেঘাবৃত সিংহদুয়ার ভাঙিয়া পড়িল। জগতের সমস্ত লুপ্ত শিখা আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর কবি চলিয়াছেন আর এক জগতে যেথানে অসহ্য রূপ তাহার নির্ম্মম অপব্যয়ে কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে, যেথানে অম্বর, ধরণীর রূপ-উৎসবে সারা রাত্রির অন্ধকার ধরিয়া আপনাকে শূন্য করিয়া এখন রিক্ততার ভারে শুকাইয়া মরিতেছে, যেথানে হরিণ-নয়না কোনও নারী নির্ঝরিণীর ছায়ায় নয়নের কোলে ধরণী-বাসস্মৃতির মত দীর্ঘ গভীর কৃষ্ণরেখা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে দেখিতে পাইয়া হারানো রূপের জন্য হাহাকার করিতেছে।

যত পথ যায় তত সাধ বাড়ে। প্রিয়ার প্রেমে পথের নেশায় শ্রান্ত হইয়া কবি এক নূতন দেশের তোরণে আসিয়া তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িলেন। সহসা বাতাসে কাহার আগমনীর রথঘর্ঘর বাজিয়া উঠিল। কাহার নয়নের আলো অগ্রদূত হইয়া পথিকের উপর পড়িল। পথিক বিস্ময়ে আনন্দে চাহিয়া দেখিল বিচিত্র রূপময়ী এই তো তাহার মৃতপ্রিয়া। উন্মুখ হইয়া পথিক জিজ্ঞাসা করিল—এই বুঝি তোমার দেশ! বিয়াট্রিস উন্মুক্ত তোরণের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—"হাঁ এই স্বর্গ!"

———

. . . সে দেশের পথের ধূলা এমন কি পুণ্য করেছে, মা, যে তুমি সেথানে পড়ে থাকতে যাবে?

'মেঘ-মল্লার'

———

সংগ্রহ

বাংলার মুসলমান আমাদের রক্তমাংস। তাঁহারা হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার নিমিত্ত ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। তারপর আমরা যাহারা হিন্দু আছি আমাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত। আজ যে বাংলায় শতকরা ৫২জন মুসলমান তাঁহারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। ** বল্লালী নিয়মের কঠোরতাই একমাত্র কারণ। ইহার * * পঞ্চাশ বৎসর পরে গঙ্গার ওপারে এদিকে নয়, সব মুসলমান হইয়া যাইবে। ভেদনীতিতে দেশ দুর্ব্বল বই সবল হইবে না। যদি আত্মকলহ থাকে তবে চিরকালই পরের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।—

জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা। বঙ্গবাসী, ফাল্গুন ১৩৩০।

—আমরা ইংরাজ রাজের স্থলে একজন বা একাধিক ভারতবর্ষীয় সেনানায়কের একতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনেরই প্রতিষ্ঠা দেখিব, প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসন লাভ করিতে পারিব না। এখন ইংরাজেরা যেমন নিজেদের খেয়াল মাফিক বা নিজেদের স্বার্থের সন্ধানে রাজ্য শাসন করিতেছে, তখন ভারতের এই বিজয়ী সেনানায়কও সেইরূপ আপনার খেয়ালমত আপনার ব্যক্তিগত বা পরিবারিক স্বার্থের প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশ শাসন করিবেন। জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী দেশের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে না।

—স্বরাজ্য ও স্বরাজ্যপন্থা—মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩০

"অস্পৃশ্যেরা" সাধারণ সভায় স্থান পাইবে, যে সব স্কুলে অহিন্দু বালক বালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান পাইবে, এরূপ স্থির হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কোন হিন্দু বালক বালিকারা পড়ে, সেখানে কি তাহারা পড়িতে পাইবে না? দেবমন্দিরের মালিকদিগকে এইরূপ অনুরোধ করা হইয়াছে, যে, তাঁহারা যেন "অস্পৃশ্যদিগকে" বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব সুবিধা দেন। হিন্দুব্যতীত অন্যধর্ম্মের লোকেরা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগবদারাধানার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাসভার অনুগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আজকালকার দিনে অনুগ্রহে সন্তুষ্টই বা থাকিবে কে এবং কতদিন? এখন সব মানুষই মানবিক অধিকার চাহিতেছে, এবং তাহা ন্যায্য, স্বাভাবিক ও ধর্ম্মসঙ্গত।

—হিন্দুমহাসভা। প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩০।

আলোচনা

মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকাগুলি লেখকদিগের মনের ক্ষণিক অবসাদ, উত্তেজনা বা ব্যক্তিগত আনন্দের বিজ্ঞাপন দিবার স্থান নহে এ কথা অনেক লেখকেরই মনে থাকে না। লেখকদিগের অনেক রচনার ভিতর দেখা যায়, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে কবে কোন্ দিন কোন্ ষোড়শী রূপসীর প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়াছিল তাহারই একটি ইতিহাস, অথবা জীবনের কোন্ অশুভ লগ্নে কে তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল তাহারই একটি বিলাপোক্তি কিংবা নিজ জীবনের অকৃতকার্য্যতার সুদীর্ঘ তালিকা। এগুলি নিজের জীবনের পক্ষে খুব যে ছোট জিনিস তাহা নহে। কিন্তু এইরূপ রচনাগুলি কাগজে ছাপিতে পারা একটু অসুবিধাজনক। তাই লেখাগুলি যদি কোনও পত্রিকার আপিস হইতে লেখকের নিকট ফিরিয়া যায় তাহা হইলে লেখকের মনে অভিমান হইবার কথা, হয়ত হইয়াও থাকে। তাহার পর তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টার ফলে সেই লেখাই যখন কোনও উচ্চশ্রেণীর কাগজে ছাপা হয় তখন স্বভাবতঃই লেখক মনে করিতে পারেন যে তাঁহার রচনা বাস্তবিকই সুলিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা চিন্তাশীল পাঠক, তাঁহারা রচনা দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করেন, কোন্ পত্রিকায় ছাপা হইল বা কাহার লেখা তাহা দেখিয়া তাঁহারা একদর্শী হন না।

নিজ রচনা ঐরূপ ভাবে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে যে দুর্ম্মূল্য আনন্দ পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটু আত্মশ্লাঘাও আসে। তাহাতেই ভবিষ্যতে লেখকের নিজ রচনার প্রতি আর সেরূপ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে না। গণনায় বহু ও বিবিধ কাগজে ছাপিতে পারার দিকেই তাঁহার তখন মন প্রলুব্ধ হয়। কাজেই রচনাগুলি আর ভাল হইবার উপায় থাকে না।

লেখকদিগের আর এক অবস্থা যে, তাঁহারা লেখা পাঠাইয়াই মনে করেন যে তাহা নিশ্চয় মনোনীত হইবে। যদি পত্রিকার আপিস হইতে সংবাদ পান্ যে তাঁহার রচনা মনোনীত হইয়াছে তাহা হইলে তিনি আশা করেন যে পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রচনাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সেই বারের কাগজে যদি তাহা ছাপা না হয় তাহা হইলে পত্রিকার আপিসে চিঠি লিখিয়া অনেক সময়ে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ভাব প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ যে লেখা মনোনীত হয় তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার সম্পাদন বিভাগ অনেক রকমের হিসাব করিয়া প্রত্যেকবারের লেখাগুলি নির্ব্বাচন করেন। একবারের কাগজ বাহির হইতে না হইতেই অন্য বারের লেখার অধিকাংশ ঠিক করিয়া লইতে হয়। এরূপ পদ্ধতিই অনুসরণ করা

উচিত। যাহারা করেন না, তাঁহাদের প্রত্যেক সংখ্যাগুলিতে একটা একঘেয়ে ভাব থাকিয়া যায়, অথবা নির্ব্বাচিত লেখাগুলির ভিতর অনেক দোষ থাকিয়া যায়। সুতরাং লেখকদের পক্ষে রচনা প্রকাশিত হইবার কাল পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করাই ভাল। সেই অবসরে তিনি অন্য পত্রিকায় তাঁহার লেখা পাঠাইতে পারেন।

প্রত্যেকবারের কাগজ বাহির করিতেই পত্রিকার আপিসের সকলকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। যে ছাপা কাগজখানি পাঠক বা লেখকগণ হাতে পান তাহার জন্য যে কতদিকে কত আয়োজন করিতে হয় তাহা হয়ত অনেক সময় ধারণা করিতে পারা যায় না।

প্রতিদিন পত্রিকা আপিসে শতাবধি চিঠি, রচনা পত্রিকাদি আসে। পত্রিকার আপিসে সেগুলির প্রত্যেকটির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল রচনার সহিত ডাকটিকিট থাকে না, সে সকল রচনা অমনোনীত হইলে ছিঁড়িয়া ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। লেখকেরা কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া হয় ত সেইরূপ কোনও লেখাই আবার ডাকটিকিট দিয়া চাহিয়া পাঠান। তাহাতে যে ফল হয় তাহা লেখকও জানেন, পত্রিকার আপিসও জানে।

লেখক, গ্রাহক ও পত্রিকার কার্য্যালয়ের সকলে পরস্পর সাহায্য না করিলে এরূপ দুরূহ কাজে ত্রুটী থাকিয়া যায়। পত্রিকার কর্ম্মচারীগণ সকলেই নিয়মিত-ভাবে চেষ্টা করেন যে পত্রিকার কোনও অনিয়ম বা ত্রুটী না ঘটে। তাহা সত্ত্বেও যে সকল দোষ ত্রুটি থাকিয়া যায়; লেখক বা গ্রাহকগণ যদি তাহা সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া ক্ষমা করিয়া লন তাহা হইলে সকলের ভিতর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে সকল লেখক কবিতা লেখেন, তাঁহাদের কবিতা যে কেন ছাপা হয় না তাহা তাঁহারা নিজেদের লেখাগুলিকে একটু স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। কেবলই প্রেমের হা হুতাশ, বিচ্ছেদের যাতনা, চুম্বনের লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধার করাই যদি কবিতার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কবিতা লেখা বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। কবিতার ভিতর কবিত্ব না থাকিলে, সৃষ্টির উল্লাস না থাকিলে কবিতা হয় না। অক্ষর মিলাইয়া, এ কবিতা সে কবিতা হইতে লাইন, শব্দ বা ভাব জুটাইয়া লইয়া কবিতা লেখার চেষ্টা না করাই উচিত।

গদ্যে বা পদ্যে যিনি যাহা লেখেন তাহাই কবির কল্পনা শক্তির পরিচায়ক। তিনি শব্দে যাহা সৃষ্টি করিয়া যান, হয়ত শতাব্দীর পর তাহা মানুষের জীবন-ধারায় প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কবি, চিত্রকর ও শিল্পী মানবজাতিকে যে কোনও পথে চালিত করিতে পারেন। লেখকের সেজন্য যথেষ্ট দায়ীত্ব অনুভব করা প্রয়োজন। জাতিকে ধ্বংশের পথে বা আনন্দের পথে এই তিন শক্তিই পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। সেইজন্য ব্যক্তিগত জীবনের ধারণা, অভিজ্ঞতা বা কল্পনাকে সমস্ত মানুষের জন্য যে ভাবে বিতরণ করা যাইতে পারে সেই ভাবেই রচনাগুলি সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কল্লোল

১৩৩০	বৈশাখ	১ম সংখ্যা

কল্লোল

আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।

মনে নাই মোর কোন্ আদিকালে কে দিল এমন ধন্না!
মোর নীল জলে কোন্ গতি হীন
ঝাঁপ দিল আসি কবে, কোন্ দিন?
চিরদিন তরে জাগাইল এই বিপুল রোষের কান্না!

জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে না'ক তার সারা
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক,
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায়, আমি যে বাক্যহারা!

আশা আছে তবু যদি কোন দিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে!

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

বীণা

কারিগরের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয় নি। তার কথা ভাল ক'রে মনেও পড়েনা। সে যেদিন আমাকে একটা দোকানে রেখে গেল, সেই থেকেই যেন আমার জীবন আরম্ভ ব'লে মনেহয়।

দোকানদার প্রথমে ভারী উৎসাহে আমায় ভাল একটা জায়গায় সাজিয়ে রেখে দিল। কেন না তার দোকানে বাঁশী, বেহালা, এস্‌রাজ, সেতার ইত্যাদি কোন রকমেরই বাদ্য-যন্ত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু আমি ছাড়া বীণা তার একটিও ছিল না।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু আমার আদর কমে গেল। সাম্‌নে থেকে পিছনের ধূলোমাখা কোণটীতে কখন্ আস্তে আস্তে স'রে এসেছি, টের পাইনি! অনাদরের কারণ,—আমার খদ্দের জোটেনা। . . .

সে সহরে অনেক ওস্তাদ, অনেক সঙ্গীত-শিক্ষার্থী; কিন্তু বীণ্‌কার একটিও ছিল না, শিখ্‌তেও কারো বিশেষ সখ ছিল না; আমায় বিক্রী ক'রে দোকানদার বেশ দুপয়সা লাভ ক'র্‌বে ভেবে ছিল, কিন্তু কেউ আমার দিকে নজর দিত না। . . .

নতুন জিনিষ ব'লে কেউ কেউ হয় ত জিগেস ক'রে যেত,—এটা কি?—দাম কত?—তার পরই—'ওদিয়ে কি হবে', ব'লে স'রে পড়্‌ত।

কোন কোন দিন কেউ আমার তারে আঙ্গুল দিয়ে যখন টুং টাং শব্দ ক'রে দেখ্‌ত, এমন বেসুরো বেজে উঠ্‌তাম আর ব্যথা পেতাম! তবু খদ্দের এলেই ভাব্‌তাম—আহা যদি আমায় একটু ছুঁয়ে যায় . . . অবহেলা পাওয়ার চেয়ে ব্যথা পাওয়া বুঝি বা ভাল!

আমার নিভৃত কোণটিতে যখন এসে পড়্‌লাম তখন মনে হ'ল যে দোকান-দার শুদ্ধ বুঝি আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছে!

সেখান থেকে দেখ্‌তে পেতাম কত বাজনাই লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে! তখন হয় ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাব্‌তাম,—আহা, আমি কেন সেতার হলাম

না !—নয় ত এস্রাজ—নয় বাঁশী—নয় বেহালা, যা কিছু একটা হ'তে পার্‌তাম ত ! রাগ হ'ত কারিগরের ওপর।—এমন সৃষ্টিছাড়া জিনিষ গড়্‌ল, যে সহরে কেউ তার মর্ম্ম বুঝ্‌ল না ?

একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দোকানে ঢুক্‌লেন। বন্ধুটী একটী এস্রাজের দাম ঠিক কর্‌ছেন, তখন ভদ্রলোকটীর চোখ পড়্‌ল আমার দিকে। তিনি বল্‌লেন এটা বীণা না ?—

দোকানদার বল্‌ল—হাঁ, অনেকদিন প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

দাম জিগেস করাতে দোকানদার দামটা আমার চেয়ে ঢের কমিয়ে বল্‌ল। ভদ্রলোকটী তখন টাকা বার ক'রে আমায় কিনে ফেল্‌লেন।

তাঁর বন্ধুটী জিগেস কর্‌লেন—বাজনা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? সঙ্গীতের ত তুমি বোঝ অনেক !

ভদ্রলোকটি হেসে বল্‌লেন—এইবার আমি শিখ্‌ব। তা ছাড়া বীণা এ দেশে কারো নেই, আমার একটা থাক্।

বন্ধু ঠাট্টা ক'রে বল্‌লেন—যা কারো নেই তাই তোমার চাই, এই সখেই তুমি একটা বীণা কিন্‌লে অত পয়সা দিয়ে ?

দোকানদার ধূলো ঝেড়ে আমায় বিদায় দিল। ভাব্‌ল বোধ হয়—'বাঁচ্‌লাম'।

নতুন মুনিবের বাড়ী এসে আমার এক খোল তৈরী হ'ল ! ধূলো পড়্‌বার সম্ভাবনা আর রইল না। অন্ধকারে নির্ব্বিবাদে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

এখানে এক সুবিধা হ'ল, যে অন্য বাজনার সৌভাগ্য দেখে হিংসে কর্‌বার জ্বালা ঘুচ্‌ল। এখানে আমি একা। লোকজন আসে, আমায় দেখে ; আমার চেয়ে আমার মুনিবের প্রশংসা করে বেশী, যে এমন জিনিষ তাঁর ঘরে আছে ! তাতে আমার বড় ক্ষোভ ছিল না। মনে মনে ভাব্‌তাম—কবে আমায় বাজাবেন আমার প্রভু . . .

প্রভুর সেদিকে খেয়াল নেই !—সুরে বেসুরে কোন রকমেই তিনি আমায় বাজালেন না !—বড় আদরে আমায় ঘরে সাজিয়ে রেখে দিলেন।

শুন্‌লাম সহরে এক ভারী ওস্তাদ এসেছেন। এমন যন্ত্র নেই, যা তিনি বাজাতে পারেন না ! বীণায় তাঁর হাত খেলে সরেস . . . আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

একদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে এলেন! আমাকে টেনে নিয়ে বাজাতে বসে গেলেন। সুরে, ঝঙ্কারে, মীড়ে ঘরের বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল!

প্রতি সন্ধ্যায় আমার মুনিবের বাড়ী লোক ভ'রে উঠ্‌ত। ওস্তাদজী প্রতি সন্ধ্যায় আমায় বাজাতেন, কেউ অন্য বাজ্‌না শুনতে চাইত না! গর্ব্বে আমার মন ভ'রে উঠ্‌ল।

আমার এখন একবেলা বেজে আশ মেটে না . . সকাল সন্ধ্যায় আমার কেবল বাজ্‌তে ইচ্ছে করে।

অনেকে বল্‌ল—ওস্তাদজীর কাছে বীণা বাজাতে শিখ্‌ব—কিন্তু অন্য বীণা ত সে সহরের দোকানে নেই, তাই কা'রো কেনা হ'ল না, শেখাও হ'ল না, . . . কত জনে এসে আমায় শুধু ছুঁয়েই কৃতার্থ হ'ত—আহা, এমন বাজ্‌না জান্‌লে তারাই আগে কিনে ফেল্‌ত . . .

বেজে বেজে আমার মাস বাড়্‌ল বর্ষে, তবে ওস্তাদজীর নাম রট্‌ল তার চেয়ে বেশী, সেটা আমার কেন যে সহ্য হ'ত না তা জানি না!

আরো রাগ হ'ত যদি কোন দিন ওস্তাদজী অন্য সব বাজনা বাজাতে বস্‌তেন! আর লোকে ঠিক সমান ভাবেই বাহবা দিয়ে যেত। মনে হ'ত—এমন হৃদয়হীন যে আমার কথা ভুলে এখন অন্য বাজনা নিয়ে ব্যস্ত! তার চেয়ে যখন কোন শ্রোতা আমার ঝঙ্কার মস্‌গুল হ'য়ে শুন্‌ত, ইচ্ছে কর্‌ত—তারই কোলে যাই। হোক না সে আনাড়ী, তার হাতেই মধুর সুরে বেজে উঠি . . . . যে আমা বই আর কিছুই জানে না, তার সম্পত্তি হ'য়ে সুখ, তার হাতে বেজে সুখ . . .

তারপর সহরে একজন কে এলেন, তিনি নাকি একটা ভাল বীণা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। শুনেছিলেন এ সহরে একটা খুব ভাল বীণা আছে কিন্তু সেটা যে 'বিক্রীর জন্যে নয়' তা জান্‌তেন না।

আমার মুনিবের বাড়ী তখনও লোক সমাগম হয় নি, ওস্তাদজী কেবল অন্যমনস্ক ভাবে আমায় কোলে নিয়ে ঝঙ্কার দিচ্ছেন, আমার প্রভু আরো অন্যমনস্কভাবে শুন্‌ছেন। তিনি এসে কথা না ব'লে বস্‌লেন।

সুরের খেলা শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল! তিনি আর একটু কাছে স'রে এসে বস্‌লেন।

ওস্তাদজী, তাঁকে দেখে ভাব্‌লেন বোধ হয় 'এ গুণী!' হেসে বল্‌লেন—কেমন লাগ্‌ছে?

তিনি বল্‌লেন—অপূর্ব্ব! . . .

ওস্তাদজী সমজ্‌দার পেয়ে গল্প আরম্ভ কর্‌লেন—সঙ্গীত-চর্চ্চা কর কিছু?—

—হাঁ একটু আধটু গাই।

—কিছু যন্ত্র বাজাও?—'

—সামান্যই—'

ওস্তাদজী বল্‌লেন—আচ্ছা একটা গান শোনা যাক, বাজনা ত রোজই হয়।

ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে তিনি আরম্ভ কর্‌লেন।—একটা আগমনীর গান! সে সুরে যেন—আনন্দ-নির্ঝর ব'য়ে চলেছে সে সুর যেন আশায় কাঁপ্‌ছে!

আমার তারে তারে সে সুরের হাওয়া লেগে আমার প্রাণ দুলে উঠ্‌ল! তিনি থাম্‌লেন।

আমি মনে মনে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম—ওগো গুণী, তুমি গাও, থেমো না। আমার ঝঙ্কার তোমার কণ্ঠের সুরের কাছে লজ্জা পেয়ে মর্‌তে চাইছে . . .

সবাই বল্‌ল—আর একটা গা'ন।

আবার সুর উঠ্‌ল . . . লোকের চোখে কানায় কানায় জল ভ'রে এল! শেষ হ'লে একজন বল্‌ল—আগমনীর আনন্দের রেশটা, শেষে বিসর্জ্জনের চোখের জলে ধুয়ে মুছে নিলেন?

গুণী ঈষৎ হেসে বল্‌লেন—ও দুটোর মধ্যে যে আলো-ছায়ার মত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

তাঁর আকাশের মত নির্ম্মল চোখের ওপর যেন একটু মেঘের আভাষ দেখা দিল!

ওস্তাদজী বল্‌লেন—এইবার বাজাও।

তিনি আমায় কাছে টেনে নিয়ে তার বাঁধ্‌তে লাগ্‌লেন।

ওস্তাদজী বলে উঠ্‌লেন—অত উঁচুতে বেঁধ না ছিঁড়ে যাবে . . .

উত্তর না দিয়ে তিনি কস্‌তেই লাগ্‌লেন।

ব্যথায় আমার তারগুলি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির

অতীত আনন্দে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে উঠ্‌ল। কি সুরেই বাজ্‌ব এবার তোমার হাতে, ওগো আমার গুণী। . . .

ওস্তাদজী হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—তুমি বীণা বাজাতে জান না, বল্‌লেই হ'ত? অমন ক'রে তার বাঁধে?—

গুণী আমায় নামিয়ে রেখে দিলেন। বল্‌লেন—ঠিক বলেছেন আপনি। বাজান অভ্যাস নেই আমার, ভেবেছিলাম চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব একবার—থাক্—

তিনি উঠে চলে গেলেন . . .

আমার বুক কান্নায় ভ'রে উঠ্‌ল! নীরব কান্নায় অভিযোগ কর্‌লাম—শুধু ব্যথাই দিয়ে গেলে। একবার বাজালে না? . . . আমার সব আশা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চলে গেলে?—ওগো নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর . . .

বিষম ব্যথায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম। ওস্তাদজী বাজাবার জন্য তারে আঙ্গুল ছোঁয়াতেই সব তার গুলি আমার ঝন্ ঝন্ শব্দে ছিঁড়ে গেল . . . বিরক্ত মুখে তিনি আমায় খোলে পুরে রাখ্‌লেন।

সে দিনের পর আর আমার প্রভুর বাড়ীতে সঙ্গীতের বৈঠক বসেনি। আমি অন্ধকারে আপন মনে গুণীর পরশ পাবার ধ্যান করছি। বাইরের কোন কোলাহল আমার ছিন্নতন্ত্রীতে আর সুরের স্পন্দন জাগায় না . . . নতুন তারে নতুন করে কেউ আমায় আর বাঁধ্‌বে কি?—কে জানে? . . .

শ্রীসুনীতি দেবী

* * * * *

. . . সত্যিকারের একটা দুঃখই মানুষের থাকে, সেটার ভাগ সে কারুকে দিতে পারে না . . . মানুষ সব দেয় জগতে, শুধু ঐটুকু নিজের ব'লে রাখে। তাতে কারুর হাত দেবার অধিকার নেই—বুঝি দেবতার ও নয়। . . .

"জয়মালা"

মা

বসন্তের প্রারম্ভেই তিন চার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঝড় বাদলের রুদ্র-মাতন্ সুরু হইয়াছিল। তাহাতে আর কাহারও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু ডুখন সর্দ্দারের কুলি ধাওড়ার সুমুখে যে ক্ষুদ্র বাগানটা ছিল, তাহার প্রায় সমস্ত আম গাছের মুকুলগুলি খসিয়া পড়িল এবং খড়ো ঘরের চালটাও প্রায় উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতর জল-প্রবেশের পথটা পরিষ্কার করিয়া দিল।

সেদিন মেঘ্লা, শীত-শীত সকালে ডুখন ঘরের চালায় লেপ মুড়ি দিয়া বসিয়াছিল, ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ঝরা-মুকুলের বেশ একটা স্নিগ্ধ-মধুর মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। দেখিল, গত রাত্রে ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপিতে ঝরা মুকুল ও কচি পাতায় সমস্ত বাগানটা ভরিয়া গিয়াছে।

প্রত্যূষে উঠিয়াই পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। সূর্য্য না দেখিয়া জল-গ্রহণ করিত না। গত দুই দিন সূর্য্যদেব কৃপা করিয়া তাহাকে দর্শন দেন নাই,—তাহারও জল-গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু কি করিবে, বুড়া বয়সে ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া যদি কিছু কষ্ট হয় তাহা সহ্য করিতে হইবে বই কি! নিজের গত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সেখানে ত পুণ্যের অংশ এতটুকু দেখিতে পায় না! যৌবনে যখন তাহার শিরায় শিরায় গরম রক্ত প্রবাহিত হইত, তখন সে ঠাকুর দেবতাকে বিশ্বাসও করিত না এবং তাহার মনে হয়, বোঙার (দেবতার) কাছে মাথা না নোয়াইবার শাস্তি সে হাতে হাতে পাইয়াছে। এমন একদিন ছিল, যেদিন এই কুলি ধাওড়ার কুঁড়ে ঘরটাই তাহার ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনে ভরিয়া থাকিত। আজ বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে আছে শুধু সে নিজে, আর পনর ষোল বছরের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী—পরী। যাক্, সে সব অনেক কথা।

পরী তালপাতার বড় ছাতিটায় আপাদ মস্তক ঢাকিয়া তপসীর হাটে চাল-ডাল কিনিতে যাইতেছিল, ডুখনকে চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া বলিল,—আজও কি খাবি নাই না কি হে জেঠা?

দুখন পরীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, সূর্যি যে উঠল নাই, পরী-মা ?

—ই বছর যদি না উঠে সূর্যি, তুই খাবি নাই, তাই বলে ?

—হাটে যেছিস্ ?—যা। আমি দেখি, যদি সূর্যি উঠে।

তুই তবে দ্যাখ্ জ্যেঠা, আমি চল্লম—বলিয়া পরী চলিয়া যাইতেছিল, দুখন বলিল, বলদটাকে চারটি খেড় দিয়ে যা পরী, আর অম্নি দেখে যা মুরগীগুলা বেরোল কি না।

বলদের মুখের নিকটে আঁটি দুই খড় আগাইয়া দিয়া এবং মুরগীগুলাকে বাহির করিয়া, পরী বাগানের পাতা ও মুকুল-ঝরা পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে একটা আমের মঞ্জরী মাথায় গুঁজিয়া লইল। মেঘে মেঘে অন্ধকার প্রান্তরের উপর হইতে ঝড়ো হাওয়ার সাথে তাহার আনন্দ-সঙ্গীতের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল—

সে এলে মার্‌বো কুঁকুড়ি গো,—
মার্‌বো কুঁকুড়ি *—!
তাকে আমি খেতে দিব, পায়রা ঘুঘুড়ি গো—
পায়রা ঘুঘুড়ি †—!
পিয়ারী—আস্‌বি কবে ?
ও পিয়ারী, আস্‌বি কবে— ?
আ—মার পি-য়া-রী !

গাছ ও পাতার ভিড়ের মাঝে মেঘহানা পূব-গগনের যে ঈষৎ ফাঁকটুকু দেখা যাইতেছিল, বৃদ্ধ দুখন্ একাগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, যদি একটিবারের জন্যও সূর্য্যদেব করুণা করিয়া দেখা দেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কয়েকবার ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টিও হইল, কিন্তু সূর্য্যের দেখা পাওয়া দূরে থাকুক, আকাশের গায়ে মেঘে মেঘে জটলা আরও গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল।

আজ এই বাদল-করুণ সকালে অনেক কথাই তাহার মনে হইতেছিল। সুখে দুঃখে জীবনের অনেক ক'টা দিন সে কোন রকমে পার করিয়াছে, বাকী আছে মাত্র আর কয়েকটা দিন। অসুরের মত বলবান্ তাহার এক ভ্রাতা এবং দুইটি পুত্র ছিল। তাহারা চারজনে মিলিয়া কয়লা কুঠিতে কাজ করিত। আহারের

* মোরগ। † ঘুঘু

সংস্থান করিতে গিয়া পয়সার পরিবর্ত্তে তাহারা গায়ের রক্ত দিয়াছে। দুবেলা পেট পুরিয়া খাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া গায়ের যে রক্তটুকু জমা করিত, মনিবের পায়ে সেটুকু ঢালিয়া দিয়াও যখন কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, তখন তাহারা প্রাণ দিতেও কসুর করিল না। সেই কয়লাখনির পাতাল-গহ্বরের ভীষণতম স্থানে কয়লা কাটিতে গিয়া একে একে তাহারা সমাধিস্থ হইয়া রহিল,—বেদনা দুর্ভোগ সহিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিল, সে নিজে! কিছুদিন পরে পুত্র-শোকাতুরা তার স্ত্রী চলিয়া গেল। এক কন্যা ছিল,—সেও গেল। কন্যার শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনাটাই তাহার বেশী করিয়া মনে হয়। সিদ্ধেশ্বরী কুলিধাওড়ায় এক সাঁওতাল যুবকের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং সবল শরীর দেখিয়া দুখন তাহাকেই কন্যাদান করিয়াছিল। বিবাহের পর হইতেই মেয়েটা নিজের স্বামীর দুশ্চরিত্রের কথা দুখনকে মাঝে মাঝে জানাইত কিন্তু দুখন সে সব কথায় কোনদিনই বিশ্বাস করিত না। ভাবিত, হয়তো ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি হইয়াছে তাই মিথ্যা বলিতেছে। কিন্তু তাহার ভুল-সন্দেহ সত্য বিশ্বাসে পরিণত হইল সেইদিন, যেদিন সে অভাগীর মৃত্যু-শয্যায় তাহার ডাক পড়িল। সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় গিয়া দেখিল,—কন্যা মরণের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। পিতাকে দেখিয়াই ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতেই কন্যার দুচোখ ছাপাইয়া জল আসিল, অতি কষ্টে বলিল,—বিষ খেয়েছি বাবা, আমাকে আর বাঁচাস্ না—আমি চল্লম্।

আঃ, অভাগী মা আমার! বৃদ্ধ দুখন্ আর ভাবিতে পারিল না।—এমন সময় দেখিল, মোটা কাপড়ের এক প্রান্তে ডাল তরকারী ইত্যাদি বাঁধিয়া হাটের ফেরত পরী, বাগানের পথ ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকেই আসিতেছে। পথে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া তাহার তালপাতার ছাতি বহিয়া জল গড়াইতেছিল,—পরণের কাপড়খানাও স্থানে স্থানে ভিজিয়া গিয়াছে।

ঘরের চালার উপর ছাতিটা এক কোণে নামাইয়া রাখিয়া, অঞ্চল হইতে তরকারীগুলা নামাইয়া বলিল,—দু'জনার মতন রাঁধি তাহ'লে,—কি বল্, জ্যেঠা? . . . এঁ্যা, ই কি! তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেনে?

দুখন্ চোখের জলটা সাম্‌লাইয়া লইতে পারে নাই, তাই তাড়াতাড়ি হাত দিয়া জলটুকু মুছিয়া লইয়া কহিল,—না, কাঁদি নাই পরী। . . . তুই ওগুলা রেখে আয়—এই খানে বোস্। একটা কথা বল্‌ব।

পরী তুখনের কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, বল্ কি কথা, এখনই বল্ শুনি।

—ওইগুলা রেখে আয় এগুতে।

—না, রাখ্‌ব নাই, তুই বল্ কেনে কি কথা ?

তুখন্ পরীর মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, আরও এইদিকে স'রে আয়, বলি।

পরী আরও কাছে সরিয়া একেবারে বৃদ্ধের কোল ঘেঁসিয়া বসিল। তুখন তাহার দুর্ব্বল শীর্ণ হাতখানা একবার তাহার মাথার উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া পুনরায় সরাইয়া লইল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তুই কখনও বিয়া কর্‌তে পাবি নাই পরী।

বৃদ্ধ আরও কিছু বলিবে ভাবিয়া পরী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তুখন বলিল,—মিছে কথা লয়—বল্ মা বল্। ই বুড়ার কথা রাখ্‌বি কি না বল্। . . . তুখন্ পরীর হাত দুইটা বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিল।

অ, এই কথা!—হঁ রাখ্‌ব ছাড়্। বলিয়া পরী তাহার হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, ভাত রাঁধি তাহ'লে, খাবি তো ?

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, না।

২

গত তিন দিন জলটুকু পর্য্যন্ত না খাইয়া বৃদ্ধ তুখনের আজ আর উঠিবার শক্তি ছিল না। অতি কষ্টে দু'একটা কথা কহিতেছিল মাত্র।

হু হু শব্দে ঝড় বহিতেছিল। আমের বাগানে যে কয়টা মুকুল অবশিষ্ঠ ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল। এ বৎসর অপর্য্যাপ্ত মুকুল দেখিয়া তুখন্ ভাবিয়াছিল, আম বেচিয়া কিছু টাকা করিতে পারিবে, কিন্তু সে আশাটুকুও যখন রহিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া পরীকে বলিল, পরী মা, আম এ বছর কিছুই হবেক্ নাই,—তা না হোক্, ধান যা রইল তাতে কিছুদিন চল্‌বেক্। টাকাও কিছু আছে, লয় ?

পরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হঁ।

বুড়া বয়স পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজে এক বেলা খাইয়া তুখন যে

টাকাগুলি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা যে আজ পরীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারিতেছে, ইহাতেই তার অপরিসীম আনন্দ!

অন্তিমকাল যে ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং সে যে আর বেশীক্ষণ বাঁচিবে না, এ কথা দুখন্ প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সে অপ্রিয় সত্যটা পরীর নিকট কোন প্রকারেই প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। দু' একবার বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। বুকের ভিতর প্রাণ-পোড়ানী জ্বালা লইয়া বৃদ্ধ মৃত্যু-শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পিপাসায় বৃদ্ধের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কথাগুলা তাহার মুখ হইতে অতি কষ্টে উচ্চারিত হইতেছিল দেখিয়া পরী তাহার মুখের নিকট এক ঘটি জল ধরিয়া কহিল, খা জোঠা, একটুকু জল খা। তুই অমন্ করিস্ না।

ভ্রাতুষ্পুত্রীর এ স্নেহের অত্যাচার অন্যায় না হইলেও দুখন হাত দিয়া জলের পাত্রটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না।

ভর্ৎসনার কোন কথাই মুখ দিয়া বাহির হইল না। মনে হইতেছিল, বৃদ্ধের চোখ ফাটিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে!

দুখন্ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ ঝড়ের একটা দম্‌কা ঝাপটে তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরের কবাট দুইটা খুলিয়া গেল। পরী উঠিয়া দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, দুখন্ বলিল,—কে,—লামা?

তাহারই সমবয়স্ক লামা মাঝি দুখনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে থাকিত তিন নম্বর কুলি ধাওড়ায়; পরী বলিল, লামাকে ডাক্‌ব জোঠা?

সে যেন তাহারই মত কোন বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অতিশয় আগ্রহের সহিত মাথা নাড়িয়া দুখন্ কহিল—হঁ—হঁ।

পরী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া লামার ধাওড়ার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল, বাহিরে প্রবল ঝড়ের সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে এবং জমাট মেঘের গাঢ় অন্ধকারটাও ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে। পরীর আনন্দ হইতেছিল,—বুঝি বা এইবার সূর্য্য উঠিবে।

তিন নম্বর কুলি-ধাওড়ার যে ঘরটায় লামা মাঝি থাকিত, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই, লামার পুত্র টুরা জিজ্ঞাসা করিল,—অই, পরী যে! ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এলি?

পরী ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটু সাম্‌লাইয়া লইল; বলিল,—তুর বাপ্ কোথা টুরা ?

—ঘরে নাই, কেনে ?

—কোথা গেইছে ?

—সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায় চুল্‌নী মেঝেনীর ঘরকে।

পরী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়া সেখান হইতে অনেক খানি পথ, কাজেই অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে সেই দিকে চলিতে লাগিল।

টুরা বলিল, ওই দাঁড়ালি নাই যে? তার সথে তুর কি কাজ বল্ কেনে ?

পরী তখন অনেকখানা চলিয়া গিয়াছে। টুরার কথাটা শুনিতে পাইয়াও কোন উত্তর দিল না।

সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়া হইতে লামাকে সঙ্গে লইয়া পরী যখন তাহাদের কুটীরে ফিরিতেছিল, তখন আকাশের এক কোণে সূর্য্যের ঈষৎ আভাষ দেখা দিয়াছে। পরী তাড়াতাড়ি হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া লামাকে বলিল, তুই চল্‌তে লার্‌ছিস্ না কি বুড়া ?—হ দেখ্ সূয্যি উঠেছে, আমি চল্লম, তুই পেছুতে আয়।

ভুখনকে কিছু খাওয়াইবার জন্যই পরী লামার আগেই ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া ডাকিল,—জ্যেঠা,—ও জ্যেঠা! . . .

কোন সাড়া শব্দ পাইল না। অথচ ভুখনের স্পন্দন রহিত চক্ষের অনিমিখ চাহনি সকরুণ ভাবে তাহারই মুখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! . . .

পরী সভয়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া ভুখনের গায়ে হাত দিয়া আবার ডাকিল,—জ্যেঠা গো—'

জীবন-হীন মৃতদেহটা তেম্‌নি নিসাড়!

পরী জোর করিয়া তাহাকে একবার নাড়া দিতেই কাঠের মত শক্ত হিম-শীতল দেহটাও নড়িয়া উঠিল। এতক্ষণে পরী বুঝিতে পারিল, তাহারা ফিরিয়া আসার সময়টুকু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার অবসর সে পায় নাই, তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে! . . .

বেদনার গুরুভার পরীর কণ্ঠ ছাপাইয়া উঠিতেছিল। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটা শুষ্ক আম্‌ড়া গাছের ডালে দুইটা কাক খাঁ খাঁ করিয়া চীৎকার করিতেছিল। গাছের পাতা বাহিয়া এখনও দু'এক

ফোঁটা জল ঝরিতেছে আর সুদূর আকাশে ছিন্ন মেঘের পাশে পাশে গোটা দুই চিল্ উড়িয়া উড়িয়া ঘুরপাক্ খাইতেছে। . . . সম্মুখে আমবাগানের পাতা-ঝরা পথে পায়ে চলার খস্ খস্ শব্দ হইতেই পরী সেই দিকে তাকাইয়া দেখিল, বৃদ্ধ লামা বাঁশের লাঠি খানি হাতে লইয়া বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার আশায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছে।

৩

একা ঘরে পরীর বেশ মন টি কিতেছিল না। এই নিঃসঙ্গ জীবনটা কোন রকমে টানিয়া হিঁচ্ড়াইয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কেমন যেন অসম্ভব বোধ হইতেছিল। ভরা যৌবনের জাগরণ যে তাহার মধ্যে অনেকদিন সুরু হইয়াছে তাহা সে নিজে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিত এবং সেইজন্য সময় সময় তাহার মনেও হইত—বিবাহ করিলেও বা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দিন গুলা কাটিতে পারে কিন্তু তাহাও যে সম্পূর্ণ অসম্ভব! পিতৃব্যের কঠোর আদেশ মনে পড়িত, বৃদ্ধের কাতর মিনতির কথা ভাবিতেই কে যেন জোর করিয়া তাহার সে চিন্তার পথটা রুদ্ধ করিয়া দিত। . . . না—না, বিবাহ সে করিবে না!

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পরে, বলদটার মুখের গোড়ায় জাব্না ধরিয়া দিয়া, কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়া পরী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় টুরা ধীরে ধীরে সেইখ্যানে আসিয়া দাঁড়াইল। লামা এবং টুরা প্রায় প্রত্যহ আসিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যাইত।

টুরাকে বসিতে বলিয়া পরী বলিল, আর তো চাল ধান কিছুই নাই টুরা, ইবারে কি কর্‌ব বল্ দেখি?

টুরা চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিল; বলিল, খাদে খাট্‌তে যাবি? . . . পার্‌বি তো?

—হঁ, তা ছাড়া আর কি কর্‌ব বল্?

উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কে যে কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। টুরা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, পরী . . . সেই কথাটা?

—কি কথা?

টুরা আর একবার ঈষৎ হাসিল। কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির না হইলেও পরী এই আবাল্য পরিচিত যুবকের স্মিত হাস্য এবং অঙ্গের গতি-ভঙ্গির মধ্য দিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার এই সংযম-সংযত গোপন-বাণী কি কথা প্রকাশ করিতে চায়!

লজ্জারক্ত মুখে ঈষৎ মুখভঙ্গি করিয়া পরী কহিল,...আ-মর্, খাল্‌ভরা!

কথাটা বলিয়াই পরী ঘরের মধ্যে উঠিয়া যাইতেছিল, টুরা খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—ব'স্ ব'স্. শুন্। বিয়া তো তুখে কর্‌তেই হবেক্ পরী তেবে এমন্ করছিস্ কেনে? . . . বিয়া কর্‌বি নাই? . . .

পরী জোর করিয়া বলিল,—না। . . . ছাড়্, হাত ছাড়্। টুরা হাত না ছাড়িয়া হাতখানা বরং আরও জোরে চাপিয়া ধরিল।

সাঁওতাল যুবকের শক্ত মুষ্টির চাপে পরীর হাতটা টন্ টন্ করিয়া উঠিতেই, সে যন্ত্রণায় উঃ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। টুরা হাত ছাড়িয়া দিল। পরী বলিল,—টুরা, তুই আজ যা। কাল খাদে কাজ কর্‌তে যাব—তখন বল্‌ব।

টুরা আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া পরীর মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। স্বাস্থ্য এবং যৌবনের চিহ্ন তাহার কালো মুখে ঢল ঢল করিতেছিল।

টুরা ধীরে ধীরে উঠিয়া উঠানে নামিল। ভাবিল, পরী কিছু বলিবে, কিন্তু চুপ করিয়া পরীকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, টুরা আর একবার তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, আমি তাহ'লে আজ চল্লম পরী, কাল বলিস্।

ঘরের ভিতর হইতে পরীর গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল—হঁ, বল্লব।

দুইটা বিরুদ্ধ মনোভাব তাহার মনের মধ্যে তাল ঠুকিয়া এমন ভাবে লড়াই বাধাইয়া দিল, যাহার জন্য সে রাত্রে পরী না পারিল রাঁধিয়া খাইতে, না পারিল অন্য দিনের মত নিশ্চিন্ত ঘুমাইতে।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই উনান ধরাইয়া পোয়া খানেক চা'ল সিদ্ধ করিয়া ফেন ও ভাত খাইয়া কাজে বাহির হইল। একবার ভাবিল, কাজ করিতে গিয়া কাজ নাই। আবার ভাবিল, না গেলে খাইতেও পাইবে না, হয় তো উপবাস দিয়া মরিতে হইবে। কি করিবে, বাধ্য হইয়া যাইতে হইল।

পাঁচ নম্বর খাদে অন্যান্য কুলি রমনীদের সহিত সে-ও ঝুড়ি মাথায় দিয়া টব গাড়ীতে কয়লা-বোঝাই দিতেছিল। ঘণ্টা খানেক কাজ করিবার পর, পাশের

অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে কে যেন তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। পরী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে টুরা দাঁড়াইয়া আছে, বলিল, ও, সে—ই কথা ?

টুরা কাপড় ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে সেই অন্ধকার গলি রাস্তার মধ্যে আনিয়া বলিল,—হঁ, সেই কথা বল্‌বি আয়। . . . আয়, জল্‌দি আয়।

টুরার কণ্ঠস্বরে যেন কত মিনতি-কাতর আগ্রহের ব্যাকুলতা !

পরী কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিল। কয়েকটা সরু অন্ধকার গলি রাস্তা পার হইয়া তাহারা খাদের ভিতর অনেক দূর আসিয়া পড়িল।

কাহারও মুখে কোন সাড়াশব্দ নাই।

টুরা আগে আগে চলিতেছিল। পরী সন্দেহ-দোদুল বক্ষের আলোড়ন ধীরে চাপিয়া তাহার পশ্চাতে !

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে টুরা হঠাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। পরী বলিল, না টুরা, আমি বিয়া করব নাই।

টুরা কোন কথা না বলিয়া পরীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল। কি একটা কথাও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। শুধু অন্ধকারের মধ্যে দুইটা ব্যাকুল দৃষ্টি জল্ জল্ করিতে লাগিল।

এই নিভৃত নির্জ্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তাহারা দুইজন ! নিশ্বাসের শব্দ, এমন কি বক্ষের প্রতি স্পন্দনটিও শোনা যায় ! টুরার হস্তস্পর্শে পরীর সর্ব্বাঙ্গ যেন কিসের উন্মাদনায় শিহরিয়া উঠিতেছিল ! পরী জোর করিয়া একবার তাহার হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। . . . আর একবার চেষ্টা করিল, সেবারেও মনে হইল, শরীরের সমস্ত শক্তি সে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল !

৪

একটা বৎসর কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া যে সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পার হইয়া গেল, পরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। . . . অনেকদিন অনেক কথাই ভাবিয়াছে কিন্তু কোন কথারই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই !

যেদিন হইতে পরী বুঝিল যে সে কোন্ এক অজ্ঞাত শিশুর জননী হইতে চলিয়াছে, সেইদিন হইতে টুরার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নিজের প্রতিও ঘৃণা কম হয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহাকে ক্রমাগতই সে পাপ হইতে বিরত করিতেছিল।

এখন টুরাকে দেখিলেই তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে খুন করিতে ইচ্ছা হয়। টুরা স্বামীত্বের দাবী লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে পরী তাহাকে গালাগালি দিয়া বিদায় করে, কোনদিন বা নিজেই পলাইয়া যায়।

এম্‌নি করিয়া তাহার দুর্ব্বিসহ জীবন ধিক্কার এবং আত্মগ্লানির মধ্য দিয়াই কাটিতেছিল, এমন সময় একদিন লামা আসিয়া টুরার সহিত তাহার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিল।

পরীর মনে হইতেছিল, ইহা অপেক্ষা লজ্জা দুনিয়ায় বোধ হয় আর কিছুই নাই। . . . কেন সে মরিতে পারিতেছে না! . . . কেন?

লামার মুখের সুমুখেই পরী বলিয়া বসিল,—না—কিছুতেই বিয়া করব নাই আমি। তুখে আর সাউকারী মারাতে হবেক্ নাই বুড়া,—তুই যা।

লামার বহু অনুরোধেও যখন পরীর মন ফিরিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া লামা বলিল,—স্থাখ্, পরী, তুই ত ছেলেমানুষ ল'স। তবে কেনে আমার মুখ পোড়াছিস্। টুরাকে বিয়া করবি কি না বল্।

পরী জোর করিয়া অসম্মতি জানাইল যে সে কোন প্রকারেই বিবাহ করিবে না। টুরাকে একবার এক্‌লা পাইলে সে তাহাকে খুন করিবে, না হয় নিজেই মরিবে।

সেইদিন লামা চলিয়া গেলে, পরী সত্যসত্যই আত্মহত্যা করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তিন নম্বর খাদের আগুনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধ্বসিয়া-যাওয়া একটা ফাটল্ বাহিয়া আগ্নেয়গিরির মত অজস্র ধূম ও অগ্নিশিখা হু হু শব্দে নির্গত হইতেছিল। পরী সেই ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাহার সমস্ত শরীর ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহারই গর্ভে একটি অজাত শিশুর নিষ্কলঙ্ক কচি মুখের কথা মনে হইতেই কে যেন তাহাকে সে আসন্ন মৃত্যু হইতে ফিরাইয়া আনিল। পরী প্রাণপণে

ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দূরে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল!

৫

কয়েক পশ্‌লা বৃষ্টি হইবার পর, বর্ষার মেঘ চারিদিকে থম্ থম্ করিতেছে! আসন্ন-প্রসবা পরী অতিষ্ঠ হইয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে ছট্ ফট্ করিতেছিল। . . . যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই যেন মৃত ভুবনের তীব্রকঠোর দৃষ্টি জল্ জল্ করিতেছে! . . . অসহ্য যন্ত্রণা! এই বুঝি তাহার শেষ মুহূর্ত্ত!

পরী কোন প্রকারেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া সে ঘরের বিভীষিকার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাণপণে সেখান হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল। কিয়দ্দূর আসিয়াই দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বাহিরে তখনও ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের গুরু-গর্জ্জন থামে নাই!

অতি কষ্টে পরী বাহির হইয়া আসিল। হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে সুমুখের আম বাগানের একটা বৃক্ষের নীচে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে প্রসব হইল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রসূতি কিছুক্ষণ মৃতের মত পড়িয়া থাকিবার পর চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল, তাহারই গর্ভজাত এক পুত্র-সন্তান ধূলি-মলিন ভূমি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কান্না সুরু করিয়াছে। . . . মেঘের গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে। জলে ধোওয়া গাছের পাতায় পাতায় রৌদ্রের ছটা চিক্‌মিক্ করিতেছে। এতক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের যে শাসন-বাণী স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সে চমকিয়া উঠিতেছিল এবং তাহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে না-পারার যে দুঃসহ যন্ত্রণা তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, এই সদ্যজাত অরুণালোক-বিধৌত শিশু সন্তানের কচি মুখের পানে তাকাইয়া পরী যেন নিমেষেই সে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেল। শিশুর জন্মক্ষণের পরেই সূর্য্যোদয় হইল দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, একটু আলোর প্রতীক্ষা না করিয়াই যে চলিয়া গিয়াছিল, আজ সে-ই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল! শিশুর মূর্ত্তিতে আজ তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভুবনই নিশ্চয় ফিরিয়া জন্মিয়াছে!

একটা মানুষের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পরী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, সতর্ক পদবিক্ষেপে টুরা কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে তাহা বুঝিতেই পারে নাই।

বিদ্রোহিনী নারীর চক্ষে আজ জননীর শান্ত কোমল দৃষ্টি দেখিয়া টুরার কথা বলিবার সাহস হইল; বলিল, ইখানে কেনে পরী, আয় ঘরকে আয়।

পরী কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে দুই হাতে ধরিয়া অতি সাবধানে বুকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টুরার পশ্চাতে কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

খুঁড়ে মাটি শ্মশান ঘাটের, আঁচ্‌ড়ে কয়লা পোড়া কাঠের

হাত্‌ড়ে বিশ্ব আঁধার রাতে কে পেয়েছে কাকে ?

হাহা—ধ্বনি হাওয়ায় ঝরে, শূন্য আমায় ব্যঙ্গ করে,

তবু তোমায় ডেকে মরি পরাণ-ভরা ডাকে।

"সেই বাদশী"

আনমনে শুধু চোখে চোখে চেয়ে রই,

বলে চোখ গুলি,—ভাল বাসো ? বলো ভালবাসো, তবে কানে কানে কথা কই।

"কথা"

কল্লোল

যাঁহারা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধুর ধ্বনি অর্থাৎ কল-রোল বা কল্লোলের উপাসক, তাঁহারা হয়ত ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন, যে, তাঁহাদের সাহিত্য কোলাহল হইতে দূরে। জল-কল্লোলের তীরে নুপুর-কঙ্কণের ঝন্‌ঝনি থাকিতে পারে; কাজেই সাথে সাথে কাঁসা পিতলের খন্‌খনি থাকিতেও পারে, কিন্তু কর্ম্মের উৎসাহের নামে যে কোলাহল জাগে তাহা হয়ত থাকিবে না। এ অবস্থায় একবার মনে করা মন্দ নয় যে, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের ঝঙ্কার যদি খোল করতালের তীব্র কোলাহলে না মিশিত, তবে উহা সহজে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিত না। আমরা যেন চীৎকার ও অধীরতাকেই সকল সাধনার প্রাণ করিয়া লইয়াছি। সরস্বতীর পূজা এখন রাষ্ট্রতন্ত্রের হুঙ্কার-মন্ত্রে চলিতেছে;—সাহিত্য-কুঞ্জের মৃদু ওঁকার-মন্ত্রে নয়। এ দিনে কোলাহলকে দূরে রাখা অসীম সাহসের কর্ম্ম।

মানি বটে প্রকৃতির লীলা চলিয়াছে ধীরতায় ও অটলতায়; স্বীকার করি প্রকৃতির কাজে কোন তাড়া নাই, আর সে একটা বড় রকমের সিদ্ধি গড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয় না। আমরা কিন্তু দেরী সহিতে পারি না; বিধাতার আইনের উপরে আত্মদম্ভের আইন চালাইয়া নূতন নূতন বিশ্বামিত্র সাজিয়া তাড়াতাড়ি নূতন সৃষ্টি করিতে চাই; প্রকৃতির প্রাণের সূতায় প্রাণ গাঁথিয়া আমরা অলস-কর্ম্মা বা অকর্ম্মা হইতে চাই না—চাই বিশ্ব-কর্ম্মা বা বিশকর্ম্মাকে ছাড়াইয়া বাইশকর্ম্মা হইতে। যে সকল ব্যক্তি কোলাহলে না ডুবিয়া বিজ্ঞতার কথা বলে, আমরা তাহাদের ফন্দি ধরিয়া ফেলিয়াছি; তাহারা আপনাদের আলস্য বাঁচাইয়া চলিতে চায়। জানিয়া শুনিয়া যাঁহারা অকর্ম্মার খ্যাতির প্রার্থী, তাঁহারা 'গ্রাহক' বিত্তে সমৃদ্ধ হইতে পারিবেন কি?

আমাদের অধীরতার কথা বলিয়াছি; ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা মহাত্মাদের প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণে ভূষিত নই। মহাত্মাদের প্রকৃতি বুঝাইবার শ্লোকে আছে:-বিপদি ধৈর্য্যম্। আমাদের কোন বিপদ আপদ নাই, সমানে বুক ফুলাইয়া চলিতে পারি; কাজেই এখন ধৈর্য্যের প্রয়োজন নাই। যাহা 'মহাত্মনাং' প্রকৃতি-সিদ্ধ, তাহার মধ্যে একটি গুণ বাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে সকলেরই

আছে, সেটি,—সদসি বাক্‌পটুতা। যদি প্রাচীন শ্লোকটিকে একটুখানি নাম মাত্রে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিত অর্থাৎ যুদ্ধে বাক্‌পটুতা ও সভায় বিক্রম লেখা যাইতে পারিত, তবে বাঙ্গালীতে একাধারে মহাত্মাদের দুইটি গুণ দেখা যাইত। এ সকল কথা যাহাই হউক, এ সময়ে আমাদের ধীরতার অভাব দোষের নয়। আমাদের অধীরতা থাকিলেও যে স্থির প্রাণতা (Seriousness) কর্ম্মীদের লক্ষণ, তাহা হয়ত আমাদের আছে; কারণ উহার একটি লক্ষণ এই যে মানুষে হাসিতে পারে না। কল্লোলের সাধকেরা একটু আধ্‌টু হাসিবেন তাহা জানি, কিন্তু পাঠক সমাজে ফল কি হইবে জানি না।

যাঁহারা আনন্দের উচ্ছ্বাসে অবাধ স্বাধীনতায় সাহিত্য-সেবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি :—

বিশ্ব তন্ত্রে শিখেছি মন্ত্র,—না জানি কি ফল,—পেড়ে যাই,
নব রচনার পেয়েছি প্রেরণা,—জানি না কি হবে,—গড়ে যাই।
জানিনা চলিবে কাহার গলায়,—এ মালা যতনে গেঁথে যাই
জানিনা আদরে কে গাবে এ গান,—সুরে সুরে তবু বেঁধে যাই।
অপেক্ষিছে দূরে উপেক্ষা কি ভাই?—থাক দূরে থাক, হেসে যাই।
আসুক মরণ জীবনদ্বন্দ্ব,—আনন্দে মোরা ভেসে যাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

. . . একবারটি ঘরের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ দেখি, দেখ্‌বে, পৃথিবীময় কেবল পথ। . . .

"পাগল"

. . . ছুরির বুকখানা ভরা থাকে মরণ দিয়ে, তাই ওর মাঝে আর কোনই লুকোচুরি নেই . . . মরণ-ই ওর প্রাণ, তাই ওর স্পর্শ অত কঠিন, অত ঠাণ্ডা,—ওর কাজ অত ক্ষিপ্র। . . .

"বুকের বোঝা"

রিক্তা

সে বল্ল "তোমায় ভালবাসি।"

এমন কথা আগে অনেক শুনেছি, কিন্তু তাতে বুকটা ত কই কেঁপে ওঠেনি! তার হাত থেকে ফুলটি নেবার সময় আঙ্গুলের স্পর্শ পেয়ে সুখে শিউরে উঠ্‌লাম, কই আর কারো স্পর্শে ত কখনও এমনটি হয় নি!

তার কোন বিশেষত্ব ছিল না; ছিল কেবল অদ্ভুত ভালবাসা। তার চোখে মুখে, কাজে কথায় কেবল আমার প্রতি ভালবাসাই ফুটে বেরুত। তাতে ছল-চাতুরী যে ছিল না, এ কথা অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হ'ত। এই ভালবাসা পেয়ে আমি পাগল হ'লাম, তবু তার কাছে স্বীকার কর্‌লাম না "আমিও তোমায় ভালবাসি"।

দিনের পর দিন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। কিসের গর্ব্বে জানি না তাকে কেবল অবহেলা কর্‌লাম। তবু সে ভিখারীর মত আমারই দ্বারে প'ড়ে রইল!

তার পর আমায় নাম্‌তে হ'ল। আমার রাজরাণীর বেশ ফেলে দিয়ে ভিখারিণী সাজ্‌তে হ'ল। সে সুখের কথা মনে হ'লে এখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলি যেন!

আমার আত্মীয়েরা তখন একজনকে আমার সাম্‌নে এনে রেখেছেন। রূপে, গুণে, ধনে, মানে তাঁর মত বর পাওয়া দুর্ল্লভ। আমি তাঁকে আমার শ্রদ্ধার নমস্কার জানিয়ে বিদায় কর্‌লাম।

আত্মীয়েরা বিমুখ হলেন। বাপ-মা চোখের জল ফেল্‌লেন। বন্ধুরা বল্‌ল—"তোমার মত বুদ্ধিহীনা আমরা কখনও দেখিনি।"

তাদের কথাটা সত্যি, কারণ রূপ-ধন-মানের কথাটা আমার মনেই ছিল না, আমি ভাব্‌ছিলাম, আমার বর আমার জন্যে অসাধ্য সাধন করতে ছুটবে, আমি মরে গেলে শুধু আমার ভালবাসা নয়, মহাদেবের মত আমার শরীরটাকেও ব'য়ে নিয়ে বেড়াবে, এমন কত কথা! সকলের বিরাগ, অভিমান, যুক্তি সহ্য ক'রে আমি অটল রইলাম।

সে সব দিনের প্রত্যেকটি কথা মনে আছে। কত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে যাত্রা আমাদের। সব বিপদ অন্ধকারে সে আমার পাশে পাশে চল্‌ত। তার প্রেম দিয়ে সে আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিত। প্রেমের অনুভূতি ধীরে ধীরে আমার দেহ মন বিকশিত ক'রে তুল্‌ল। আমি সূর্যামুখীর মত আমার আলোর রাজার দিকে চেয়ে রইলাম।

আমাদের জয় হ'ল। সবাই হাসিমুখে একদিন আমাদের হাত দুখানি পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দিলেন।

এ জীবনে সে রাত্রির কথা ভুল্‌ব না। সবাই চলে গেলে বাসর ঘরে স্বামী আমায় বুকে চেপে মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"তুমি আমার, আর কারো নও—শুধু আমারই।"

আমার দুচোখ ভ'রে জল এল! মনে হ'ল এমন আদর কেউ কখনও পায়নি,—এমন সুখ কেউ কখনও জানে নি!

তার পরে শত অভাবের মধ্যে আমাদের সংসার পাতা। সে সময়কার প্রতিটি দিনের প্রতিটি মূহুর্ত্তের হিসাব দিতে পারি।

সকালে অন্ধকার থাক্‌তে উঠে খাটুনি আরম্ভ, রাত্রি গভীর হ'লে শুতে যাওয়া। তবু তার মধ্যে ক্লান্তি ছিল না।

সন্ধ্যা বেলা কর্ম্মশ্রান্ত স্বামীকে খাবার দিতে গিয়ে রোজই মিষ্টি বকুনি শুন্‌তে হ'ত—"তুমি কেন সময়ে খাও না . . . অত বেশী পরিশ্রম কর।"

এক একদিন বকুনি খেয়ে অভিমান ক'রে বসে থাক্‌তাম, তখন কত আদর ক'রে ডেকে এনে নিজের হাতে খাবার মুখে তুলে দিতেন, রাত্রে শুতে যাবার সময় চুমোর পর চুমো দিয়ে আমার সব শ্রান্তি দূর ক'রে দিতেন। তাঁর দিন আরম্ভ আর শেষ হ'ত, আমায় আদর ক'রে!

কাজে বেরুবার আগে আমার চুমোটি আদায় না ক'রে বেরুতেন না! যদি সে সময় দূরে থাক্‌তাম অন্য কাজে, তিনি ছল ক'রে ডাক্‌তেন—"ওগো, আমার ট্রামের পয়সা দিয়ে যাও!" নয়ত বল্‌তেন "পানে চুণ কম হয়েছে, আর একটু দাও ত গো!"

আমার ছোট ননদেরা কিন্তু তার এই দুষ্টুমি টুকু ধ'রে ফেলে ছিল; আর তাই নিয়ে আমায় কত ঠাট্টা কর্‌ত।

কিন্তু এসব কথা লেখ্‌বার দরকার কি ? আমার সুখের ডালি সবার চোখের সাম্‌নে ধর্‌বার ইচ্ছে ত নেই, আমি বল্‌তে চাই আমার সব চেয়ে যার ওপর বিশ্বাস ছিল, সত্য ব'লে জান্‌তাম, কেমন ক'রে তা মিথ্যে হ'য়ে গেল, তারই দু'একটী কথা।

প্রাকৃতিক নিয়মে অপরিবর্ত্তনশীল কিছুই নাই, কিন্তু আমার মন তা মানে নি ! আমার মুগ্ধ নারী-হৃদয় সগর্ব্বে হাজার বার ক'রে বল্‌ত—"প্রেম অপরিবর্ত্তনশীল" প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে একদিন স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'লাম "আমার স্বামী আমার প্রতি উদাসীন !" . . .

একদিন আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। স্বামী দুঃখিত হলেন, কিছুদিন আমার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন দেখাতে লাগ্‌লেন। তারপর কেমন ক'রে জানিনা, আমার কান্নাটা হ'য়ে দাঁড়াল "অরণ্যে রোদন !" . . .

এই অনাদরের ব্যথা সব চেয়ে বুকে বেজেছিল আমার প্রথম সন্তান সম্ভাবনার সময়। প্রত্যেক নারী-হৃদয় এই সময়ে কত খানি ভ'রে ওঠে আর তখন প্রিয়ের কাছে কতটা আদর যত্নের দাবী তার মনে জেগে ওঠে তা বোধ হয় কাকেও বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। কিন্তু আমার সব ক্ষোভ বুকে চেপে চোখের জল মুছে আমার নিঃসঙ্গ জীবন বরণ ক'রে নিলাম ; স্বামীর কাছে আর অভিমান কর্‌লাম না।

তারপর এক এক ক'রে সব কথা আর না বল্‌লেও চল্‌বে। এবার শুধু আমার সব চেয়ে বড় অপমান এবং সর্ব্বনাশের কথাটি ব'লে চুপ কর্‌ব।

একদিন জান্‌লাম, শত অনাদর উপেক্ষাতেও স্বামীর উপর আমার যে বিশ্বাস ছিল তিনি সে বিশ্বাসের যোগ্য নন ! . . .

জন্মাবধি শুনে আস্‌ছি "পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম হয় না, লাখে একজন চরিত্রবান্ পুরুষ পাওয়া যায় না," তবু ভাব্‌তাম আমার স্বামীই বুঝি ভগবানের সৃষ্ট পুরুষের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম। ভাব্‌তাম তিনি অসাধারণ,—দেবতারও উপরে।

শুনেছি নারীদের একটা দুর্ব্বলতা আছে, স্বামীকে তারা জিজ্ঞাসা করে "আমি মরে গেলে তুমি কি আবার বিয়ে কর্‌বে ?" আমি কিন্তু কোন দিন তাঁকে এমন প্রশ্ন করিনি, কর্‌বার দরকার আছে বলেও মনে করিনি। কিন্তু

আমার এই বিশ্বাস যেদিন ভাঙ্গল, সে দিন পাগলের মত আত্মহত্যা করতে ছুটে ছিলাম! . . .

হঠাৎ চোখে পড়্‌ল আমার দুঃখ-সাগরের রক্তকমল, আমার শিশুর মুখটি! ওকে মানুষ করতে হবে। ওকে ত ঐ লোকটার হাতে ফেলে দিতে পারব না।

প্রচণ্ড আক্ষেপে মাটিতে মাথা ঠুক্‌লাম, বিধাতাকে অভিশাপ দিলাম, আমার এই বন্ধনের সৃষ্টি করেছেন ব'লে।

আমার স্বামী যদি আর কাকেও ভাল বাস্‌তেন তাতে দুঃখ ছিল না, এ অপমানের জ্বালা সইতে হ'ত না। এ ত হৃদয়ের প্রেম-তৃষ্ণা মিটাবার জন্য নয়! এ যে শুধু লালসার চরিতার্থতার চেষ্টা! ঘৃণায় আমার মন মরে গেল।

স্বামী ক্ষমা চেয়ে বল্‌লেন "মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা থাকে। জীবনের প্রথম পদস্খলন, কি ক্ষমার যোগ্য নয়?"

সত্যিই ত! এমন নিষ্ঠুর, কঠোর বিচারক আমি! . . . মনে লজ্জা হ'ল। অপমানের জ্বালা কমে এল, তাঁকে ক্ষমা কর্‌লাম। দুর্ব্বল হৃদয়ে দেখ্‌লাম আমার সন্তানের জন্মদাতার জন্যে এখনও অনেকখানি ভালবাসা রয়েছে! ভাব্‌লাম আবার নূতন ক'রে মধুরতায় ভ'রে জীবনযাত্রা আরম্ভ হ'বে আমাদের।

কিন্তু হ'ল না! . . .

যে দোষ আমি কর্‌লে পরিত্যক্তা হ'তাম, তাঁর পক্ষে সে দোষ গুরুতর হ'ল না, আমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লাম ব'লেও আমার মহত্ব তাঁর কাছে বাড়্‌ল না! আমি যেন সহ্য কর্‌তে বাধ্য; কেননা আমি যে "নারী"! . . .

তার পর আরম্ভ হ'ল "নারীর কাজ" নিত্য অভিসারিকার বেশে হৃদয়-জয়ের জন্যে তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ান। আর তাঁর উদাসীন দৃষ্টির সাম্‌নে বার বার প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফিরে আসা! . . .

তার পর সব গেল! আমি আজ রিক্তা। . . . তবু আমার অহঙ্কার ছাড়ি নি। কপালের সিঁদুরের টিপটা একটু বেশী বড় ক'রেই পরি। সীমন্তের সিঁদুর রেখা একটু বেশী ক'রেই টেনে উজ্জ্বল করি।

লোককে জান্‌তে দেব কেন, যার জন্যে মা বোনের চোখের জল ফেলিয়েছি, যার জন্যে ধন গৌরব ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি, আমার তা পাওয়া হয় নি? এখনও মেয়ে মহলে স্বামী-সৌভাগ্যবতী ব'লে আমার ভারি নাম! . . . সধবাদের মনে

ঈর্ষ্যা জাগিয়ে আমি আমার বাইরের ঠাট বজায় রেখেছি। বুকটা কেবল তখনই কেঁপে ওঠে, যখন কোন মা তাঁর মেয়ের বিয়ের দিন আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন "মেয়েটি আমার ওরই মত ভাগ্যবতী হোক" তখনই ভগবানের পায়ে প্রণাম ক'রে বলি "অন্তর্যামী দেবতা, যে অভিশাপ ওরা যেচে নিচ্ছে, তা যেন বিফল হয়। ওরা যেন আমার মত দুঃখিনী না হয় প্রভু!"

শ্রীকেতকী দেবী

সংগ্রহ।

. . . আপোষ ?—পৃথিবীর কতগুলি জিনিষের সঙ্গে আপোষ করবে ? এক-দিন একটা জিনিষের সঙ্গে আপোষ করেছ কি, পর পর অতি ক্ষুদ্র অবস্থা-গুলোও মহাশক্তিমান বলে মনে হবে— তাদের সঙ্গেও আপোষ করতে হবে। . . .

"ফুলের দোল"

. . . স্পর্দ্ধা ?—অঙ্কুর হ'তে গাছ বেড়ে ওঠে, সেই বাড়ার ভিতর দিয়ে তার যে একটা স্বভাবিক গতি আছে, তারই পরিচয় সে দেয়,—বেড়ে ওঠা তার স্পর্দ্ধা নয়। . . .

"পূজারিণী"

. . . গড়ে তোলবার কাজে শক্তি দাও, যে ভেঙ্গে ফেলা অনাবশ্যক, তার উত্তেজনায় শিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই। . . .

"বিমলার আত্মকথা"

পুঁটেরাম

১

বাঁধানো অশথ-তলায় ব'সে বোসজা তামাক টানছিলেন। পাশে পাড়ার আর দু-জন বিজ্ঞ লোক। বোসজা নাকে মুখে ধোঁয়া বা'র ক'রে বল্লেন, তাইত হা, চৌধুরী পাড়ার পুঁটে না কি যাত্রার দলে ঢুক্‌বে?

হরে রাম দত্ত বল্‌লেন, না, না, এখনো তাদের সঙ্গে জোটেনি, তবে আসা যাওয়া করে বটে।

প্রসন্ন বাগ্‌চীর হাতে নস্যের শামুক ছিল। এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে বল্লেন, সেটাই কি ভাল কথা? ভদ্রলোকের ছেলে, বাপের জমিজমা আছে, দু দশ ঘর প্রজা আছে, গুরু মশায়ের কাছে লেখা পড়া শিখেছে, ডব্‌কা বয়স, যাত্রার দলে মিশ্‌লে বাপের মুখ হেঁট হবে না? আর সেখানে ক'র্‌বে কি, জুড়ী গাইবে না কেলুয়া সাজ্‌বে?

হরে রাম বল্লেন, কেন, যদি অধিকারী হ'তে পারে? এই মনে কর দাশরথী রায়ের মত—

বোসজা বল্লেন, রাখ, রাখ, গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি!

এমন সময় এলেন বিনয় মল্লিক। বোসজা বল্লেন, আসুন মল্লিক মশায়, তামাক খান।

—শুক টান টান্‌তে হবে না কি? তামাক থাক্‌তে কি তুমি হুঁকো ছাড়্‌বার পাত্তর?

বোসজা কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লেন, আপনার কাছে কারুর ত এড়ান নেই!

হুঁকায় এক টান দিয়ে মল্লিক মশায় বল্লেন, কার কথা হচ্ছিল?

—এই চৌধুরী পাড়ার পুঁটেরামের। ছোঁড়া গোল্লায় যাচ্ছে। যাত্রাওয়ালাদের দলে মিশলে ওর পরকাল ঝর্‌ঝরে হ'য়ে যাবে।

মল্লিক মশায় মুখখানা গম্ভীর ক'রে বল্লেন, ওর বাপ কিশোরী চৌধুরীর সঙ্গে সেই কথা হচ্ছিল। ছেলে বড় হয়েছে কি না, বেশী রাগারাগি করলে এমন কি বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে। আমি অধিকারীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব আর পুঁটেরামের

গর্ভধারিণী তাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন। সে তেমন অবুঝ ছেলে নয়, তবে যা একটু একবগ্‌গা, একটু রগচটা, ঐ যা একটা দোষ।

হরে রাম বল্লেন, যখন মল্লিক মশায় মাঝে আছেন তখন একটা পথ হবেই, গ্রামের নাম খারাপ হবে না। আমাদের এই নরহট্ট গ্রাম থেকে ভদ্রলোকের ছেলে কেউ যাত্রার দলে ঢোকে নি।

দূরে অপরাহ্নের সূর্য্যের আলো গঙ্গার জলে ঝিকমিক কর্‌ছে,নারিকেল গাছের পাতা বাতাসে নড়্‌ছে, একটা খেজুর গাছে গোটা পাঁচ ছয় বাবুইয়ের বাসা ঝুল্‌ছে এক পাশে দু তিনটে তেঁতুলগাছ, তেঁতুলে গাছ ভ'রে রয়েছে, একটা কয়েৎবেলের গাছ, সেটাও ফলে ভরা। সব গাছের দিকে চেয়ে মল্লিক মশায় বল্‌লেন, বোসজা, এ বছর তোমার গাছে খুব ফল ধরেছে, আমরা দু' চারটে পাইনে?

—সে কি কথা! আপনাদেরই ত গাছ, কালই আমি এক ঝুড়ি পাড়িয়ে পাঠিয়ে দেব।

—চল না সবাই গিয়ে একটু গঙ্গার ধারে বসিগে।

—আপনারা এগুন, আমি হুঁকোটা রেখে আস্‌ছি।

দু চার পা এগিয়ে হরে রাম বল্‌লেন, আমিও একবার বাড়ী যাই, পুকুরটা জমা দেব, পারের এক জন মেছোর আস্‌বার কথা আছে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে মল্লিক মশায় প্রসন্ন বাগচীকে বল্‌লেন, কি হে, তোমারও বাড়ীতে কিছু বরাত আছে না কি?

—আজ্ঞে না, এমন কিছু নয়, চলুন আপনার সঙ্গে যাই।

—বাঁধা অশথ তলায় ব'সে গুড়ুক টান্‌বার বেলা সবাই আছেন, গঙ্গাতীরস্থ হবার বেলা কেউ নেই। তবু এখনও কাঁধ দেবার দেরী আছে। শ্মশানে যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

মল্লিক মশায়ের রসিকতা যে রকম হোক তাতে যোগ দিতে হয়। প্রসন্ন বাগ্‌চী ফোক্‌লা দাঁত বা'র ক'রে বল্‌লেন, যা বলেছেন।

২

গঙ্গাতীরে দক্ষিণে বাতাস দিচ্চে। দু চার জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন। খানিক দূরে জন কয়েক যুবক বসে গল্প কচ্ছিল। আরও খানিক দূরে

পুঁটেরাম

১

বাঁধানো অশথ-তলায় ব'সে বোসজা তামাক টানছিলেন। পাশে পাড়ার আর চু-জন বিজ্ঞ লোক। বোসজা নাকে মুখে ধোঁয়া বা'র ক'রে বল্লেন, তাইত হা, চৌধুরী পাড়ার পুঁটে না কি যাত্রার দলে ঢুক্‌বে?

হরে রাম দত্ত বল্‌লেন, না, না, এখনো তাদের সঙ্গে জোটেনি, তবে আসা যাওয়া করে বটে।

প্রসন্ন বাগ্‌চীর হাতে নস্যের শামুক ছিল। এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে বল্লেন, সেটাই কি ভাল কথা? ভদ্রলোকের ছেলে, বাপের জমিজমা আছে, দু দশ ঘর প্রজা আছে, গুরু মশায়ের কাছে লেখা পড়া শিখেছে, ডব্‌কা বয়স, যাত্রার দলে মিশ্‌লে বাপের মুখ হেঁট হবে না? আর সেখানে ক'র্‌বে কি, জুড়ী গাইবে না কেলুয়া সাজ্‌বে?

হরে রাম বল্লেন, কেন, যদি অধিকারী হ'তে পারে? এই মনে কর দাশরথী রায়ের মত—

বোসজা বল্লেন, রাখ, রাখ, গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি!

এমন সময় এলেন বিনয় মল্লিক। বোসজা বল্লেন, আসুন মল্লিক মশায়, তামাক খান।

—শুক টান টান্‌তে হবে না কি? তামাক থাকৃতে কি তুমি হুঁকো ছাড়্‌বার পাত্তর?

বোসজা কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লেন, আপনার কাছে কারুর ত এড়ান নেই!

হুঁকায় এক টান দিয়ে মল্লিক মশায় বল্লেন, কার কথা হচ্ছিল?

—এই চৌধুরী পাড়ার পুঁটেরামের। ছোঁড়া গোল্লায় যাচ্ছে। যাত্রাওয়ালা-দের দলে মিশলে ওর পরকাল ঝরঝরে হ'য়ে যাবে।

মল্লিক মশায় মুখখানা গম্ভীর ক'রে বল্লেন, ওর বাপ্‌ কিশোরী চৌধুরীর সঙ্গে সেই কথা হচ্ছিল। ছেলে বড় হয়েছে কি না, বেশী রাগারাগি করলে এমন কি বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে। আমি অধিকারীর সঙ্গে দেখা করব আর পুঁটেরামের

গর্ভধারিণী তাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন। সে তেমন অবুঝ ছেলে নয়, তবে যা একটু একবগ্‌গা, একটু রগচটা, ঐ যা একটা দোষ।

হরে রাম বল্লেন, যখন মল্লিক মশায় মাঝে আছেন তখন একটা পথ হবেই, গ্রামের নাম খারাপ হবে না। আমাদের এই নরহট্ট গ্রাম থেকে ভদ্রলোকের ছেলে কেউ যাত্রার দলে ঢোকে নি।

দূরে অপরাহ্নের সূর্য্যের আলো গঙ্গার জলে ঝিকমিক করছে,নারিকেল গাছের পাতা বাতাসে নড়্‌ছে, একটা খেজুর গাছে গোটা পাঁচ ছয় বাবুইয়ের বাসা ঝুলছে এক পাশে দু তিনটে তেঁতুলগাছ, তেঁতুলে গাছ ভ'রে রয়েছে, একটা কয়েৎ বেলের গাছ, সেটাও ফলে ভরা। সব গাছের দিকে চেয়ে মল্লিক মশায় বল্‌লেন, বোসজা, এ বছর তোমার গাছে খুব ফল ধরেছে, আমরা দু' চারটে পাইনে?

—সে কি কথা! আপনাদেরই ত গাছ, কালই আমি এক ঝুড়ি পাড়িয়ে পাঠিয়ে দেব।

—চল না সবাই গিয়ে একটু গঙ্গার ধারে বসিগে।

—আপনারা এগুন, আমি হুঁকোটা রেখে আস্‌ছি।

দু চার পা এগিয়ে হরে রাম বল্‌লেন, আমিও একবার বাড়ী যাই, পুকুরটা জমা দেব, পারের এক জন মেছোর আস্‌বার কথা আছে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে মল্লিক মশায় প্রসন্ন বাগ্‌চীকে বল্‌লেন, কি হে, তোমারও বাড়ীতে কিছু বরাত আছে না কি?

—আজ্ঞে না, এমন কিছু নয়, চলুন আপনার সঙ্গে যাই।

—বাঁধা অশথ তলায় ব'সে গুড়ুক টান্‌বার বেলা সবাই আছেন, গঙ্গাতীরস্থ হবার বেলা কেউ নেই। তবু এখনও কাঁধ দেবার দেরী আছে। শ্মশানে যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

মল্লিক মশায়ের রসিকতা যে রকম হোক তাতে যোগ দিতে হয়। প্রসন্ন বাগ্‌চী ফোক্‌লা দাঁত বা'র ক'রে বল্‌লেন, যা বলেছেন।

২

গঙ্গাতীরে দক্ষিণে বাতাস দিচ্চে। দু চার জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন। খানিক দূরে জন কয়েক যুবক বসে গল্প কচ্ছিল। আরও খানিক দূরে

স্ত্রীলোকেরা গা ধুচ্ছিল। কেউ গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে জলভরা কলসী-কাঁখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কেউ এক গলা জলে দাঁড়িয়ে গা ধুচ্ছে। বুড়ীরা ভিজে কাপড়ে ঘাটে ব'সে মালা জপ্‌ছে, যুবতীরা জলের ভিতর দাঁড়িয়ে গল্প করছে, আবার কেউ কেউ দাঁড়া সাঁতার দিচ্ছে, শুধু মাথা দেখা যাচ্ছে।

যুবাদের মধ্যে ব'সে পুঁটেরাম। পুঁটেরামের ভাল নাম দামোদর কিন্তু ডাকনাম-টাই সকলে জান্‌ত। পুঁটেরামের বয়স তেইশ বছর হবে, বেশ জোয়ান, মুখ সুশ্রী, গোঁফ এরই মধ্যে বড় বড় হয়েছে। গায়ে হাতকাটা, পাশের দিকে ফাঁস-বন্ধক-দেওয়া পিরাণ, পরণে গাঁয়ের তাঁতির বোনা কালাপেড়ে ধুতি। খুব হেসে হেসে গল্প করছে। মল্লিক মশায় তাকে দেখে সেই খানে এসে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন, এই যে পুঁটেরাম যে আজ বড় এখানে।

পুঁটেরাম সমীহা ক'রে উঠে দাঁড়াল। বল্‌লে, আজ্ঞে, মাঝে মাঝে আমি ত বিকেল বেলা এখানে আসি।

—তা বেশ, বেশ। গঙ্গার বাতাস ভাল, বিকেল বেলা বেড়াতে এলে ত এখানেই আসতে হয়।

গঙ্গার জলে শুশুক উল্টাবাজি খাচ্ছে, মাছরাঙা ডেকে ডেকে জলের উপর বাতাসে থথর ক'রে কাঁপ্‌ছে, থেকে থেকে জলে ছোঁ মারছে, এক এক বার বড় বড় রুই কাৎলা মাছ ঘাই করছে। জেলে পাড়ার নীচে কতকগুলা ডিঙ্গী বাঁধা, বালিতে পোঁতা বড় বড় বাঁশে জাল শুকুচ্ছে। ও পারে কোথাও বন, কোথাও প'ড়ো বাড়ীর ভাঙ্গা দেয়াল। সূর্য্য অস্ত গেছে, পশ্চিম দিকের আকাশে লালী রয়েছে, এক খানা সিঁদুরে মেঘে সেই লাল আভা আটক পড়েছে।

দু চার জন কিশোরী আর যুবতী সাঁতার দিচ্ছে দেখে প্রসন্ন বাগ্‌চী বল্‌লেন, মেয়েরা কে সাঁতার দিচ্ছে, এখনি বান ডাকবে যে!

বল্‌তে বল্‌তে কল কল ক'রে বান ডাক্‌ল। জোয়ারের মুখে আগে ছোট ছোট ঢেউ, তার পিছনে বড় বড় ঢেউ। ঢেউয়ের উপরে সাদা ফেনা। ফেনা-সুদ্ধ ঢেউ তীরে আছ্‌ড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

জল থেকে স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি উঠে এল। কেবল এক জন সাঁতার দিয়ে দূরে গিয়েছিল সে বানের মুখে প'ড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তীরে স্ত্রীলোকেরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, ওই যা! থাকি বুঝি ডুবে গেল! কি হ'ল গো!

মল্লিক মশায় চেঁচিয়ে বল্লেন, ডাক্ ডাক্ জেলেদের ডাক্, ডিঙ্গী নিয়ে ওকে তুলে আনুক।

যুবকেরা সব উঠে দাঁড়াল। তারা যেখানে বসেছিল তার দক্ষিণ দিকে মেয়েরা গা ধুচ্ছিল। গঙ্গা সেখানে দক্ষিণবাহিনী, বান ঠেলে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে আস্‌ছে।

যুবকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার একটু দক্ষিণে জলমগ্ন স্ত্রীলোকটী একবার ভেসে উঠ্‌ল। ছ' একবার হাত নেড়ে আবার ডুবে গেল। পুঁটেরাম তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

প্রবীণদের মধ্যে একজন বল্লেন, দেখ্‌লে গোঁয়ারতামি! মেয়েটাকে ত তুল্‌তে পার্‌বেই না, শেষে নিজেও ডুববে।

পুঁটেরাম সাঁতার দিতে দিতে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের পিরাণ, ছিঁড়ে ফেল্‌লে। তাতে দুই হাত আর কোমর পর্য্যন্ত শরীর মুক্ত হ'ল, হাতে পায়ে জল ঠেলে বেগে সাঁতার দিয়ে চল্‌ল। যেখানে স্ত্রীলোকটি ভেসে উঠেছিল তার খানিকটে উত্তর দিকে লক্ষ্য ক'রে সাঁতার দিতে লাগ্‌ল। জলের বড় টান, সাম্‌নে যখন একটা বড় ঢেউ ফেনা মাথায় ক'রে আসে তখন পুঁটেরাম ডুব দেয়, আবার ঢেউ কাটিয়ে ভেসে ওঠে। খানিক দূর এই রকম ক'রে গিয়ে ঢেউয়ের জোর কম দেখে পুঁটে-রাম ডুব দিলে। অনেকক্ষণ পরে একটু উত্তর দিকে ভেসে উঠ্‌ল। দু তিনবার এই রকম ক'রে আবার উঠতে স্ত্রীলোকটী আবার ভেসে উঠ্‌ল। সে ডোব্‌বার আগেই পুঁটেরাম তার পাশে গিয়ে তার হাত ধর্‌লে। প্রাণের ভয়ে স্ত্রীলোকটি দুই হাতে তাকে জাপ্‌টে ধর্‌লে। দু জনেই ডুবে যায়, পুঁটেরাম জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। এবারে স্ত্রীলোকটি যখন আবার ডোবে তখন পুঁটেরাম তার হাত ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে না। যখন তার মাথা ডুবে বড় বড় চুল ভেসে উঠ্‌ল তখন তার চুল ধ'রে,তাকে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে ডাঙ্গার দিকে ফির্‌ল। এবার এক হাতে সাঁতার, জোয়ার যেমন টেনে নিয়ে চল্‌ল পুঁটেরাম সেই সঙ্গে ভেসে তীরের দিকে গেল। জলের টানে তাকে অনেকটা উত্তরে নিয়ে গেল। পায়ে মাটী ঠেক্‌তে পুঁটেরাম মেয়েটির মাথা জলের উপর তুলে ধর্‌লে। কোমর-জলে আস্‌তে দু চার জন যুবক নেমে গিয়ে তাদের দুই জনকে ধরাধরি ক'রে ডাঙ্গায় নিয়ে এল।

স্ত্রীলোকটি মূর্চ্ছিত কিন্তু বেশী জল খায় নি। পুঁটেরাম অবসন্ন হয়েছে, বালিতে ব'সে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

তীরে বিস্তর লোক জড় হয়েছে। যে মেয়েটিকে পুঁটেরাম জল থেকে তুল্‌লে তার নাম থাকমণি, জেতে হাড়ি। তাকে উপুড় ক'রে শুইয়ে তার পেট থেকে জল বা'র ক'রে দিলে পর তার জ্ঞান হ'ল। বয়স বছর আঠারো হবে, দেখ্‌তে খাঁদা-খোঁদা কালো-কোলো। খানিক পরে তার বাপ-মা তার হাত ধ'রে তুলে তাকে বাড়ী নিয়ে গেল। যাবার আগে তারা ব'লে গেল, যাই পুঁটেরাম বাবু ঘাটে ছিল তাই আজ আমাদের মেয়ে রক্ষে পেলে!

তারা চলে গেলে পর প্রসন্ন বাগ্‌চী এক টিপ নস্য নিয়ে বল্‌লেন, তা বল্লে হয় কি, পুঁটেরামের সামর্থ্য আছে! এত লোক ছিল, কই আর ত কেউ জলে পা দিলে না। তবে কি জান, থাকি হাড়ির মেয়ে, পুঁটেরাম ওকে ছুঁলে!

পুঁটেরামের ঠোঁট দু একবার কেঁপে উঠ্‌ল, তার নত চক্ষু একবার জ্বলে উঠ্‌ল। বল্লে,—হাড়ীর কি প্রাণ নেই? চোখের সামনে ডুবে মরে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? ধিক্ আমার পুরুষ জন্মে!

—তা বটে, তা বটে! আর গঙ্গাজলে ছুঁতে দোষ কি! তবে কি জান, একবার ভট্‌চাজ্জি মশায়কে জিগ্‌গেস কর্‌লে—

—ভট্‌চাজ্জি মশায়ের গুষ্টির মাথা!

পুঁটেরামের গলার সে বিকট আওয়াজ শুনে প্রসন্ন বাগ্‌চী এমন চম্‌কে উঠ্‌লেন যে তাঁর হাত থেকে নস্যের শামুক প'ড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে তিনি আর মল্লিক মশায় সেখান থেকে সুড় সুড় ক'রে স'রে পড়্‌লেন।

৩

কিশোরী চৌধুরী আর তাঁর পরিবার পুঁটেরামের সাহসের কথা শুনে কিছু বল্‌লেন না। প্রসন্ন বাগ্‌চী ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। অমন উঠ্‌তি বয়সে ছেলেরা একটু তুর্ম্মুখ হ'য়ে থাকে। সকাল বেলা চৌধুরী বাড়ীতে থাকমণি, তার মা আর বাপ এসে উপস্থিত, সঙ্গে এক জন মেছুনী। থাকির বাপ কিশোরী চৌধুরীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বাহির বাড়ীতে দাঁড়িয়ে রইল, থাকি আর তার মা মেছুনীকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর ভিতরে গেল। মেছুনী উঠানের মাঝ

খানে একটা মস্ত কাৎলা মাছ ধপাস্ ক'রে ফেল্লে। বাড়ীর গিন্নী বল্লেন, এই যে থাকি আর থাকির মা! তা আবার মাছ এনেছিস কেন?

থাকির মা বললে, মা ঠাকরুণ, কাল দাদাবাবু না থাকলে কি আমার থাকি রক্ষে পেত? তা মা, মেছুনীকে সঙ্গে ক'রে দাদা বাবুর জন্য এই মাছটা—

এমন সময় পুঁটেরাম হাস্তে হাস্তে সেখানে এল। দেখে বল্লে, থাকির মা, না? সঙ্গে বুঝে থাকি? মাছ কার জন্য?

থাকির মা বল্লে, দাদা বাবু, তোমার জন্য। কাল তুমি থাকিকে বানের মুখ থেকে—

—থাক্ থাক্, সে কথায় কাজ নেই। তাই বুঝি আমার জন্য মাছের মুড়ো এনেছিস্?

থাকির পরণে খাট মোটা কাপড়, আঁচল টেনে মাথায় দিয়ে সে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

গিন্নী বল্লেন, তা বেশ, বেশ। মেছুনী মেয়ে মাছটা কুটে দে ত বাছা।

মেছুনী মাছ কুট্‌তে বস্‌ল। পুঁটেরাম বাইরে গেল। কিশোরী চৌধুরী বল্লেন, পুঁটেরাম থাকির বাপ এসেছে।

পুঁটেরাম বল্লে, হ্যাঁ, থাকি আর তার মা বাড়ীর ভিতরে। আমার জন্য মস্ত একটা মাছ এনেছে।

কর্ত্তা হেসে বল্লেন, সত্যি না কি? হ্যাঁ রে ভীম, ও আবার কি?

ভীম হাড়ী বল্লে, কর্ত্তা মশায়, আপনাদেরই ত খাই। ছোট বাবু আমাদের মেয়ের প্রাণ রক্ষে কর্‌লেন তা যদি একটা মাছ—

পুঁটেরাম বল্লে, বেশ করেছিস, মাছ কোটা হচ্ছে, আজ আমাদের বাড়ী যগ্‌গি হবে।

ও দিকে মাছ কোটা হ'লে গৃহিনী মেছুনীকে চারটে পয়সা আর এক কুনকে চাল দিলেন। থাকির মাকে বল্লেন, একটু দাঁড়া। ঘরের ভিতর থেকে এক খানি নিজের পরণের সাড়ী আর পাতার ঠোঙ্গায় ক'রে এক ঠোঙ্গা খইয়ের চাঁপা এনে উঠানে রাখ্‌লেন। বল্লেন, এই কাপড়খানা থাকি পরবে আর তার জন্য এই খাবার।

গিন্নীর দান মায়ে ঝিয়ে তুলে নিয়ে খুসী হ'য়ে ঘরে গেল।

যাত্রার অধিকারী হিমু রায়ের কাছে গিয়ে মল্লিক মশায় দেখ্‌লেন অধিকারী একখানি কোঠা ঘরের দাওয়ায় ব'সে হৃষ্টপুষ্ট বপুতে আভাঙ্‌ ক'রে সরিষার তেল মাখ্‌ছেন। তেল মাখা হ'লে গঙ্গাস্নান করতে যাবেন। একখানা কোঠা ঘর আর এক খানা খড়ো ঘর, এই দুটী ঘরে যাত্রার দলের আড্ডা, দু দশ দিন পরে তারা আর এক গ্রামে চলে যাবে।

মল্লিক মশায়কে দেখে অধিকারী তেলমাখা হাতে নমস্কার ক'রে বল্লেন, আস্‌তে আজ্ঞে হয়! বসুন, বসুন! ওরে নিমে, মল্লিক মশায়কে তামাক দে!

মল্লিক মশায় মাদুরে বসে বল্লেন, না, এখন আর তামাক খাব না, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

—কি বলুন।

—এই কিশোরী চৌধুরীর ছেলে পুঁটেরাম আপনাদের এখানে যাওয়া আসা করে তার কথা। যাত্রার দলে ঢুকে সে কি করবে? বাপের এক ছেলে, পৈতৃক জোত জমা আছে, দশ ঘর প্রজা আছে, তা দেখ্‌বে না যাত্রার দলে মিশ্‌বে? আর সে একটা চোয়াড় ছোঁড়া বই ত নয়।

—সে কথা আমিও জানি। পুঁটেরামের একটা খেয়াল চেপেছে, না পারে গাইতে না পারে সাজতে, আমার দলে এসে ওর কি হবে?

—আমিও তাই বলি যে অধিকারী মশায় এমন বুদ্ধিমান লোক, পুঁটেরামকে নিয়ে ওঁর কি হবে? সেইটে যদি আপনি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে থামাতে পারেন ত বড় ভাল হয়।

—তা আমি ঠিক বুঝিয়ে দেব, আপনারা কিছু ভাব্‌বেন না।

—তবে আমি গিয়ে তার বাপকে বলিগে। আপনার উপর তাঁর খুব আস্থা আছে। তবে আমি যে তাঁর কাছ থেকে এসেছি, কি আপনাকে কেউ কোন রকম উপরোধ-অনুরোধ করেছে, পুঁটেরাম যেন তা টের না পায়, বুঝ্‌লেন কি না?

—সে কথা আমাকে আর বল্‌তে হবে না। অমনতর ছেলে ছোকরা আমাদের কাছে কত আসে, সবাইকে কি আমরা দলে নি?

মল্লিক মশায় উঠে গেলে খানিকক্ষণ পরে পুঁটেরাম এল। অধিকারী মশায়ের তেল মাখা তখন প্রায় শেষ হয়েছে, গামছা কাঁধে ক'রে উঠ্‌বার উদ্যোগ

করছেন। পুঁটেরামকে দেখে হেসে বল্লেন, এই এথ্‌খুনি তোমার নাম হচ্ছিল, তুমি অনেক দিন বাঁচবে। তুমি যে মেয়েটাকে রক্ষে করলে সে কি কম বাহাদুরী?

—কে বলছিল আমার নাম?

—কে না বলছে? যার তার মুখে তোমার নাম। আমি তোমায় দেখে পর্য্যন্ত ঠিক করেছি যে তুমি একটা মানুষের মত মানুষ হবে। তোমার মত লোক যাত্রার দলে আসা মিছে।

—কেন?

—এ ত কতকগুলো অকেজো ছোঁড়ার দল, কাজের বেলা কেউ নয়। আর দেখ, বল্‌লে তুমি রাগ কোরো না, তুমি তেমন ভাল সাজতে পারবে না, আর তোমার গলাও ত তেমন নেই।

পুঁটেরাম একটু রুক্ষ হেসে বল্‌লে, তা জানি, কোকিল পুড়িয়ে খেলেও আমার গলা হবে না।

—নাই বা হ'ল গলা! তুমি এক জন বীরপুরুষ হবে।

অধিকারী গঙ্গাস্নানে গেলেন। পুঁটেরাম বাড়ী গেল। পথে যেতে যেতে বল্‌লে, যাত্রাদলে আবার মানুষ যায়!

৪

দিন দুই পরে যাত্রার দলের লোকেরা তল্পী-তল্পা বেঁধে আর এক গ্রামে গেল। সেখানে তারা বারোয়ারি পূজায় যাত্রা করবার বায়না পেয়েছিল। দলের দু চার জন যুবক আশা করেছিল যে তারা যাবার আগে পুঁটেরাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কিন্তু তারা পুঁটেরামের টিকিও দেখতে পেলে না।

যাত্রার দল চলে গিয়েছে আর ছেলে তাদের নাম করে না দেখে পুঁটেরামের মা তাকে বল্লেন, বাবা, যাত্রাওয়ালাদের কাছে তুমি আর যাও না শুন্‌লে ওঁর আহ্লাদ হবে।

পুঁটেরাম নাক সিঁটকে বাঁ হাত নেড়ে বল্‌লে, রাম বল, ওদের দলে কে যায়? আমি অমনি দু চার বার দেখতে গিয়েছিলাম আর অমনি তোমরা সব ঠিক ক'রে বস্‌লে যে আমি যাত্রার দলে মিশ্‌ব। খেয়ে দেয়ে আমার ত আর কাজ নেই!

ভরসা পেয়ে গিন্নী কর্ত্তাকে বললেন, ছেলের জন্য তুমি ভেব না, ও যাত্রার দলে মিশ্‌বে না, তাদের ঘেন্না করে।

কর্ত্তা বল্লেন, তারা গিয়েছে আপদ চুকেছে। মিছিমিছি সকলে হইচই করছিল ; ছেলে ছোকরা অমন দশ জায়গায় গিয়ে থাকে, তা ব'লে কি যেখানে যাবে সেই দলে ভিড়তে হবে ?

অন্নপূর্ণার গলিতে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির। পুঁটেরামের মা মানত রেখেছিলেন যে, ছেলে যদি যাত্রার দলে না মেশে, তা হ'লে তিনি সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দেবেন। সেই দিন তিনি পূজা পাঠিয়ে দিলেন।

পঞ্চানন তলার যাদব রায় গ্রামে সব চেয়ে সঙ্গতিপন্ন লোক। বনিয়াদী ঘর, জমিদারী, কাছারী বাড়ী, বাড়ীতে ঠাকুরবাড়ী, সদরে খিড়কীতে বড় বড় পুষ্করিণী, আম কাঁঠালের মস্ত বাগান। চকমিলান বাড়ী, দেউড়ীতে লোক জন, দু চার জন লাঠিয়াল। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হয়, সর্ব্বদা লোকের যাওয়া-আসা, সব সময় বাড়ী গমগম্ করছে।

তাঁর ছেলে মাধব পুঁটেরামের সমবয়সী, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা ধূলা করত। বাড়ীতে মাধবের আলাদা মহল, সেখানে তার বয়স্যেরা জুট্ত, তাস, পাশা, দাবা খেলা হ'ত। যাদব রায় ছেলেকে কখন কিছু বলতেন না, কিন্তু তিনি রাশভারি মানুষ, বিনা ইঙ্গিতেই বাড়ীর সর্ব্বত্র তাঁর শাসন ছিল। মাধব কোন বিষয় বাড়াবাড়ি করতে সাহস করত না, আর সে স্বভাবতঃ একটু ভীতু, ছেলেবেলাও পুঁটেরামের মত ডানপিটে ছিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় পুঁটেরাম মাধবদের ওখানে যাচ্ছিল। পথে রায়েদের খিড়কীর পুকুর আগে পড়ে। তখন ঘোর ঘোর হয়েছে। এক সার নোনা গাছে এক ঝাঁক চড়াই পাখী ব'সে কিচ্ কিচ্ করছে, চালতা গাছের চ্যাটালো পাতায় আঁজি কাটা, আগডালে একটা হাড়ী-চাঁচা লাফাচ্চে। সাদা শাড়ীর চওড়া কালো পাড়ের মত পুকুর পাড়ে সাঁঝের আঁধারে কালো বন, নারিকেল গাছের মাথায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সুপারি গাছের সারি যেন কোন দৈত্যের উর্দ্ধপুঙ্খ তীরের মত মাটীতে বিঁধে রয়েছে। একটা শিয়াল পুঁটেরামের দিকে চেয়ে দেখে আস্তে আস্তে বনে ঢুকল। পুরু ঘাসের মাঝে সরু পথ দিয়ে ঘুরে যেতে পুঁটেরাম দেখলে ঘাটে পইটের উপর ভিজে কাপড়ে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুঁটেরাম যেমন হন্ হন্ ক'রে যাচ্ছিল সেই রকম চলে যেত কিন্তু সে দেখলে স্ত্রীলোকটি তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

মাথায় কাপড়ও টেনে দিলে না, পিছন ফিরেও দাঁড়াল না। পুঁটেরাম থম্‌কে দাঁড়াল না বটে কিন্তু তার চলার তেজ কমে এল, চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে চল্‌ল্।

সন্ধ্যার কালো কোলে যেন অরুণবরণী উষাকন্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে ভিজে কাপড় লেগে অঙ্গের গৌরবর্ণ ও উন্নত পূর্ণ গৌরব ফুটে ফেটে পড়ছে, একটু আড়ভাবে দাঁড়িয়ে গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়ে, নিঃশঙ্ক ফুল্ল নয়নে চেয়ে রয়েছে। কিছু মাত্র ত্বরা কিংবা সঙ্কোচ না ক'রে ধীরে ধীরে খিড়কীর দরজার দিকে গেল। এর আগে পুঁটেরাম সে যুবতীকে গ্রামে কখন দেখেনি।

মাধবের ঘরে অন্য দিন যেমন খেলা গল্প গুজব হয় সেই রকম হ'ল, পুঁটেরাম যেমন জোরে জোরে কথা কইত সেই রকম কইতে লাগ্‌ল, সেই রকম মুক্ত কণ্ঠে হাসতে লাগ্‌ল। কিন্তু বাড়ী যাবার সময় সমস্ত পথে তার চোখের সামনে সেই আর্দ্রবসনলগ্ন রূপের ছবি লেগে রইল।

৫

তরুণীর নাম চাঁপা, সে গ্রামে থাকে না। রায়দের গিন্নীর মামার বাড়ীর কাছে বাড়ী, বুড়ী দিদিমার কাছে থাক্‌ত। দিদিমার সঙ্গে ত্রিবেণীতে একটা যোগে স্নান করতে গিয়েছিল, ফিরে যাবার পথে দিদিমা মাধবের মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তিনি দেশের লোক দেখে যত্ন ক'রে তাদের নিজের কাছে দিন কতক রেখেছিলেন। তাঁর আপ্যায়নে দিদিমা-নাতিনী বত্তে গেল। এই সবে তারা দিন দুই এসেছে। চাঁপার কুলীনে বিয়ে হয়েছিল, তার দিদিমা গরীব, নাতজামাইয়ের সম্মানী কিছু দিতে পারত না, নাতজামাইও তাদের বাড়ীমুখো হ'ত না। স্বামীর সোহাগ কি শ্বশুর-ঘর করা চাঁপার কপালে লেখেনি।

তা সে জন্য আর যে যাই বলুক চাঁপা নিজের কপালের নিন্দা করত না। সে দিব্য হাসি মুখে কাল কাটাত, বেশী লজ্জা সরম ছিল না, একটু যেন কি রকম কি রকম, একটু বেহায়া ব'লে তার অখ্যাতি ছিল। যে দিন পুকুর পাড়ে পুঁটেরাম তাকে দেখতে পায় তার পরদিন বিকেল বেলা সে পাড়ার আর কয় জন মেয়ের সঙ্গে গঙ্গায় গা ধুতে গেল। চাঁপা খুব ভাল সাঁতার জানত, অনেক ক্ষণ সাঁতার দিয়ে উঠলে পর তার সঙ্গিনীরা থাকির জলে ডুবে যেতে যেতে রঙ্গে

পাবার গল্প জুড়ে দিলে। চাঁপা বল্‌লে, বানের মুখে আমি অনেক বার পড়েচি, আমার ভয় করে না।

পাশে একটি মেয়ে চাঁপার গা টিপে বল্‌লে, ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌ছিস্‌, খাকিকে সে দিন ঐ জল থেকে তুলেছিল।

চাঁপা চেয়ে দেখলে একটু দূরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে পুঁটেরাম। পুকুর পারে যাকে দেখেছিল সেই। ছজনে আবার চোকোচোকি হ'ল। মেয়ের দল যেমন এগিয়ে গেল চাঁপা ছ তিন বার ফিরে দেখলে পুঁটেরাম তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।

পুঁটেরামকে যে এর আগে দেখেছিল চাঁপা সে কথার উল্লেখ করলে না। জিজ্ঞাসা করলে, ওকে?

একটি মেয়ে বল্‌লে, ও পুঁটেরাম। ওর নাম দামোদর, পুঁটেরাম ব'লে সবাই ডাকে। চৌধুরী পাড়ার কিশোরী চৌধুরীর ছেলে। যাত্রার দলে ঢুকবে ব'লে দিন কতক খেপেছিল।

—সত্যি?

—সে বাতিক এখন আর নেই, যাত্রার দল এখান থেকে চলে গিয়েছে।

—ওর বউ কি রকম দেখতে?

মেয়েরা খিল খিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল, শোন কথা! বিয়েই হয় নি তার আবার বউ কেমন দেখতে! কোথায় এক জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে। আর এক জায়গায় না কি কথা হচ্ছে।

চাঁপা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না।

দিন ছই চার এই রকম গেল। চাঁপা অন্য মেয়েদের সঙ্গে বিকেল বেলা গঙ্গায় গা ধুতে যায়, ফিরতে সন্ধে হয়, পথে কোথাও না কোথাও পুঁটেরাম দাঁড়িয়ে থাকে। এক দিন ঘাট থেকে ফিরতে কিছু দেরী হ'য়ে গেল। চাঁপা অনেক ক্ষণ জলে ছিল, ডাকাডাকি করলেও ওঠে না। যখন সে উঠে এল তখন ঘোর ঘোর হ'য়ে এসেছে, মাথার উপর দিয়ে বাছড় উড়ে যাচ্ছে, কাল পেঁচা ডাকছে। সে দিন পথে যেতে মেয়েরা পুঁটেরামকে দেখতে পেলে না।

একটি মেয়ে বল্‌লে, বাড়ী যেতে রাত হবে, আমরা সব বকুনি খাব। চাঁপা তোর কেমন আক্কেল!

চাঁপা বল্‌লে, তা না হয় একদিন বকুনি খাব। রোজ তো আর দেরী হয় না, আর পথে ত আর চোর ডাকাত নেই যে আমাদের লুটে পুটে নেবে!

এক জন বল্‌লে, ভর সন্ধে বেলা অন্ত ভয় নেই?

—কিসের আবার ভয়? আমি কাউকে ভয় করি নে।

তারা যেখান দিয়ে যাচ্ছিল সেখানে জনমনুষ্য ছিল না। দু পাশে বাগান, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, মাঝ খান দিয়ে সরু পথ, পাশাপাশি দু তিন জন যেতে পারে না। মেয়েরা একের পর আর এক জন, এই রকম ক'রে যাচ্ছিল।

পথের পাশে এক জায়গায় একটা বাঁশঝাড়। ঝাড়-বেড়ার ভিতর, পথের দিকে গোটা কতক বাঁশ হেলে আছে। তখন বেশ অন্ধকার, আর ঠিক সেই খানে ঝোপ পানা ব'লে কিছু বেশী অন্ধকার। চারি দিকে ঝি ঝিঁ পোকা ডাকছে, পথের মাঝ খানে, গাছের ভিতর জোনাকি উড়ছে, মানুষের কোথাও সাড়া নেই, চারিদিকে আর কোন শব্দ নেই। মেয়েদের কারুর মুখে কথা নেই, ভয়ে ভয়ে সব তাড়াতাড়ি চলেছে। দু জন এগিয়ে গিয়েছে আর চার পাঁচ জন পিছনে আসছে এমন সময় একটা বাঁশ পথের দিকে নুয়ে প'ড়ে আবার উপরে উঠে গেল! আবার আস্তে আস্তে নুয়ে পড়তে আরম্ভ হ'ল। সর্ব্বনাশ! রাত্রে অন্ধকারে ভূত ছাড়া আর কিসে এমন ক'রে বাঁশ নোয়াবে? মা গো! ব'লে মেয়েরা ছুটল। কারুর মুখে 'রাম' নাম বেরুল, কারুর দাঁত কপাটী লাগবার মত হ'ল।

পালাল না একা চাঁপা। সে পথে দাঁড়িয়ে দেখলে আর সকলে পালিয়ে গেল। তখন বেশ সহজ গলা ক'রে বল্‌লে, কে গা তুমি, রাত্রি বেলা মেয়েদের এমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছ?

বেড়া টপ্‌কে পুঁটেরাম তার পাশে এসে দাঁড়াল। বল্‌লে, এই রকম একটা কিছু ফন্দি না করলে ত তোমাকে একলা পাবার যো নেই। তোমার সঙ্গে গোটা দুই কথা আছে।

—ভূতের কথা শুনে কাল যে গাঁ-সুদ্ধ তোলপাড় হবে সে কথা ভেবেছ? আমার সঙ্গে আড়ালে তোমার কি কথা? যা বলবার থাকে দু কথায় বল, আমাকে এখ্‌খুনি ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

মেয়েরা আগে দৌড়ে যাচ্ছিল, একটু পরেই পিছনে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেয়ে

এক জন হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, ঐরে, এইবার তেড়ে এসে ধরবে! রাম-রাম, রাম-রাম!

পিছন থেকে শব্দ এল, ওলো ভয় নেই, আমি চাঁপা! তোরা একবার দাঁড়া। চাঁপা এলে এক জন বল্‌লে, কি ভাগ্যি তুই রক্ষে পেয়েছিস! আমরা ভাবলাম বুঝি তোর ঘাড় মট্‌কে থুয়েছে!

—মাঙ্‌না পেয়েচে কি না, ঘাড় মটকালেই হ'ল! তোরা আর অমন ক'রে ছুটিস্ নে। এম্‌নি ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে কি বাড়ী যাবি? কথা বলি শোন্।

চাঁপা খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তার হাসি শুনে অন্য মেয়েদের ধড়ে প্রাণ এল। চাঁপা বল্‌লে, তোরা ভেবেছিলি ভূত না?

মেয়েরা ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে জড়াজড়ি ক'রে বল্‌লে, রাম রাম, নাম করতে নেই, রাম নাম কর্।

—তোরা ত ভয়ে পালিয়ে এলি, আমি অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখি বাঁশগাছে একটা হনুমান বসে রয়েছে, থেকে থেকে বাঁশটা নোয়াচ্ছে।

রামচন্দ্রের পরম ভক্ত পবননন্দনের সঙ্গে নিজের অভিন্ন সাদৃশ্য জানতে পারলে পুঁটেরাম কি বল্‌ত তা অনুমান করা যায় কিন্তু ঠিক বল্‌তে পারা যায় না।

চাঁপার সঙ্গিনীরাও তখন হাসতে লাগ্‌ল। চাঁপা বল্‌লে, বাড়ী গিয়ে কারুর কিছু বলবার আবশ্যক নেই। যেন কিছুই হয় নি।

এই পরামর্শ ঠিক হ'ল।

৬

সেই রাত্রে যাদব রায়ের বাড়ী ডাকাত পড়ল। রাত্রি তখন দুইটা, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। চারি দিকে নিশুতি, কেউ কোথাও জেগে নেই। বাড়ীর সাম্‌নে এসে মশাল জেলে 'রে—রে' শব্দে ডাকাতেরা বাড়ী ঘেরাও করলে। সদর দরজায় যে কয়জন লাঠিয়াল পাহারায় ছিল লাঠি হাতে তারা বেরুতেই ডাকাতেরা তাদের মাথা ফাটিয়ে দিলে। ভিতর থেকে ফটক বন্ধ হ'য়ে গেল, ভিতরে যারা ছিল তারা কতক দরজা থেকে গজালের মাথা খুলে ছোট ছোট বর্শা চালাতে লাগ্‌ল, কতক ছাদের উপর উঠে বড় বড় থান ইট ডাকাতদের উপর ছুড়তে লাগল।

ডাকাতদের মালকোঁচা আঁটা, খোলা গা, গায় তেল চক্ চক্ করছে। দুজন দুইটা কুড়াল নিয়ে দরজা চিরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল, এক জনের বুকে দরজার ভিতর থেকে এমন সড়কি বিঁধে গেল যে সে আর্ত্তনাদ ক'রে প'ড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ দুজন ডাকাত তাকে তুলে নিয়ে গেল, আর এক জন কুড়াল নিয়ে দরজা কাট্‌তে লাগ্‌ল। বাইরে ডাকাতদের হৃৎকম্পকারী বিকট চীৎকার, ভিতরে গৃহস্থের ছেলে মেয়ে, স্ত্রীপুরুষ, লোকজনের ভীতিপূর্ণ চেঁচামেচি। বাতাসে মশালের আলো কাঁপ্‌ছে, মাটীতে ভূতের মত ছায়া নৃত্য করছে, গাছের পাতায় আলো চিক্ চিক্ করছে, ভীষণ কোলাহলে কাকগুলা কা কা ক'রে অন্ধকারে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বাড়ীর সামনে পাঁচ সাত রসি লম্বা জায়গা জুড়ে ঘাটির পাক ফিরছে। লম্বা দেড়হাড়া জোয়ান, লোহার মত আঁটালো শরীর, হাতে খোলা তলোয়ার, মণ্ডলাকারে বিদ্যুদ্বেগে মাথার উপর ঘুরছে। এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্য্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে, তলোয়ার খেলাতে খেলাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে তার ভীম গর্জ্জন ভীষণ উৎকট তালে উঠ্‌ছে নামছে। রে-রে রে-রে একটা রব তার কণ্ঠ থেকে অবিশ্রান্ত নিঃসৃত হচ্ছে, এক একবার সে শব্দ আকাশ ভেদ ক'রে ওঠে আবার স্বর কিছু নরম হয়। পাড়ার লোক দূরে জড় হ'তে আরম্ভ হ'ল কিন্তু কার সাধ্য তার মোয়াড়া নেয়? পুঁটেরাম কারুর নিষেধ না শুনে তার সমবয়স্ক এক দল যুবক নিয়ে লাঠি হাতে এল,ডাকাতদের সঙ্গে তাদের লাঠালাঠি হবার উপক্রম হচ্ছে, এমন সময় সকলে সভয়ে দেখলে সমুদ্যত খড়্গধারিণী করাল কালীরূপিণী রমণী-মূর্ত্তি বেগে সেই দিকে আসছে। নীলাম্বরী সাড়ী অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ, মুক্ত, কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ হাঁটুর উপর পড়েছে, কপাল-জোড়া সিঁদুর টক্ টক্ করছে, হাতে খাঁড়া মশালের আলোকে ঝক্ ঝক্ করছে! বিশাল নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ক্রোধপ্রদীপ্ত রণরঙ্গিণী সংহার-মূর্ত্তি! সঙ্গে সঙ্গে আলোয় অন্ধকারে আন্দোলিত ছায়ায় যেন ভৈরবীর দল নৃত্য করতে করতে আসছে।

নৈশস্তব্ধতাবিদারী সেই ঘোর কোলাহল স্তব্ধ হ'য়ে গেল! ঘাটির পাকের তলোয়ার হাত থেকে নুয়ে পড়্‌ল,সে পাষাণ মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল! ডাকাতের সর্দ্দার ডেকে বল্‌লে, ও মূর্ত্তি দেখে এখানে আর থাকা নয়! মাছ পড়বে না রে, শুধু জাল গুটো!

যাদের হাতে মশাল ছিল তারা মশাল ফেলে দিলে। মাটীতে প'ড়ে

জলে জলে মশাল নিভে যেতে লাগ্‌ল। ডাকাতেরা নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

মশালের আলোকে সেই মসিময় অঙ্গ ও উজ্জলানন মূর্ত্তিতে পুঁটেরাম চিনেছিল—চাঁপা!

৭

ডাকাতেরা শুধু হাতে চলে গেছে এ কথা বাড়ীর লোকে সহজে বিশ্বাস করে না, তার পর বাইরের লোকের কথা শুনে আশ্বস্ত হ'য়ে দরজা খুলে দিলে। কালী-মূর্ত্তি দেখে ডাকাতেরা পালিয়েছে শুনে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এল। এ দিকে ডাকাতেরা চলে যেতেই চাঁপার হাত থেকে খাঁড়া প'ড়ে গেল, সে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে প'ড়ে যায় দেখে পুঁটেরাম ছুটে গিয়ে তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে ঘাসের উপর শোয়ালে। চাঁপা মুর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। একজন লোক তাড়াতাড়ি একটা মশাল তুলে ধরলে। মূর্চ্ছা বেশী-ক্ষণ রইল না। আবার যখন চাঁপা চোখ মেল্‌লে তখন পুঁটেরামের চোকে তার চোক মিল্‌ল। সে যেন কি কথা বলবার জন্য অল্প মুখ খুল্‌লে, ঠোঁটও নড়্‌ল, কিন্তু কোন কথা বেরুল না। কিন্তু তার ঠোঁট নড়া দেখে পুঁটেরাম বেশ বুঝতে পারলে সে বল্‌লে, দামোদর,—পুঁটেরামের ভাল নাম। মেয়েরা আসছে দেখে পুঁটেরাম স'রে গেল।

দেবীকে যেমন ঘরে নিয়ে যায় সেই রকম সকলে চাঁপাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। যাদব রায় এসে বল্‌লেন, তুমি আমার ঘরে রক্ষেকালী হ'য়ে এসেছিলে মা, আজ তুমি আমাদের রক্ষে করলে। এ উপকার আমি কেমন ক'রে শুধ্‌ব?

পাশে একজন বুড়ী বললেন, আর কখন এ বাড়ীতে কোন ভয় হবে না। কালীমূর্ত্তি দেখলে সে বাড়ীতে আর কখন উৎপাত হয় না।

কর্ত্তা চলে গেলে গিন্নী আর দুএক জন চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন্‌ ভরসায় ওরকম ক'রে গেলে? তোমার কি প্রাণে ভয় হয় নি? চাঁপা তখন উঠে বসেছে। বল্‌লে, কি মনে হয়েছিল বল্‌তে পারিনে। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছি আর কে যেন আমার কাণে কাণে বল্‌লে,—'যা, মা-কালীর মত সেজে মায়ের খাঁড়া নিয়ে যা! ঠাকুর ঘরের পাশে ছোট ঘরে খাঁড়া ঝুলান আছে।' তার পর কখন্‌ যে কি করেছি আমার মনে নেই। যমন স্বপন দেখে স্বপনের ঘোরে কিছু করে সেই রকম।

সেই দিন থেকে বাড়ী স্বদ্ধ লোক চাঁপার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্ল। গিন্নী তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াতেন, কর্ত্তা দিনে দশ বার খোঁজ নিতেন। চাঁপারও স্বভাব যেন বদ্‌লে গেল। সে আর গঙ্গার ঘাটে যেত না, খিড়কীর পুকুরে গা ধুত, আগের মত হাসিখুসী, ঠাট্টাতামাসাও করত না। চাঁপার দিদিমা বাড়ী যাবার কথা বল্‌লে গিন্নী বল্‌তেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের? দু'দিন আরও আমাদের কাছে থাক।

পাঁচ ছয় দিন এই রকম ক'রে কেটে গেল। আর তার পর এক দিন সকাল বেলা চাঁপাকে দেখতে পাওয়া গেল না! চার দিকে খোঁজ হ'ল কোথাও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বল্‌লে তাকে, 'নিশি'তে ডেকে নিয়ে গিয়েছে, কেউ বল্‌লে মা-কালী তাকে নিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুঁটেরামও নিরুদ্দেশ হ'ল। কত খোঁজ হ'ল, কত জায়গায় লোক গেল, সে যে কোথায় চলে গেল তা কিছুই জানা গেল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



পথিক

একটা কোন বড় রকমের অসুখ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে যেমন অস্বোয়াস্তি বোধ করা যায়, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারা যায় না যে কেন তাহা হইতেছে; উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে কেবলই তাহা যেন বাড়িয়া চলে; মনের জোর করিয়া 'কিছু হয় নাই' বলিয়াও কোন উপকার পাওয়া যায় না, ঐ গ্লানিটা অদৃশ্য কণ্টকের মত শরীরের কোন খানে লাগিয়া থাকে, তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার উপায় নাই,—মিত্র পরিবারেও ঠিক এই রকমের একটি অশান্তির কাঁটা, কোথায় যেন লাগিয়াছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিতে ছিলেন কিন্তু ইহার কারণ কেহই ঠিক ধরিতে পারেন নাই এবং প্রত্যেকেই যে ঐ অদৃশ্য কাঁটার খোঁচা খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িতে ছিলেন তাহা তাঁহাদের সমস্ত কাজ এবং কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল।

সকালে চা খাইতে বসিয়া বীরেন্দ্রনাথ খানসামাকে বকিয়া উঠিলেন—সবাই এক একটি নবাবজাদার নাতী হয়েছ, আট্‌টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না—'

কিন্তু বাস্তবিক তখনও চা'এর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই এবং নবাবজাদার নাতী 'খান্‌সামা' ঠিক সময়েই তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছিল।

বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী করুণা তাঁহার কন্যা দীপ্তিকে লইয়া পড়িলেন—দু স্লাইস্ টোষ্ট আর একটা ডিম, এমন কিছু গুরুভার পদার্থ নয়, যার ওপর একটা কলা আর একটা সন্দেশ খাওয়া যায় না!—খাও।

কন্যার মেজাজও বিগ্‌ড়াইয়া গেল! সন্দেশ খাওয়াটা যদিও 'জিওমেট্রি' পড়া নয়; ঈষৎ নাকিসুরে সে বলিল—পারি না মা, তবু জোর ক'রে খাওয়াবে—' ইহার পরই তাহার নাকের ডগাটি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল এবং চশমা-ঢাকা চোখের কোণে জল ভরিয়া উঠিল! তাহা দেখিয়া কি বলিতে যাইয়া করুণা থামিয়া গেলেন এবং একখানা টোষ্টের উপর মাখন মাখাইতে লাগিলেন। তাঁহার কপালের মাঝখানে সেই অশান্তির খোঁচার দাগ একটু বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিল

শ্রীশ মাথা নীচু করিয়া চায়ের 'কাপে'র উপর ঝুঁকিয়া যেন কি গভীর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিল, তাহা দেখিয়া করুণা বলিয়া উঠিলেন—তোর আবার হ'ল কি ?—'

ইহার উত্তর কিছু শোনা গেল না, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে এক নিশ্বাসে চায়ের কাপ খালি করিয়া শ্রীশ উঠিয়া পড়িল।

এতক্ষণ কেহই লক্ষ্য করেন নাই যে শ্রীশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই চা খাইতে বসিয়াছিল, কিম্বা এটা তাহার প্রতিদিনের নিয়মের মধ্যে বলিয়া সকলেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু করুণার দিদি সুবর্ণ তাহা এতক্ষণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভগিনীর নিকট অল্প দিন হইল আসিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে সংসারের সমস্ত কিছুই যেন তাঁহার জানা হইয়া গিয়াছে, কিছুই অবিদিত এবং অগোচর নাই। বীরেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি, করুণার মানসিক দুশ্চিন্তা, দীপ্তির কি একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা এবং শ্রীশচন্দ্রের আদি ও অন্ত, নাড়ী ও নক্ষত্র সবই, এই ক'দিনে তিনি জানিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এমন ভাবে তিনি কথা কহেন যেন সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা লইতে পারে।

শ্রীশ ঘরের দরজার কাছে যাইতেই সুবর্ণ বলিয়া উঠিলেন—তিয়াত্তর নম্বরে যাবে বুঝি ?—'

এটি মুখের কথা কিন্তু শ্রীশ এমন ভাবে আড়ষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া একটা কথার তীর বুকের মাঝখানে আসিয়া বিঁধিয়া গিয়াছে! সে শুধু একবার কপালটাকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—হাঁ।

সুবর্ণ চামচে করিয়া খানিকটা ডিম মুখে দিয়া চোখ একটু ছোট করিয়া বলিল—ও—'

ঐ ছোট্ট 'ও'-শব্দটির অন্তরালে যে কি রহিল তাহা সকলেই বুঝিলেন কিন্তু কেহই কোন কথা কহিলেন না ; কারণ উহা হইতে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। মিত্র পরিবারের বুকে অশান্তির খোঁচা তেমনিই বিঁধিয়া রহিল।

শ্রীশ চলিয়া যাইবার পরে সুবর্ণ বীরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—দেখুন, এ সমস্ত কিন্তু আপনাদের জন্যেই হচ্ছে। অতটা স্বাধীনতা, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক কাকেও দেওয়া উচিত নয়।

বীরেন্দ্রনাথ ছুরি লইয়া একটা 'কেক'এর উপর একটু চাপ দিয়া একবার স্থবর্ণের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনির অর্থ কতকটা যেন—'আমার ছাগল আমি যদি লেজের দিকে কাটি তাতে তোমার কি?' কিন্তু মুখে বলিলেন—হুঁ—'

এখানে কোন স্থবিধা হইল না দেখিয়া স্থবর্ণ করুণাকে লইয়া পড়িলেন—তোর ঐ মেয়েটাকে যা ধিঙ্গী ক'রে তুলেছিস্ করুণা, আর যা চাল-চলন হচ্ছে ওর, সমাজে বা'র করবি কি ক'রে? আর—'

স্থবর্ণের কথার মাঝখানেই দীপ্তি বলিয়া উঠিল—ও-ই যাঃ! কি হবে? শান্তাকে একটা বই পাঠাতে হবে—এক্কেবারে ভুলে গেছি! . . .

সে টেবিল ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

করুণাও এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, যেন অমন কোন একটা মত্‌লব খাটাইয়া দিদির হাত হইতে উদ্ধার পাইলে তিনিও বাঁচিয়া যান।

চা খাওয়া শেষ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ খবরের কাগজে মুখ ঢাকিলেন, তাঁহার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

স্থবর্ণ করুণাকে বলিলেন—তা হ'লে শ্রীশের ও কথাটা সত্যি?

করুণা। সত্যি বৈকি। ও যখন ধরেছে তখন কর্‌বেই। ও ত আর ছোট নয়? ওর মনে যদি এটা লেগে থাকে, করুক, তাতে আমাদের বাধা দেবার ত অধিকার নেই।

স্থবর্ণ। অধিকার নেই?—তার মানে? আশ্চর্য্য কর্‌লি করুণা!—তুই না মা?

করুণা হাসিয়া বলিলেন—আমার মাতৃত্বের অভিমানকে বড় ক'রে, সুস্থ সবল মনের ছেলের স্বাধীনতায় হাত দেবো কি ক'রে? তা ছাড়া ও ত আর চুরি ডাকাতি কর্‌তে যাচ্ছে না?—'

স্থবর্ণ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—স্বাধীনতা?—একে বল্‌তে চাও স্বাধীনতা? ডাকাতি নয় ত কি? জোর ক'রে রাস্তার লোকের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াটা ডাকাতি নয়? এই যে 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' ব'লে উপদেশ দিচ্ছিলে, এটার অর্থ কি? আমার যদি ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিষ ব্যবহার কর্‌ব, তাতে তোমার মাথা-ব্যথা কেন?—আমার খুসীমত চল্‌বার অধিকার এবং স্বাধীনতা অবশ্য আমার আছে'।

করুণা কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিবার ছিল না বলিয়া নয়, তিনি তর্ক এবং অনর্থক একটা গোলমাল হইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু স্বর্ণ ছাড়িলেন না; তিনি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন—এই যে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে পথে পথে টো—টো ক'রে বেড়ান,এরই মধ্যে কি খুব একটা পৌরুষ আছে ? আর এই বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পুলিশের হাতে মার খাওয়া, জেলে যাওয়া—'

করুণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন—আছে। এত বড় পৌরুষ আমাদের বংশে কেউ দেখায় নি। ওর এই পৌরুষে আমি ধন্য হ'য়ে গেছি।—পড়নি কাগজে তার বিবরণ? যখন তারা মেয়েদের সঙ্গে অমন কাপুরুষের মত ব্যবহার কর্‌ছিল, তখন আমার শ্রীশ—আমার ছেলে—'

কথার মাঝ্‌খানে স্বর্ণ হাসিয়া বলিলেন—এই নিয়ে তুই গর্ব্ব করিস্ করুণা ?

করুণা। গর্ব্ব ? গর্ব্ব বল্‌লে ঠিক আমার মনের কথাটা প্রকাশ হয় না; সে আমি তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না দিদি, কি মনে হয় আমার, যখন ঐ ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে!

স্বর্ণ একটু বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—চমৎকার ছবি।—

আজ সকালে এই যে ঘটনাটুকু হইয়া গেল, মিত্র পরিবারে মাসীমাতার আবির্ভাবের পর হইতে প্রতি দিনই ঠিক ঐ রকম হইতেছে। কিন্তু কোন প্রতিকার হইবার উপায় নাই অথচ আরো বেশী দিন এমন সহ্য করাও সকলের পক্ষে শক্ত।

কিন্তু আপনা হইতেই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে শুধু খাইবার ও শুইবার ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সময় বাহিরে কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীশ ত পিতার বহু পূর্ব্বে ঐ পথটি খুঁজিয়া লইয়াছিল, এবং দীপ্তি তাহার ঘর ছাড়িয়া বড় একটা বাহির হইত না। কিন্তু করুণার হইল মুস্কিল। দিদির হাত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন না।

সংসার পাতিয়া সংসারী হইয়া কত ভুল ত্রুটি লইয়া যে তিনি চলিয়াছেন তাহাই শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণ বুঝাইয়া দিলেন—করুণার 'মা'-হওয়াই একটা ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে, কারণ ছেলে-মেয়েকে তিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই; এবং ইহার জন্য যে তাঁহাকে চিরজীবন ভুগিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহই আর নাই ইত্যাদি।

স্বর্ণ ও করুণার মধ্যে আকৃতি, স্বভাব এবং সংস্কারের এত পার্থক্য যে সকলে

তাঁহাদের সম্বন্ধটিকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না। সুবর্ণের চোখ দুটি সর্ব্বদাই দেখিতে পায়—অন্যায়, অশোভন, যাহা কিছু নীচ। তিনি যেন মানুষের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কিছু যে দেখিবার আছে তাহা ভাবিয়া পান না। একজন স্নেহ অপরিচিত তাঁহার কাছে আসিলে, একবার দেখিয়াই তিনি ঠিক করিয়া ফেলেন —ঐ অপরিচিতের মধ্যে কতখানি নির্লজ্জতা, কতখানি নির্ব্বুদ্ধিতা, কতখানি উপযুক্ত চাল-চলনের অভাব ইত্যাদি তাহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তাহার নাক্‌টা কতখানি কুৎসিৎ রকমের উঁচু বা থ্যাব্‌ড়া, মুখের হাঁ, বড় বা ছোট হওয়ার জন্য কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে, পোষাক পরিধানের বিশেষত্বে তাহাকে কোন্ শ্রেণী ভুক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ—বখাটে, ইয়ার, বাবু, বা নির্লজ্জ ইত্যাদি ভাবিয়া লইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় না।

কোন ছেলের মাথায় বড় চুল দেখিলে বলেন—'মটর ড্রাইভার', ছোট দেখিলে বলেন—'কয়েদী'। মেয়েদের জ্যাকেটের ছাঁটের কম-বেশীর জন্য যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা ইহা হইতে কম শ্রুতি-মধুর নয়।

মন্দিরে বা পারিবারিক উপাসনার সময়ও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিছুতেই তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দেওয়া হয় না! তাঁহার কেবলই মনে হইতে থাকে—ঐ ছেলেটা, ঐ মেয়েটির দিকে যেন 'কেমন করিয়া' তাকাইল! তাহার তাকান'র ভিতর যেন কি একটা কদর্য্য ভাব ছিল এবং ঐ মেয়েটি যেন হাসিয়া তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল।

সুবর্ণের ধারণা, আজকাল সমাজটা এত উচ্ছৃঙ্খল এবং বেয়াড়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি না রাখিলে তাহা অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করিবে। তাই তিনি এমন ভাবে সকলের সঙ্গে মেশেন যে মনে হয় তিনি যেন এই জগৎটার মত একটা 'বোর্ডিং হাউসে'র সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট্ হইয়াই জন্মিয়াছেন।—অথচ ঠিক কেমনটি হইলে যে জগৎ সুন্দর হয় তাহা তিনিও যে বুঝিতেন তাহা মনে হয় না।

তাঁহার নিজের কেশ এত অসম্ভব রকমের সংযত যে প্রলয়ের ঝড় বহিতে সুরু হইলেও এক গাছি চুল স্থানচ্যুত হইবার উপায় নাই। বসন এমন নৈপুণ্য-হীনতার সহিত পরিহিত যে দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না!

তাঁহার শারীরিক গঠন সুন্দর। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের বিকাশ নাই। লাবণ্য

এবং লালিত্য তাঁহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে! তাঁহার চোখ মুখ নাক সর্ব্বদা তাঁহার তাড়া খাইয়া যেন ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছে। পাত্‌লা ঠোঁটের আড়ালে মুক্তার মত দাঁতগুলি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, শারীরিক নিয়ম পালন ছাড়া তাহারা ভুলিয়াও এমন কিছু করিয়া বসে না যাহাতে সাধারণ মানুষের মন খুসী হইয়া উঠে।

একবার তাঁহার স্বামী চন্দ্রকুমার তাঁহাকে একটু হাসিতে বলিয়া যে তাড়া খাইয়া ছিলেন, তাহা সকলেই জানে। সুবর্ণও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন—আমি 'ন্যাকামি' সইতে পারি না—'ওঁকেও' ছেড়ে কথা কই না—'

শুচি-বায়ুগ্রস্থ মানুষ যে শুচিতার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাদের কপালে শুধু যেমন অশুচি এবং অপবিত্র স্তূপ বহন করাই লেখা থাকে সুবর্ণেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। অনবরত ঐ সমস্ত বিষয় ভাবিয়া এবং সতর্ক হইবার চেষ্টা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ আপনার অজ্ঞাতসারে সকলের নিকট হইতে কেবলই দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন।

কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্রী নহেন। কেহ তাঁহার খোঁজ না লইলে, আপনি গায়ে পড়িয়া তাহার খবর লইতেন এবং এই গায়ে-পড়া জোর-করা একটা সম্বন্ধ তিনি সকলের সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। মানুষের নিকট হইতে ভয় এবং ভক্তি তিনি জমিদারী খাজনার মত আদায় করিয়া লইতেন। 'ভালবাসা'য় তাঁহার প্রয়োজন ছিল কি না জানি না, কিন্তু এই 'আদায়' বা 'প্রাপ্য' দিবার সময়ও মানুষ সহজে পার পাইত না। যে মুহূর্ত্তে হুকুম হইত তখনই তাহা সম্পন্ন না হইলে আর রক্ষা থাকিত না। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন—উহাদের কাজের মধ্যে তাঁহার আদেশ পালন করিবার কতখানি অনিচ্ছা রহিয়াছে, কাজ করিবার সময় তাহাদের হাত কেমন ভাবে নড়িতেছে বা চলিবার সময় কেমন ভাবে পা পড়িতেছে তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন।

এক সময়ে দীপ্তিকে কি একটা করিতে বলায় সে কেমন করিয়া উঠিয়া গেল, তাহার যাওয়ার মধ্যে কতখানি না-যাইবার ইচ্ছা ছিল তাহা তিনি করুণাকে বুঝাইতে ছিলেন। এমন সময় ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীশ ডাকিল—মা—'

সুবর্ণ করুণার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—ছেলে এল বেড়িয়ে—দুধ দাও গে জুড়িয়ে—'

করুণা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীশকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

সমস্ত দিন পথে পথে অনাহারে ঘুরিয়া বেড়াইলে যেমন একটা কালো ছাপ মুখের উপর আসিয়া পড়ে, শ্রীশের মুখের উপরও সেই রকম দাগ লাগিয়াছে, চোখ ঈষৎ লাল, পা ধূলায় ভরা! গায়ের খদ্দরের জামাটা চটের আকার ধারণ করিয়াছে!

শ্রীশ বলিল—আজ বিচার শেষ হ'ল মা। সুধীরের ছ'মাস জেল হয়েছে! তা'হোক্ এটা সহ্য হবে কিন্তু মিসেস্ রায়ের—

করুণা, শ্রীশের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, বলিলেন—চুপ—চুপ ওযে তোর মাসী শ্রীশ!

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা তাই না হ'য় হল, কিন্তু ওঁর ঐ বিলিতি কাপড়ের বাক্সটা ত আর এখানে রাখা চল্‌বে না মা।

করুণা। তুই কি পাগলের মত বক্‌ছিস্ শ্রীশ! 'চল্‌বে না' কি? তুই কি মনে করিস্ জগৎটাকে এক ছাঁচে ঢালাই কর্‌বি নাকি? তোর যদি ঐ মত হয়, তা হ'লে তোর মাসীর সঙ্গে খুব মিল আছে বল্‌তে হয়।

শ্রীশ। কিসে বুঝ্‌লে মা?

করুণা। তিনিও ঠিক ঐ রকম সবাইকে নিজেরই ছাঁচে ঢালাই কর্‌তে চান।

শ্রীশ আহত হইয়া বলিল—এটা তুমি ভুল বুঝ্‌লে মা! আমি ঢালাই কর্‌তে চাই না। আমি বল্‌তে চাই—আমার দেশের এই দৈন্য, এই অক্ষমতার বুকের ওপর দিয়ে আমার সুখ-সুবিধার জুড়িটা না ছুটিয়ে যদি পায়ে হেঁটে যাই তাতে আমার মাথা কাটা যায় না। এবারকার 'ফেমিন রিপোর্টটা' দেখেছ? তার সঙ্গে আজকের টেবিলে সাজান খাবার গুলো যদি মিলিয়ে দেখ্‌তে তা'হ'লে—'

এবার করুণার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—ভাবিনি শ্রীশ, তুই আমাকে এতটা নির্ব্বোধ আর স্বার্থপর মনে কর্‌তে পারিস্। আমি ও সব জানি, তবু ও থেকে বেশী তফাতে যেতে পারি না। তার কারণ আমারও একটা স্বাধীন চিন্তা কর্‌বার শক্তি আছে।—তুই ভাবিস্ খুব খানিকটা উপবাস আর স্বার্থ-ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই বুঝি দেশের কাজ করা হ'ল। আমি ভাবি ওতে শুধু নিজের

শরীর ও শক্তিকে পঙ্গু করা হয়, কাজ করবার জায়গাও সংকীর্ণ হয়ে আসে। এ ত এক দিনের কাজ নয়, সমস্ত জীবন ধ'রে কাজ ক'রে তবে যদি কিছু হয়। তোর একটা চাকরী ছাড়াতে কিম্বা উপবাস করার উপর দেশের সমস্ত ভাল নির্ভর ক'রে নেই বরং এতে তার ক্ষতি হয়। আরসিতে দেখ্ একবার তোর মুখখানা,—দেখ্ কি করেছিস্ তোর শরীরটাকে—'

শ্রীশ। কিন্তু মা! আমি তোমার কথাটাকে ঠিক এখন মেনে নিতে পারছি না!

করুণা। নিস্ নি। আমি ত তোকে জোর ক'রে কিছু বোঝাতে চাই না। হ'তে পারে তুই ঠিক কর্‌ছিস্। আমি ভুল কর্‌ছি। সে থাক্, এবার তুই স্নানটা সেরে আয় আমি ততক্ষণ তোর খাবার ঠিক করি।

শ্রীশ। আমি ভেবে ছিলাম—'

শ্রীশকে বাধা দিয়া করুণা বলিলেন—জানি তুই যা ভেবেছিস, কিন্তু বিশ্বাস কর্ শ্রীশ এতে শুধু তোরই ক্ষতি ছাড়া আর কারো কোন লাভ নেই।

শ্রীশ এবার নিজের শক্তিকে যেন একটু খর্ব্ব দেখিতে পাইল। সে জোর করিয়া কিছুতেই বলিতে পারিল না যে—হোক অন্যায় হোক ক্ষতি আমার, তাই অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি এমন সংশয়ের মধ্যে এনে আমায় ফেলে দাও মা, যেখান থেকে আমার যুক্তিগুলোকে ঠিক দেখ্‌তে পাই না—শক্তিকেও না।

২

আজ এক হপ্তা হইল শ্রীশ জেল হইতে ফিরিয়াছে। পথের ধারে দোকানে দোকানে, কতকগুলি মহিলা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার অনুরোধ করিয়া ফিরিতে ছিলেন; পুলিশ শান্তি-ভঙ্গের জন্য তাঁহাদিগকে ধরে এবং পুলিশের ব্যবহার মহিলাদিগের প্রতি উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়া, শ্রীশ, তাহার বন্ধু সুধীর এবং আরও কতকগুলি যুবক ধৃত হয়।

বিচারে শ্রীশ এবং ঐ দলের অন্য কতকগুলি যুবকের ১৫ দিন সশ্রম কারাদণ্ড হয় কিন্তু সুধীরের বিচার এই সঙ্গে হয় নাই; তাহার কারণ সুধীরের সুগঠিত দেহ। তাহার বিচার হইতে লাগিল সহরের খুনী, গুণ্ডা এবং ডাকাত প্রভৃতির সঙ্গে।

'এমন শরীর কি করিয়া হইল, কি কি ব্যায়াম করা হয়, যুযুৎসু জানা আছে কিনা, লাঠি খেলায় কতদূর দখল আছে, বোমা কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানা আছে কিনা—' এবং ইহার উত্তরে পুলিশ তাহার নিকটে কোনটিতে 'না' পায় নাই—সে ও সমস্তই জানে।

হাকিম প্রশ্ন করিলেন—কোথা হইতে শিক্ষা লওয়া হইয়াছে, তোমার দলের অন্য লোকের নাম কি ? গুরু কে ইত্যাদি।

সুধীর বলিল—সুস্থ শরীরটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি। যুযুৎসুটা 'কেম্ব্রিজে' থাকতে শিখেছি, লাঠি খেলতে শিখেছিলাম বনোয়ারীলালের কাছে, আমাদের দরোয়ান সে এখন স্বর্গে, আর বোমা তৈরী-করা শিখেছিলাম কলিকাতার কলেজে —এম্ এস্, সি ক্লাসে।

অপরাধগুলি যদিও অত্যন্ত গুরুতর কারণ কৃষিবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞাতব্য এবং একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যা ছাড়িয়া ঐসব বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি 'এই প্রথম অপরাধ' বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া হাকিম সুধীরের ছয় মাস সশ্রম কারাবাস রায় প্রকাশ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছাদের উপর বীরেন্দ্রনাথ, করুণা, সুবর্ণ, দীপ্তি, শ্রীশের নিকট ঐ সমস্ত শুনিতে ছিলেন, এমন সময় নীচে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল; সেই শব্দটি ক্রমে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া থামিয়া গেল! তাহার পরই শোনা গেল—দীপ্তি—'

করুণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ওমা! এ যে মায়া!

সুবর্ণ যেন করুণার কথা বিশ্বাস করিতে চান না, এমন ভাবে বলিলেন—মায়া ?—'

ছাদে আসিয়া সকলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া অন্ধকারে একবার সকলকে দেখিয়া লইয়া করুণার কাছে বসিয়া মায়া বলিল—হাঁ আমি মায়া, তোমরা মায়া কাটালেও আমি মায়া।—আজ কি বার ছোট মাসী ?

মায়ার কথার সুরে অভিমানের আভাষ পাইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া করুণা বলিলেন—ভুলে গেছি মা, একেবারে ভুলে গেছি, গাড়ী পাঠাইনি।

মায়া হাসিয়া বলিল—তা ত যাবেই—'

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কি ক'রে এলি ?

মায়া। কলেজ থেকে একটা ভাড়াগাড়ী ক'রেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাঝ পথে এসে ট্রামে চড়্‌বার ইচ্ছে হ'ল, তাই গাড়ীটাকে বিদেয় দিয়ে তাতে উঠে পড়্‌লাম।

সুবর্ণ শিহরিয়া উঠিলেন—তুই একা ?

মায়া। না, একা কেন ?—ট্রামে আরও প্রায় ৩০ জন মানুষ ছিল। আমি যে 'সিট্'টায় এসে বস্‌লাম সেখানে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি দেখ্‌লাম আমায় চেনেন।

সুবর্ণ। তুই অবাক্ করলি মায়া !—চেনে মানে ?

মায়া। মানে কি ক'রে জান্‌ব ? দেখ্‌লাম তিনি আমায় চেনেন। নমস্কার ক'রে একটু স'রে বসে বল্‌লেন—শ্রীশবাবুর সঙ্গে আমিও দিন কতক ঘুরে এসেছি।

সুবর্ণ। কি স্পর্দ্ধা !—তুই কি বল্‌লি ?

মায়া। আমি নমস্কার ক'রে বল্‌লাম—বড় কি কষ্ট পেয়েছেন ?

সুবর্ণ ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—আত্মীয়তা না ক'রে বুঝি আর পার্‌লে না ?

মায়া। না মা পার্‌লাম না। তিনিই ত আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেলেন। বেশ ছেলেটি। অত চওড়া কপাল বড় একটা চোখে পড়ে না। সুধীর বাবুর খবর ত তাঁর কাছেই পেলাম।

সুবর্ণ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—তোর বেহায়ামি দেখে অবাক্ হচ্ছি !—তোর লজ্জা ক'র্‌ল না ?

মায়া। মা, তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই ! ট্রামে যাচ্ছি, শ্রীশদার বন্ধু ভদ্রলোক অমন সহজ ভাবে এসে কথা বল্‌লেন, তার মধ্যে অন্যায় কোথায় দেখ্‌লে ?

সুবর্ণ। অন্যায় তোর কথা বলাতে।

এবার মায়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দীপ্তি তাহাকে টানিয়া তাহার ঘরে আনিয়া গলা জড়াইয়া বলিল—রাগ করেছিস্ ভাই দিদি আমার ওপর ?

যেখানে কিছু লাভের আশা থাকে সেখানে মানুষের ধৈর্য্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দীপ্তির উপর রাগ বা অভিমানের কোন কারণ না থাকিলেও মায়া একটু কেমন আড়ষ্ট ভাব ধারণ করিয়া অত্যন্ত ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল—নাঃ, রাগ করব কেন তোমার ওপর ?—আর করলেই বা তাতে তোমার কি এল গেল ?

দীপ্তি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। বার বার করিয়া ক্ষমা চাহিল।—তাহার ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে, গাড়ী পাঠাইবার কথা মাকে মনে করিয়া দেয় নাই।—শেষে অভিমান করিয়া বলিল—কিন্তু যদি জান্‌তিস দিদি কি ক'রে আজকের দিন কেটেছে আমার—তা'হলে—'

দীপ্তির গলার স্বর ভারী লক্ষ্য করিয়া মিথ্যা অভিমানের খোলস ফেলিয়া হাসিয়া মায়া বলিল—না গো না। অত সহজে মায়ার অভিমান হয় না। তোদের মত ভগবান আমায় নরম চামড়া দিয়ে গড়েন নি।—তুই কি ব'লে কাঁদ্‌ছিস্ দীপ্তি? গাড়ী পাঠাতে ভুলেছিস্ তার জন্যে কান্না কেন?

দীপ্তি। আমি বুঝি সে জন্যে কাঁদ্‌ছি?—কিন্তু তুই যদি আজ না আস্‌তিস্—তাহ'লে—'

মায়া এবার দীপ্তির দিকে ভাল করিয়া চাহিল। তাহার সর্ব্বগ্রাসী চোখের কাছে দীপ্তির না-বলা সমস্ত কথাই ধরা পড়িল। তাহার গালে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিল—খুব 'সার্‌মন্' শুনেছিস্ বুঝি?—বেচারী!

মায়া ঐ 'বেচারী' কথাটা এমন ভাবে বলিল যে দীপ্তি তাহার কান্নার মধ্যেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না! চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—উঃ সে কি বক্তৃতা দিদি! সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে!—তবু তুই আমাকে বল্‌তে চা'স্ নরম চাম্‌ড়া?

মায়া। নিশ্চয়ই বল্‌ব। নরম নয়ত কি? শক্ত হ'লে হাত ঠেক্‌লেই বেজে ওঠে। আমায় বলুন না!—প'ড়ে প'ড়ে মার খাবি তা কি হবে? তোরা ভাবিস্ কোন গুরুজন যদি কোন সমস্যার কথা কিম্বা যা কিছু বলেন, তাই মাথা পেতে নিতে হবে, এবং নেওয়াটা উচিত, কোন তর্ক বা বিচার না ক'রে! আমি কি ভাবি জানিস্?—ভাল হওয়ার যে সমস্ত নিয়ম কানুন চোখের সামনে এঁটে রেখেছেন আমাদের গুরুজনেরা, তা হচ্ছে 'শ্লেভ্ মেণ্টালিটি'র বীজ। একটা কোন নিজস্ব মত প্রকাশ করেছ কি সর্ব্বনাশ!—অম্‌নি ধম্‌কানি! আর ঐ ধম্‌কানিকে প্রশ্রয় দিস্ তোরাই।

স্কুলকলেজের কম্পাউণ্ডে দেখি দলে দলে ঘুরে বেড়ায় সব নম্রতা, শ্লীলতার এক একটি প্রতিমা!—মাথাটি নীচু পিঠটি উঁচু! মুখের উপর আছে তাদের ভাল মেয়ের মার্কা মারা!

কোন ছোট ছেলে মেয়ে যদি ছুটোপাটি করে এঁরা চোখ রাঙ্গিয়ে ইসারায় বলেন, ছিঃ অমন করতে নেই,—আমাদের দেখে শেখ।

আমি যখন প্রথম লাহোর থেকে এলাম, এখানকার ছেলে মেয়েদের চালচলন দেখে হেসে বাঁচি না; কিছুতেই ভেবে পেতাম না, এত অল্পবয়সে ওরা কি ক'রে এমন বুড়ো হ'য়ে উঠ্‌ল!—হাস্‌তে জানে না, চল্‌তে জানে না, কথা কইতে জানে না। সবারই প্রাণে যেন একটা মহা আতঙ্ক লেগে রয়েছে—এই বুঝি খারাপ হ'য়ে গেলাম। . . . নিজেদের এত পক্কা, এত সস্তা মনে করে এরা! এদের অভিভাবকেরা ভাবেন যেন তাঁদের ছেলে মেয়েরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—খারাপ হ'য়ে যাবার জন্যে। কেউ তাদের হাত ধ'রে ঐ পথে নিয়ে গেলে যেন তারা বেঁচে যায়।—আশ্চর্য্য মানসিক দুর্ব্বলতা!

সদাহাস্যময়ী মায়ার মুখে এ সমস্ত তীব্র কথা শুনিয়া দীপ্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে মায়ার কাছে বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া অত্যন্ত ভীত ভাবে বলিল—ভাই দিদি, তোকে ত এমন কোন দিন দেখিনি?—কি হ'ল তোর?

মায়া। কি হ'ল?—মার কাছে আজ যে সমস্ত অপমানের কথা শুন্‌লাম, তা ভুল্‌তে হয়ত চিতায় শুতে হবে।—কি অবিশ্বাস! দেখ্ দীপ্তি, আমার সময় সময় মনে হয়, মানুষ যে খারাপ হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ অবিশ্বাস।

দীপ্তি—অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মেয়ে—সে কোন বিষয়ে কিছুতেই অতটা যাইতে পারে না। মায়ার কথার ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলিল—কিন্তু দেখাও ত যায় সে—'

মায়া। যা দেখা যায়, তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তার মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখ্‌তে পাই না। তোমরা দেখ শুধু 'কাজ'কে, আর তারই বিচার কর; কিন্তু ঐ কাজের কারণটাকে নিয়ে যদি একটু নাড়াচাড়া কর, তাহ'লে আর অত সহজে বিচার করতে পারবে না।

দীপ্তি সুবর্ণের নিকট বসিয়া যখন উপদেশ শুনিতেছিল তখন তাহার প্রাণ সহস্র বার বিদ্রোহ করিয়া উঠিলেও একবারও মনে আনিতে পারে নাই যে এমন ভাবে কোন কথা তাঁহাকে বলা যাইতে পারে। এমন করিয়া কোনদিন সে ভাবিয়াও দেখে নাই। মায়ার কথা শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা বিষম বিপ্লব বাধিয়া গেল!

সে এত দিন যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানিত, যাহা লইয়া তাহার তৃপ্তির সীমা ছিল না, আজ তাহাই মনে হইল, সে যেন একটা রংদার খেলার সামগ্রী, এত দিন সকলে তাহার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মনে হইল পূর্ব্বেকার কালের মেয়েরা যে ভাবে বসন-ভূষণ পরিত, কেশ-বিন্যাস করিত, যে ভাবে বর্দ্ধিত হইত এবং জীবন যাপন করিত, এখন ঠিক সে ধরণটি নাই এবং ঐ সমস্তের মধ্যে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। এই নূতনত্বটিকেই সে এত দিন বড় করিয়া দেখিতেছিল, ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্য্যের ক্ষেত্রটা যাহার উপর সমস্তই নির্ভর করিয়া আছে তাহা তখনও যেমন সঙ্কীর্ণ ছিল আজও তেমনই আছে।

দীপ্তি মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মায়াকে সে যেন এই প্রথম দেখিল! আগেকার মায়ার সঙ্গে এখনকার মায়ার যেন কোথাও কোন সাদৃশ্য নাই।

সবাই ভাবিত মায়া হাল্কা মনের মানুষ, দীপ্তিও কত সময় ভাবিয়াছে যে সে শুধু হাসিতে ও হাসাতেই জানে, গভীরতার সহিত তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু আজ যাহা শুনিল—কি আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা!

দীপ্তি দুই হাত দিয়া মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—দিদি—'

অনাহত স্রোতটির মধ্যে কোন বাধা আসিলেই যেমন জলরাশি উছলিয়া উঠে, মায়ারও সেইরূপ হইল! সে এতক্ষণ আপনার ভাবনার স্রোতে তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, দীপ্তির ডাকে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে দীপ্তির কপালের উপর হইতে চুল সরাইয়া পিঠের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল—কিরে আমার প্রেমে পড়্‌লি নাকি?

দীপ্তি আনন্দে গর্ব্বে উথলিয়া বলিল—না প'ড়ে কি আর উপায় আছে! উঃ কি ভয়ানক মিষ্টি লাগ্‌ছে তোকে দিদি!—তোর চোখের মধ্যে সমস্ত বাইরেটাকে যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি!

মায়া। ও, বুঝেছি তোর হিংসে হচ্ছে। তা এক কাজ করিস, কাল থেকে তুইও ট্রামে চ'ড়ে চ'ড়ে বেড়াস্ হয়ত বা—'

মায়ার মুখে হাত চাপা দিয়া দীপ্তি রাগিয়া বলিল—ধোৎ, আমি তা বল্‌ছি বুঝি?—যাঃ তোকে আর কক্‌খন—'

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে কে ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—কি, তোমাদের

জন্যে বাড়ার সবাই অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে নাকি ?—গল্পগুলো খাওয়ার পর করলে হ'ত না ? তাহার পরই এক জোড়া চটিজুতার শব্দ খস্ খস করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল !

দীপ্তি একটু বেশী ভয় পাইয়াছিল কারণ সুবর্ণের কথা হইতে বোঝা গেল যে তিনি অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন শেষে অসহ্য হওয়াতে বকিয়া উঠিয়াছেন।

মায়া হাসিয়া বলিল—'ডিনার গং' বেজে গেল এখনও ব'সে রইলি যে ? —ওঠ্—'

ক্রমশঃ

শ্রী—

ফুলের আকাশ

চারিদিকে রব উঠ্‌ল—সে এসেছে! . . . সে এসেছে! . . . ঐ একই কথা,—সে এসেছে! . . .

আমি অনেক দিন আগেও তার নাম শুনেছি।—শুনেছিলাম, সে বেশ ছবি আঁক্‌তে পারে। কবিতা লিখ্‌তে পারে। গল্প লিখ্‌তে পারে। আরো শুনেছিলাম সে খুব 'ভালবাসাতে' পারে . . .

সেটা যে প্রশংসা হ'য়েই আমার কানে পৌঁছেছিল তা নয়;—নিন্দা ক'রেই লোকে সে কথা বল্‌ত।

শুনে শুনে মনে হ'ত, আমি একবার লোকটিকে দেখ্‌ব।—আর কিছু নয় শুধু দেখ্‌ব ব'লেই দেখ্‌তে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু তাকে দেখা হ'ল না। . . .

তারপর অনেক কাল কেটে গেল।

আমি বড় হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম। রূপ-যৌবন মানুষের ভীড়ের ভিতর আমাকে অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধর্‌ছে। আমি সেই খান থেকে দেখ্‌তাম—চোখ—চোখ—চোখ! . . . কেবল চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে! . . .

ভাবতাম ওরা আমার কি দেখে?

আমার এই কোঁকড়ান চুলের কালো থোকা দেখে ভাল লাগে এদের?—আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে কেন? এ চোখে কি আছে?—'

আমিত যত বার আয়নাতে এ চোখের ছায়া দেখেছি, কখনও ত শুধু এই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকিনি! . . .

গালের উপর এই তিলটির দিকে তাকিয়ে থাকে? না ওদের দিকে তাকিয়ে আমার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে, তাই দেখে ওরা? . . .

অনেকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তারা বল্‌ত আমি বড় 'সুন্দরী'। কেউ জানাল সে আমাকে 'ভালবাসে'। . . .

আমার মনে হ'ত, এমন এক জন কেউ আসে না, যে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে ব'লে যাবে—আমি তোমাকে ভালবাসি না। সেই কথা তোমাকে বল্‌তে এসেছি।—'

বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ত, সে রকম লোকেরা কি রকম দেখ্‌তে হয়।

গান গাইতাম, হাস্‌তাম, কথা কইতাম।—সবাই বল্‌ত—বড় ভাল লাগে—' সবারই চোখ কান মুখ কি এক রকম? তাই মনে হ'ত ওরা সবাই বুঝি পরামর্শ ক'রে মিথ্যা কথা বল্‌ছে! . . .

মনটা মাঝে মাঝে বিরক্তিতে ভ'রে যেত।—এমন একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয় না যে বল্‌বে—তোমার কিছু ভাল নয়। গান নয়, হাসি নয়, কথা নয়, . . .

বাবা মাও এত ভালবাসতেন!—

তাঁরাও বল্‌তেন—আমার সব ভাল! . . .

তারপর একদিন শুন্‌লাম—সে আমাদের পাশের বাড়ীতে এসেছে! . . .

সে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভাবলাম এবার 'তাকে' দেখ্‌ব। . . .

কিন্তু কখন্ যে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত. আবার কখন্ বাড়ীতে ঢুক্‌ত, তা টের পেতাম না। . . .

তার একটা কারণও ছিল। মনে হ'ত বটে মাঝে মাঝে,—তাকে দেখ্‌ব; কিন্তু মনের বাইরে তখন একজন এসে সর্ব্বদাই আমায় দেখা দিতেন। . . .

যাঁরা বলেছিলেন—আমাকে ভালবাসেন, তাঁদেরই একজন ইনি. . .

ইনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়ে ছিলেন। . . .

আমি যে কেন বিয়ে কর্‌ব, তা ভেবে পেতাম না। উনি আমাকে ভালবাসেন—বাসুন। আমি ত বলিনি—আমি ভালবাসি—'

আমার ইচ্ছে কর্‌ত, আমিও কারুকে বল্‌ব—'আমি তোমাকে ভালবাসি—'

ছেলেদের খুব ফর্সা রং আমার ভাল লাগ্‌ত না। তারা যে মিথ্যে মিথ্যে 'ভাল মানুষ' সেজে থাকে, তা'ও ভাল লাগ্‌ত না। তাদের কি দেখে যে আমার ভাল লাগ্‌বে, তা'ও ঠিক জান্‌তাম না . . .

মনে হ'ত,—যাকে দেখ্‌লে আমার ভাল লাগ্‌বে, তাকে দেখ্‌লেই আমি চিন্‌তে পারব। . . .

'চিন্‌তে পারব' এই কথাটা খুব অন্তরের সঙ্গেই বিশ্বাস কর্‌তাম; আর তাকেই বল্‌তে পারব—'আমি তোমায় ভালবাসি—'

দু'একজনকে দেখে দু'একবার মনে হয়েছিল এই বুঝি সেই . . . কিন্তু একটু কাছে এসে দেখ্‌তাম—না, এ ত সে নয়! . . .

আমার যিনি স্বামী হলেন, তিনি বল্‌লেন—মানুষটিকে পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট—'

আমি তাঁর সঙ্গে পথে ঘাটে, দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। একটা লোককে দেখে এক দিনের জন্যেও মনে হ'ল না—তাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি! . . .

বছর কয়েক পরে, এক সহরে এসে শুনি সে এসেছে! . . .

বড় ডাকাত হলেও বুঝি তার কথা এত লোকে কানাকানি করত না . . .

যার সম্বন্ধে এত কথা শুন্‌তাম, তাকে একবার দেখ্‌তে পেলাম না ব'লে এক এক সময় বড় দুঃখ হ'ত।

আমাদের বাড়ীটা ছিল মেয়েদের বৈঠক। সহরে যাঁরাই আস্‌তেন, তাঁরাই আমাদের বাড়ীতে এসে আলাপ পরিচয় কর্‌তেন।

একদিন এক বড় লোকের স্ত্রী এলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে বিয়ে কর্‌বার আগে আরও দুজনকে বিয়ে ক'রেছিলেন।

তিনি একদিন তাঁর মোটা মোটা হাত দু'খানি নেড়ে বল্‌লেন—ওগো শুনেছ?—সে এসেছে . . . এবার যে কি হবে তা জানি না—'

দু'এক দিন যেতেই তার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের কাছেও তার কথা শুন্‌লাম . . .

সে নাকি মানুষকে বিশ্বাস করে না—কারুকে ভয় করে না . . . কখন খুব গল্প করে হাসে, কখনও চুপ ক'রে বসে থাকে।—কোন দিন বা রাত্রে উঠে ঘরের বাইরে চলে যায়! . . .

একদিন আমাদের বাড়ীর ক'জন মিলে ঠিক কর্‌লাম, এ মানুষটিকে দেখ্‌তেই হবে।

কথাটা ঠিক হওয়ার পর থেকে কেমন যেন ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল—না যাব না . . . কি আর দেখব?—সবারই মত একটা মানুষ ত? . . .

সকাল থেকে বৃষ্টি! . . . তবু ঠিক হ'ল আজ আমরা তাদের বাড়ীতে যাব।

কাপড় প'রে আমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে যখন ওরা সবাই বল্‌ল—'যাবে না

তুমি ?' . . . যাবনা যাবনা ক'রেও সেই বৃষ্টিতে ভিজে সকলের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম !—

কোন্ ঘরে সে থাকৃত তা জান্‌তাম না। বারান্দার প্রথমেই একটি ঘরের দরজায় পর্দ্দা ঝোলান। সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে গেল...

আমার তখন বুক কাঁপ্‌ছিল। দেখ্‌লাম, বুড়ো মানুষের মত একজন লোক আমাদের দিকে পিছন ক'রে কুঁজো হয়ে একখানি খাটে ব'সে আছে।

ঘরময় চুরুটের গন্ধ। ধোঁয়ায় ঘরখানি ভ'রে গেছে। মনে হ'ল বাইরের মত যেন ঘরেও বৃষ্টি হচ্ছে ! . . . একটা ধোঁয়াটে আলো যেন ঘরে বাইরে ঢাকা আছে ! . . .

আমরা ঘরে ঢুকতেও সে মুখ তুলে চাইল না ! . . .

তারপর যখন ওরা প্রত্যেকের নাম ধ'রে আলাপ করিয়ে দিল, মুখ তুলে প্রথমেই চাইল সে আমার দিকে ! . . .

এক নিমেষের একটি চাউনি ! . . . সে যে কি করতে পারে তা সেদিন বুঝ্‌লাম।

করুণা, তেজে ভরা দৃষ্টি। স্নেহধারা যেন চোখ ভরা !—টল্‌টল্‌ করছে ! . . .

এত দিন যেন বদ্ধ ঘরে হাঁফিয়ে প'ড়ে ছিলাম। তার নিশ্বাসে, যেন সে বাইরের একটু বাতাস ভ'রে নিয়ে এসেছিল। . . .

এত দুর্দ্দান্ত ব'লে যার এত অখ্যাতি শুনেছিলাম, আজ তাকে দেখে মনে হ'ল —সমুদ্রের একটা নীল ঢেউ যেন প্রাণ-ভরা বিক্ষোভ নিয়ে, একটি মানুষের দেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে ! . . .

দুটি হাত জোড় করে হাঁটুর ভিতরে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে সেই যে সে ব'সে রইল, আর একটি বার মাথা তুল্‌ল না। . . .

বাইরে এসে ভাব্‌লাম, এত কমণীয়, একেই লোকে এত দুর্জ্জয় ব'লে ভাবে ? . . . আমার মনে হ'ল ফুল হ'য়ে যেন আমি এত দিন পাতার আড়ালে ছিলাম। আজ যেন আমার বুকের আলো আকাশের দেখা পেলাম।—এ আমার—সেই !

চিনেছি ! . . . এই সে . . . এই আমার আকাশ—চিরজন্ম চেয়ে থাকার, আমার এই বিশ্বলোক ! . . .

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

ভাঙ্গাবাড়ী

কীর্ত্তিনাশা নদীর তীরে বিনাশপুরের জমিদার বংশে এক এক করিয়া সকলে মরিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর এক একখানা ইটও খসিতেছিল। ভাঙ্গাবাড়ীর শোচনীয় জীর্ণদশা দেখিবার জন্যও আর লোক রহিল না, তবু শুধু শম্ভু ও তাঁহার স্ত্রী কামিনী সেই প্রাচীন গৌরবের ভগ্নস্তূপ বুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল।

লোকে বলিত, 'ওদের বাড়ীর নীচে গর্ত্তে গর্ত্তে অনেক টাকাকড়ি লুকানো আছে, তার লোভেই ওরা ছাড়্‌তে পারে না।'

ভাঙ্গাবাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড আম, জাম, নারিকেল, সুপারী ও গাব গাছের জঙ্গল, তার মধ্যে ঢুকিবার পথ এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ডান ধারে পুকুরে জল শুখাইয়া কাদা আর পচা গন্ধে ভরিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন, বাঁধারে শতরাক ঘুরিয়া নদীর সাথে খাল মিশিয়াছে, সামনের রাস্তার দুইধারে ঝাউ ও নিমগাছের সারি অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

দালানের কাছাকাছি পুকুরের ধারে দুই বিশালকায় বট ও অশ্বথ গাছের ঘোর অন্ধকার একরাশ পাখীর বাসা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দালানে অনেকগুলি কোঠা, প্রায় সবগুলিই এখন ভাঙ্গা, রাশীকৃত ইট ও পাখীর ময়লা পরিষ্কার করিয়া তাহারই মধ্যে কোন ক্রমে দুইখানি কোঠা ঠিক করিয়া শম্ভু তাহার স্ত্রী, একটি ঝি আর গোমস্তা লইয়া বাসা বাঁধিল।

দালানের নীচে অনেকগুলি কোঠা ছিল, মাটির নীচের সে ঘরে এখন শিয়ালের বাসা, তাহারই পাশ দিয়া খাল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দালানের নীচে পর্য্যন্ত আসিয়াছে, বর্ষায় ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া ইট্‌ ভাঙ্গিয়া জলে পড়িত, আর শব্দ শুনিয়া লোকে ভয় পাইয়া বলাবলি করিত, 'পূর্ব্বপুরুষেরা টাকা গুনতে এসেছে।'

এই বংশে নাকি একদিন সাত কল্‌সী ভরা মোহর নীচের ঘরে শেকল

বাঁধা ছিল, একবার নাকি তাহারই তিনটি কলসী শিকল ছিঁড়িয়া খালে চলিয়া যায়. তাহার পর হইতে কেহ কোন দিন সেই খালে স্নান করিত না, গরু বাছুর জল খাইত না, সেই শিকলবাঁধা ক্রুদ্ধ তিন কলসী মোহর এখনো নাকি—তাদের জোড়া চার কলসীর আশায় খালের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে তাদের মুখে পড়িবে তাহার আর রক্ষা নাই, বর্ষায় মাঝে মাঝে শিকলের শব্দ শোনা যাইত,—ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্!

এই ভাঙ্গাবাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছোট্ট একটি ছেলে, নাম ভোলা। তাহাকে বুকে লইয়া কামিনী শ্মশান পুরীতে পড়িয়া রহিল। ঝাউ গাছের শোঁ শোঁ শব্দ ভূতের মত বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরের নীচে শেকল ডাকিয়া উঠে, পিছনের বন হইতে শিয়ালে তাহার প্রতিধ্বনি করে, রাত্রি বেলা ভয় খাইয়া ভোলা মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

কামিনী তাহার স্বামীকে বলিল,—ওগো শুনছ, এমন লক্ষীছাড়া বাড়ীতে আর একদিনও আমি থাক্‌বো না, খোকা যে ভয়ে মরে যাবে, চল আমরা আর কোথাও যেয়ে থাকি।

শম্ভু রাত্রিবেলা লণ্ঠন আর খন্তা হাতে করিয়া নীচের ঘরে টাকা খুঁজিতে যাইতেছিল, সে উত্তর দিল,—আগে টাকাকড়ি বের ক'রে আনি, তারপর যাবো।

কামিনী বলিল—তাকি হয়, প্রেতপুরুষদের ধন কি পাওয়া যায়? তাঁদের টাকাকড়ি তাঁরা দেখ্‌বেন; আমাদের তাতে কাজ নেই।

শম্ভু বলিল—পূর্ব্বপুরুষদের অর্থ নষ্ট করতে নেই, এই টাকা উদ্ধার ক'রে তাঁদের মুক্তি দিতে হবে।

শম্ভু মাটির নীচে সেই ভয়াবহ স্থানে যথারীতি চলিয়া গেল,—সে যে এই বংশেরই ছেলে তাহার আর ভয় কি?

শম্ভু সঙ্গে একটিও লোক লইত না, কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল, হঠাৎ কোন দিন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইবে এবং তাহারা গুপ্তধনের সন্ধান তাহাকে বলিয়া দিবে। তাহার সাপ কি ভূতের ভয় ছিল না, সে মনে করিত তাহার কিছু হইবে না।

একদিন দুপুরবেলা ঝির কোলে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভোলা বটগাছের নীচে গিয়াছিল, উপরে খচ্ খচ্ শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখে এক পেঁচা তার কটা কটা চোখ ও ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া ভেঙ্ চাইতেছে। খোকা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল, ঝি বলিল, ভোলাবাবু পেঁচা দেখে ভয় পেয়েছে।

শম্ভু ডাকিয়া খোকাকে কাছে বসাইয়া বলিল, তুই কি যে সে বংশের ছেলে, যে পেঁচা দেখে ভয় খাবি? এখানে কত লোক জন কত টাকা কড়ি কত গাড়ী ঘোড়া ছিল, সমস্ত বাড়ীখানা লোক জনে পুজা পার্ব্বণে গম্ গম্ কর্‌ত।

খোকা জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা তারা সব্ কোথায় গেল?

শম্ভু উত্তর দিল,—তারা কি গেছে যে তুই জিজ্ঞেস্ কচ্ছিস্ কোথায় গেল? তারা কেউ যায় নি, আমাদের এই বাড়ীর কোণে কোণে ঘরের নীচে গর্ত্তের মধ্যে কত লাখ্ লাখ্ টাকা আছে, তারা চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে রে, বুঝ্‌লি?

খোকা কথা শুনিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; মা ডাক দিয়া বলিল—ওগো, তুমি ও সব ছাই ভস্ম শিখিও না, খোকা ভয় পাবে। এমন সময় দম্‌কা বাতাসে হুড় মুড় করিয়া ও ঘরের গোটা কয়েক ইট্ পড়িয়া গেল, খোকা ভয় পাইয়া বলিল,—বাবা ওকি?

শম্ভু উত্তর করিল,—ও আমার কপাল। তার পরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। খোকা কাঁদিতে লাগিল,—মা, ওমা।

সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া খোকা বলিল, মা, ও কিসের শব্দ; মা বলিল,—ও চাম্‌চিকে। খোকা আবার বলিল,—মা, নীচে ঝম্ ঝম্ করিয়া কিসের শব্দ হয়? মা বলিল, 'তুই চুপ করে ঘুমো, গোল্‌মাল্ করিস্ না।

খোকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ভয়ে ভয়ে মাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল,—মা, মা, শুন্‌ছ, কার জানি পায়ের শব্দ, কে জানি এসেছে,—মা, ওমা, ওরা কারা?

কামিনী বাতি জালিয়া দিল, তাহা বাতাসে নিবিয়া গেল; কামিনী সমস্ত রাত খোকার উত্তপ্ত দেহ কোলে করিয়া জাগিয়া রহিল। পরদিন স্বামীকে বলিল, খোকার খুব জ্বর, গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

ক্রমেই জ্বর বাড়িতে বাড়িতে খোকা অজ্ঞান হইয়া গেল। দু'এক বার অজ্ঞানের ঘোরে বলিল,—ওরা কারা, ওরা কারা! মা ও বাবা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—খোকা,—খোকা, কিন্তু তাহার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

* * * * * *

শম্ভু শোক কাটাইয়া উঠিয়া আবার সেই ভাবেই চলিতে লাগিল; কামিনী কান্নাকাটি না করিলেও তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন হইল, সুন্দর মুখখানা দুঃখের তাপে পুড়িয়া কালো হইয়া গেল, গায়ে কপালে রেখার ফাঁকে ফাঁকে অসহনীয় বেদনা ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিত। কিন্তু যে বেদনা বাহির হইবার নয় তাহা ভিতরে রুদ্ধ থাকিয়া উষ্ণশ্বাসে জীবনটাকে শুষিয়া লইতে লাগিল।

গুপ্ত ধনের সন্ধান হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে এলোচুল শুষ্কমুখে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিল,—এত রাতে তুমি কোথায় যাও।

উত্তর না পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। পরদিন প্রাতে শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল, কামিনী বলিল—কই তাহার তো কিছু মনে নাই! সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কামিনী বলিল, দেখ, ভুলু আমায় মাঝে মাঝে ডাকতে আসে!

শম্ভু বলিল, সে কি হয়, ও তোমার ভুল, কিছু দিন পরে মনটা ঠাণ্ডা হইলেই ও সব চলে যাবে, অত ভেব না!

কামিনী কহিল, তুমি তো বিশ্বাস করবে না, ঐ যে, ঐ দেখ,—ঐ, ঐ, ঐ—কামিনী দূরে কাশবন দেখাইয়া দিল; রৌদ্রালোকিত কাশবন বাতাসে দুলিতেছিল।

শম্ভু বিরক্ত হইয়া কহিল, তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

কামিনী হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ; মাঝে মাঝে পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে, হুতুম ডাকিয়া উঠিতেছে, ইঁদুর ও চামচিকা ঘরের মধ্যে অতিশয় উপদ্রব করিতেছে।

কামিনী ঘুমাইতেছে দেখিয়া শম্ভু লণ্ঠন ও খন্তা লইয়া সেই নীচেকার অন্ধকূপে প্রবেশ করিল। তাহার পাশ দিয়া একটা সাপ চলিয়া গেল, একটা শিয়াল

থ্যাক্ থ্যাক্ করিয়া উঠিল, শম্ভু কোন দিকে কিছুমাত্র নজর না করিয়া এক জায়গায় ইট্ খুঁড়িতে আরম্ভ অরিয়া দিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ কামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, কি ভুলু কোথায় যাও? দাঁড়াও, দাঁড়াও,—আমিও আস্‌ছি। সঙ্গে সঙ্গে সে বাহির হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বটগাছে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার চীৎকারে গোমস্তা ও ঝি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া মাথায় মুখে জল দিল ঝি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—বাবু, শীগ্-গীর এসো, কোথায় গেলে গো,—

তখনো সেই নীচের ঘর হইতে ইট্ ভাঙ্গার শব্দ আসিতেছিল—ঠং, ঠং, ঠং,।

শ্রীঅতুলেন্দু সেনগুপ্ত।

. . . যেখানে দেখেছ খুব টাকা, অমনি ছলা কলা, ভাব ভঙ্গির টোপে সেই 'মাছ'টিকে গেঁথে তোল্‌বার চেষ্টা! . . . তার স্বভাব চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্ব দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ আছে কি না . . . তার শরীর রোগের আধার হ'লেও আপত্তি নেই . . . বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যাঙ্ক'এর 'চেক্'বইএ দস্তখৎ দেবার ক্ষমতা থাক্‌লেই হ'ল! . . .

—এই বিয়ের দাম দিচ্ছে নারী, তাদের হৃদয়ের পবিত্র কোমল বৃত্তিগুলি, তাদের আত্মমর্য্যাদা, তাদের শরীরের প্রত্যেকটি বিদ্রোহী রক্তবিন্দু . . .

"বিয়ের দাম"

বিড়ালের স্বর্গ

(Emile Zola)

নিঃসন্তান পিসিমা মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তাঁর অতি প্রিয় মিনি বিড়ালটিও আমার হাতে তুলে দিয়ে যান। আর মিনি যেন জীবনে কোন দিন কষ্ট না পায় সে বিষয়ে বিশেষ ক'রে আমায় অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য পিসিমা মরণকালে মিনির একটু মাথা রাখ্‌বার জায়গা হ'ল জেনে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরলোকে প্রস্থান কর্‌লেন। সেই থেকে মিনি আমার দিন রাতের অনেকখানি সময়ই অধিকার করে বস্‌ল।

সেদিন তখনো স্বামী আপিস থেকে ফেরেন নি। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়্‌ছিল। আমি মিনিকে নিয়ে প্রতিদিনকার মত বারান্দায় ব'সে খেলা করছিলুম। প্রকৃতির ওরূপ বিপর্য্যস্তরূপ দেখে আমাদের কারো মনের ভাবই বড় ভাল ছিল না। হঠাৎ মিনি কান খাড়া ক'রে কি যেন ভুলে যাওয়া কথা স্মরণে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ল। একটু পরেই সে আমায় একটা গল্প বল্‌তে সুরু কর্‌ল, সেটি এই :—

(ক)

আমার তখন সবে এক বছর বয়স। সাদাকালো লম্বা লম্বা লোমে আমায় নাকি বেশ সুন্দর শোভনই দেখাত। তোমার পিসিমা যে আমায় কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা জানিনে। তবে তখন আমার সে বয়সে শান্ত সুবোধ হ'য়ে চল্‌বার কথা নয় মোটেই, কিন্তু তা'হলেও তিনি যে আমায় কত আদর যত্ন কর্‌তেন তা আর বলে শেষ করা যায় না। এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। আমার বিছানাপত্র, আমার খাওয়া-দাওয়া —সব দিকেই বুড়ির বিশেষ নজর ছিল। দুধ মাছ আমার নিত্য বরাদ্দের মধ্যেই ছিল।

এত আদরে এত যত্নে থেকেও আমার মনে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা, একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল, যা সর্ব্বক্ষণ আমায় পেয়ে বসেছিল, সে হচ্ছে, একবার কোন প্রকারে জানালা দিয়ে পালিয়ে বাইরে ছাদের উপর বেড়িয়ে বেড়ানো। এত আদর যত্ন আমার ভাল লাগ্‌ত না, ঘুমোবার বিছানায় যেন মনে হ'ত সূঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে

আর আমার স্থূলদেহ আমায় ক্রমাগত পীড়া দিতে লাগ্‌ল। কিসে আমি সুখ পাব, কিসে আমার এতটুকু দুঃখ হবে না, সেই দিকেই ছিল বাড়ীর সকলকার পুরো নজর। সত্য বল্‌তে কি, ঘাড় বাড়িয়ে জানালা দিয়ে চাইলেই দেখ্‌তে পেতুম প্রতিবেশীদের বাড়ীর সুপ্রশস্ত ছাদ। সেদিন সেখানে চারটে বিড়ালে মিলে ঝগড়া হচ্ছিল, তাদের সকলকার রোম লেজ রাগে খাড়া হ'য়ে পড়েছিল, আর ফোঁস ফোঁসানি চলেছিল ক্রমাগত। এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। এ ব্যাপার থেকেই সেই দিকে আমার মনপ্রাণ একান্ত ঝুঁকে পড়্‌ল। আমার মনে হ'ল, সত্যিকার আনন্দ এক মাত্র ঐ ছাদেই পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাবার রাস্তা মোটেই সুগম নয়।

সে যাই হোক, পালাবার একটা ফন্দি আমার মাথায় এসে গেল। আদরে যত্নে মাছ দুধ খাওয়া ছাড়াও জীবনে অনেক কিছু কর্‌বার আছে। যা জানি নে, যে অভিজ্ঞতা হয় নি, তা জানাই হচ্ছে কর্ত্তব্য, সেটাই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। একদিন ঝি রান্নাঘরের জানালাটা বন্ধ কর্‌তে ভুলে গেল। আমি এই ফাঁকে জানালার নীচেই যে একটা ছাদ ছিল, তাতে লাফিয়ে পড়্‌লুম।

(খ)

আঃ! ছাদ কি চমৎকার খোলা! মেলা জায়গা। বৃষ্টির জল নীচে নেমে পড়্‌বার জন্য যে স্থানটায় নর্দ্দামা রয়েছে, সেস্থানটা অন্য স্থান অপেক্ষা অনেক ঢালু। তাই জল নিঃশেষে চলে গেলেও সেখানে জলের তলানী কতকগুলি ভিজে ধুলো জমে রয়েছে। তার উপর হাঁটাতেই যেন মনে হ'ল যে আমি মখ্‌মলের উপর দিয়ে হাঁট্‌ছি। এখানে সূর্য্যের আলো প'ড়ে চারদিক্‌টা একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুড়ে রেখেছে। খোলা জায়গায় এসে খোলা বাতাসে আমার প্রাণটা মাতোয়ারা হ'য়ে পড়্‌ল।

একটা অজ্ঞাত কারণে আমার প্রাণটা যে কাঁপে নি, একথা বল্‌লে মিথ্যে বলা হবে, তা সে সত্য আজ তোমার কাছে আমি গোপন করব না। আমার আনন্দের মধ্যেও একটা শঙ্কা ছিল। বিশেষ ক'রে একটা মনের ভাবের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে, কেননা তার ফলে আমি ছাদের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে ছিলুম। অপর একটা বাড়ীর ছাদ থেকে তিনটে বিড়াল আমায় দেখে ভীষণ ভাবে "আও-আও" শব্দ করতে কর্‌তে ছুটে এল! আরো তাদের

আকৃতি প্রকৃতি দেখে আমার মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম হ'ল, কিন্তু তারা আমায় নির্ব্বোধ মনে ক'রে বেশ সদয় ব্যবহারই করল এবং শুদ্ধ রসিকতার খাতিরেই ওরূপ মিউ মিউ শব্দ করেছে একথাও জানালো। তখন অবশ্য আমার মনে কোন ভয়ই আর রইল না। তাদের স্বভাবটা অনেকটা খোলা খোলা, তবে সকলকার চেহারাই দস্তুর মত কৃশ, তারা আমায় নিয়ে বেশ আমোদ করতে লাগ্‌ল। তাদের মধ্যে বুড়ো বিড়ালটী আমার সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিল। সে আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাইল। তৎক্ষণাৎ আমি তার শিষ্যত্ব স্বীকার করলুম।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

"পথে পথে অপেক্ষিছে
কাল বৈশাখীর রুদ্র নাদ
মৃত্যু তোরে দিবে হানা
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা
এই তোর
নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ।"

বসন্ত বিলাপ

'বসন্ত বহিয়া যায় ! জাগো জাগো জাগো
হেন ক্ষণে উদাসীন কভু থেকো না গো'
কে কাহারে দেয় উপদেশ ? হায় হায়
বুঝান কি যায় কভু মুখের কথায়
বসন্তের অনন্ত মাধুরী ?—সেই বুঝে,
যে শুধু অবুঝ হ'য়ে অন্যে মরে খুঁজে
খণ্ড ভাবে। ব্যর্থ তার বর্ণ গন্ধ গীত,
ব্যর্থ তার যত আয়োজন। মৃত্যু পীত
দিগ্বিদিক ছেয়ে দেয় ! গন্ধ অন্ধ হ'য়ে
না পেয়ে প্রবেশ প্রাণে যায় মিলাইয়ে
কোন্ শূন্যে ! গান আছে, প্রাণ যেথা নাই,
কান বল কে দিবে সেথায় ? শুধু চাই—
বুদ্ধি বিবেচনা তর্ক সব ভাসাইয়ে
দেশ কাল নিত্যানিত্য সব ভুলে গিয়ে
স্বপ্নের পিছনে ধাওয়া—আর কিছু নহে।
স্বপনের জাগরণ সমীরণ বহে,—
মনে হয় যেন কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস !
ডাকে পিক, যেন কার বেদনা উচ্ছ্বাস
সুরে উঠে বাজি আচম্বিতে ! ফোটে ফুল,
অজস্র আদর কার হইয়া আকুল
সহস্র রূপেতে উঠে ভাসি ! এইরূপে
হাসি অশ্রু নৈরাশ্য ও আশা চুপে চুপে
গেঁথে তোলে যৌবনের জ্যোতির্ম্ময় হার
দুঃখ সুখ ছায়া কায়া সব একাকার !

দীপঙ্কর

—— ——

কল্লোল

১৩৩০ | জ্যৈষ্ঠ | ২য় সংখ্যা

সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন্‌ হাসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফেটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক পাণির শূল আসে!

ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ হাস্‌লো আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাস অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোপের তূণ ধরি'
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটা-তাও-মুখ-ফোটেনা'-বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ আস্‌ল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগ্‌লা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!

ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান্‌ আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়ু-মরা বাম পাশে !
মন ছুটছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে !!

নজরুল ইসলাম ।

. . . যতেক বেদনা যার
এক সাথে গ'ড়ে অচল মুকুট গড়েছে মাথায় তাঁর ।
যত আশা হ'ল ছাই
সে সব তাঁহার অঙ্গ বিভূতি,—চির সন্ন্যাসী তাই ।
মানব মনের বিষ
তিল্ তিল ক'রে কণ্ঠে তাঁহার জমিছে অহর্নিশ ।

* * *

"বিশ্ব দরদী"

মন্দিরে

পুরাণো মন্দিরের নূতন পূজারী সে।

মন্দিরের ভিতরের হাজার বছরের জমানো অন্ধকার ও রুদ্ধবাতাস, পূজারীর বুকে যেন ভার হ'য়ে চেপে ধরত—তার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ত . . . সে দুবেলার পূজা-আরতি কোন রকমে সেরে, বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ত।

একদিন সন্ধ্যা-আরতির পর প্রদীপটি রাখ্‌তে গিয়ে তার চোখে পড়্‌ল একটি ছোট শ্বেত পাথরের কৌটার উপর! কৌতূহলী হয়ে খুলে দেখ্‌ল— একটুখানি ফুলের রেণুর মত কি পড়ে রয়েছে! . . .

কৌটার চারিদিক খুঁটিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে খানিকটা রেণু প'ড়ে গিয়ে মন্দিরের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে গেল! আর কেমন একটা মৃদু সৌরভে মন্দির ভ'রে উঠ্‌ল! . . .

পূজারী অন্যমনস্ক ভাবে বসে রইল, আজ আর তার বাইরে যাওয়া হ'ল না। কি মনে ক'রে প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে সেই নিবিড় অন্ধকারে চোখ বুঁজে সে প'ড়ে রইল।

কতক্ষণ কেটে গেছে জান্‌তে পারে নি! . . . আবার সেই অতি ক্ষীণ সৌরভটুকু তাকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌ল . . . তার সঙ্গে সঙ্গেই কার স্পর্শে পূজারীর দেহ কেঁপে উঠ্‌ল! ধীরে ধীরে তার কানের কাছে কে বল্‌ল—তুমি এখানে কেন? . . . এখন যে আমার পূজার সময় এসেছে!—

পূজারী সাহসে বুক বেঁধে জিগেস কর্‌ল—কে তুমি? এ আমার মন্দির, আমি ছাড়া কা'রও পূজার অধিকার নেই।

একটুখানি হাসির শব্দ রুদ্ধ বাতাসের বুক চিরে ঢেউ খেলে গেল . . . উত্তর এল— তোমার আগেও শত শত পূজারী অমন কথা বলেছে, তবু সবাইকেই ফাঁকি দিয়ে আমার পূজা চালিয়ে এসেছি,— আর আজ তুমি এলে বাধা দিতে!—

পূজারীর মুখে কথা যোগাল না . . . উঠে যেতেও সে পারল না . . . তার বিস্মিত চোখের সাম্‌নে আলো ফুটে উঠ্‌ল! সে দেখ্‌ল—একটি তম্বী তরুণী ভাঙ্গা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছে! . . .

এমন পূজা ত পূজারী কখনও দেখে নি! এ যেন সমগ্র দেহ মন দিয়ে পূজা! . . .

তরুণী তার চোখের জলে দেবতার পা ধুইয়ে তার একরাশ কালো চুল দিয়ে দেবতার পা মুছিয়ে দিল। শুকনো ফুলের একগাছি মালা দেবতার গলায় পরিয়ে শ্বেত পাথরের কৌটা খুলে একটু রেণু দেবতার পায়ের উপর রাখ্‌ল। তারপর হাত জোড় ক'রে ধ্যানে যে বস্‌ল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল . . . ভাঙ্গা প্রদীপ নিভে গেল . . . মন্দিরের অন্ধকার নিবিড়তর হ'য়ে উঠ্‌ল . . .

পূজারী তখনও বসে আছে। প্রশ্ন উঠ্‌ল—আমার পূজার পুষ্পরেণু তুমি ফেলে দিয়েছ? . . . কেন আমার কৌটায় হাত দিয়েছিলে?—

পূজারী উত্তর দিল না। সে আবার শুনল—তুমি দেখ্‌ছি অন্যদের মত নও . . . তোমায় ক্ষমা করলাম . . .

পূজারী এবার চেষ্টা ক'রে কথা বল্‌ল। জিগেস করল—তুমি কে?—"

আমি?—সে শুনে তোমার লাভ?—'

একটু দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল . . . তার পর উত্তর এল—আচ্ছা তোমায় বলি, শোন:—

এই মন্দির যখন তৈরী হয়, সেই প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আমি এখানকার দেবদাসী . . .

পূজারীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠ্‌ল। দেবদাসী বলতে লাগ্‌ল—প্রথমদিন থেকে আমি আমার দেবতাকে প্রাণ মন দিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলাম, আমার নৃত্যকলা সঙ্গীত-বিদ্যার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। ধনী মানী সবাই আমায় দেখ্‌তে আস্‌ত, কিন্তু কোন প্রশংসা আমায় গর্ব্বিত করত না—আমার মন ত সে দিকে ছিল না। আমি শুধু ভাব্‌তাম দেবতার তৃপ্তির কথা—'

—তারপর অনেক কথা। আমার মন রইল দেবতার চরণে, দেহটা গেল মানুষের অধিকারে . . . তার উত্তর কোথাও পেলাম না!—দেবতার কাছেও না . . .

—বুকফাটা কান্না তাঁর পায়ে ঢেলে উত্তরের অপেক্ষায় থাকতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝ্‌লাম পাষাণ দেবতা সত্যই পাষাণ . . . আমার ব্যথা তাঁর পাষাণ বুকে ব্যথা জাগাল না . . . তাঁর চাপা ঠোঁট দুটি খুলে আমার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর এল না! . . .

—তবু আমি পূজা ক'রেই চল্‌লাম। রোজই দেখ্‌তাম পূজারী নূতন ফুলে দেবতার পূজা করতেন। তিনি আমায় বলে ছিলেন—বাসিফুলে দেবতার পূজা হয় না—'

—আমি নিজের দিকে তাকিয়ে মনে করতাম, তবে আমাকে দিয়ে পূজা হয় কি করে? . . .

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে শেষ কথাটি বলে তরুণী থাম্‌ল।

পূজারীর মুখে কোন প্রশ্ন এল না! ধীরে ধীরে আবার সেই সহস্র বর্ষ আগেকার দেবদাসী কথা বল্‌তে লাগ্‌ল—

—একদিন কি খেয়াল গেল সারা বাগান ঘুরে যত ঝরা শুক্‌নো বাসি ফুল আঁচল ভ'রে নিয়ে এলাম। রোদের তাপে শুখিয়ে তারা মাটিতে ঝরে গেছে . . .

—ভ্রমর আর তাদের মধু লুটে নেয় না, বাতাস তাদের গন্ধ পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয় না, আলোর স্পর্শ তাদের বুকের মাঝখানটিতে পৌছে তাদের বিকশিত করে তুলছে না . . . সব রূপ-রস-গন্ধ বুকে লুকিয়ে তারা ম্লান হয়ে গেছে! . .

—এদের দিয়ে পূজা হয় না? পূজারীর মন্ত্র আওড়ানো পূজা না হ'তে পারে, কিন্তু আমি এদের দিয়েই দেবতার পূজা করব।

—পূজারীর অজ্ঞাতসারে পূজা করতে লাগ্‌লাম। একবার ভয়ে বুক কেঁপে উঠ্‌ল— দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন কি?—'

—হাত জোড় ক'রে মনে মনে বল্‌লাম দাসীর অপরাধ নিও না, আমায় যদি তোমার দাসী ক'রে থাক তবে আমারই মত বাসি ফুলে তোমার পূজা গ্রহণ কর . . .'

—আঁচল উজাড় ক'রে ফুল ঢেলে তাঁর পায়ের উপর মুখ গুঁজে প'ড়ে রইলাম। যখন মুখ তুলে চাইলাম, দেখ্‌লাম ফুলগুলি সব ফুটে উঠেছে! . . . . তাদের সৌরভে মন্দির পূর্ণ, আর আমার দেবতার চোখে বিমল প্রসন্ন দৃষ্টি! . . .

—আমার পূজা তিনি নিলেন . . . আমার পূজা তিনি সার্থক করলেন . . . তাঁর পায়ের ধূলার স্পর্শে বাসি ফুল—ধন্য হ'ল—সব দলগুলি তার মেলে উঠ্‌ল! . . .

* * * *

নিস্তব্ধ মন্দির। নবীন পূজারী তখনও স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে . . . মৃদু-কণ্ঠে দেবদাসী বল্‌ল—সকাল হ'য়ে যাবে এইবার আমার বিদায়ের সময় এসেছে—শেষ টুকুও ব'লে যাই—'

—এমনি ক'রে প্রতিদিন গোপনে আমার পূজা চল্‌ত। প্রতিদিনই দেখ্‌তাম দেবতার মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু . . তখন বার বার প্রণাম ক'রে বল্‌তাম—তুমি পাষাণ নও গো—নও, নইলে আমার ভাঙ্গা প্রদীপের আরতিতে আর শুক্‌নো ফুলের পূজোতে তোমার এত তৃপ্তি হয় কি ক'রে? আমার অভিমান ভেসে গেছে, আমায় ক্ষমা কর—'

—একদিন নৃত্য সভায় হঠাৎ মূর্চ্ছার পর পৃথিবীর আলোতে আর জাগ্‌লাম না . . . তবু আমার পূজা বন্ধ হয়নি। এই হাজার বছর আগেকার শুক্‌নো ফুলের রেণুতেই আজও আমার পূজা সমানে চল্‌ছে . . .

* * *

পাখীর গানে সচকিত হ'য়ে পূজারী দেখ্‌ল,—মন্দিরের খোলা দরজাটা দিয়ে একটু আলোর আভাস! মন্দিরের ভিতর ঠিক আগের সন্ধ্যার মত সবই সাজান রয়েছে, শ্বেত পাথরের কৌটাটী তেমনি এক কোণে প'ড়ে আছে কিন্তু শুক্‌নো ফুলের মালা ত দেবতার গলায় নেই! . . .

বাইরে এসে আলোর রাজ্যে পথ চল্‌তে চল্‌তে পূজারী গত রাত্রের কথা ভেবে অবাক হ'য়ে গেল। শেষে মনে হ'ল—বুঝিবা সব স্বপ্ন! . . .

শ্রীসুনীতি দেবী

. . . গাড়ীতে ওঠ্‌বার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে? দণ্ড পল মুহূর্ত্ত অহরহ পা ফেলবে না এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়?

"একটি চাউনি"

বেনামী জিনিষ

উকীল সারদাকুমার একদিন সকালে তাঁর বৈঠকখানায় বসে আছেন এমন সময় তাঁর শিশুপুত্র দৌড়ে এসে একখানা ডাকের চিঠি তাঁর হাতে দিল। সারদাকুমার মোকদ্দমার নথিপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। আশে পাশে ফিতে-বাঁধা কাগজ-পত্র ছড়ান। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের উপর সামান্য একটু খালি জায়গা প'ড়ে নাই। টেবিলটির উপর না আছে এমন জিনিষ নাই। বড় বড় বই কখানা একটীর উপর আরেকটী মাথা গুঁজে প'ড়ে আছে—একটা পানের ডিবে, তাতে খানিকটা শুক্‌ন চুণ, পানের বোঁটা, ছুটা লবঙ্গ, সুপারির টুকুরা প'ড়ে আছে।—ক'দিনের পুরাণ খবরের কাগজ, দেশ্‌লাই কাঠি, পোড়া চুরুট্‌, অভ্রের নমুনা, একখানি পাঁজি, ছ একটা কোম্পানির ক্যাটলগ্‌, বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ—সেই টেবিলের উপর ছড়ান।

সারদাকুমার যে কাগজটা দেখ্‌ছিলেন তা' বন্ধ ক'রে রেখে ডাকের চিঠিখানা খুলে পড়্‌লেন। সম্মুখের চেয়ারে অন্য একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সারদাকুমার বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।

সারদাকুমারের স্ত্রী রমা তখন একটা জানালার ধারে বঁটি পেতে তরকারী কুট্‌ছিল। শীতের প্রভাত। জানালার নীচের দিক্‌টা কাঠের খড়খড়ি দিয়ে বন্ধ। সেই রৌদ্রহীন ঠাণ্ডা জায়গাটীতে তরকারীর চুব্‌ড়ি ধামা প্রভৃতি রাখা থাক্‌ত। জানালার উপরদিক্ দিয়ে সকাল বেলাকার রোদখানি ঘরে এসে পড়্‌ত। রমা সেই রোদটুকুর দিকে পিঠ্‌ ক'রে রোজই সকালবেলা ঐ খানটীতে বসে কুট্‌নো কুটে দিত।

সারদাকুমার চিঠির খামখানা আর একখানা লাল কাগজ রমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—দেখ, এলাহাবাদ থেকে কি যেন জিনিষ এসেছে। খাওয়া দাওয়ার পর করালীকে রসিদখানা দিয়ে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিও—বাক্সটা নিয়ে আসবে—প'ড়ে থাক্‌লে আবার ভাড়া গুণতে হবে।

রমা একবার কাগজখানা প'ড়ে দেখে বল্‌লে—কে পাঠিয়েছে তা ত বুঝ্‌তে পারলাম না। যে ক'রে নামটা লিখেছে! স্কুলের মাষ্টারের কাছথেকে শাস্তি পাবার মত যদি খারাপ লেখার জন্য আমাদের কাছেও কোনও লাঞ্ছনা পাবার ভয় থাকৃত তাহ'লে হয়ত কেরাণীবাবুরা লেখা গুলোকে লেখার মত ক'রে লিখ্‌ত। এমন রাগ ধরছে!

সারদাকুমার বল্‌লেন—যে—ই পাঠাক্ চেনা লোকে পাঠিয়েছে এটা নিশ্চয়; আর তা ছাড়া আমাদের ত কিছু ভাড়া দিয়ে আন্‌তে হচ্চে না। হয়ত এর পরেই চিঠি এসে পৌছবে।

রমার মন তাতে সায় দিল না। কেন যেন অস্থির হ'য়ে পড়্‌ল। এঘর ওঘর ক'রে খাটের উপর ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এলাহাবাদে কে যে চেনা লোক আছে কিছুতেই মনে পড়্‌ল না।

সারদাকুমার আদালতে চলে গেলেই করালীচরণকে তাড়া দিয়ে খাইয়ে রমা তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিল।

তখন পাড়া নিঝুম হ'য়ে গিয়েছে। আশে পাশের বাড়ী থেকে এক আধবার বাসন মাজার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রমার শোবার ঘরের জান্‌লা দিয়ে যেটুকু নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে কোন বিচিত্রতা নাই—একটা পাখীও ঐ নীল আকাশ টুকুতে নড়া চড়া করছে না। নিস্তব্ধ নিবিড় নীল! শিশুপুত্রকে ঘুমপাড়িয়ে পাশেই একখানা আরামচেয়ারে গিয়ে রমা বসল। পিঠে যেন হঠাৎ ভয়ানক ব্যথা মনে হোল। পিঠের কাছে হাত দিতেই তার মনে পড়্‌ল—একদিন এম্‌নি ধারা পিঠের ব্যথার কথা বল্‌তে গিয়ে সে একজনের মনে কত ব্যথা দিয়েছিল। তার বিয়ে হওয়ার পরও সনৎকুমার তাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আস্‌ত। সনৎ ঝড়ের মত আস্‌ত—কখনও খুব গল্প করত, কখনও বা চুপ্ ক'রে বসে থাকৃত—আবার হঠাৎ উঠে চলে যেত। একদিন রমা এই চেয়ারে বসে হঠাৎ বলে উঠেছিল—পিঠ্‌টা ভয়ানক ব্যথা করছে। সনৎ কেবল একটু হেসে বলেছিল—একটু শুয়ে থাক্‌লেই সেরে যাবে।

রমা সে কথায় অভিমান ক'রেই বলেছিল—ভারী ত বল্‌লেন—সেরে ত যাবেই—এ যেন আমি জানি না!

সনৎ—সে কথায় খুব মিষ্টি ক'রে উত্তর দিয়েছিল—তা ছাড়া আর কি করতে পারি রমা ?

রমার আজ মনে পড়্‌ল সনতের সেই একটুখানি কথার আড়ালে কতখানি স্নেহ, কতখানি সহানুভূতি, কতখানি ব্যথা দেখা দিতে না পেরে কেঁদে মরেছিল। তারপরও কিছুদিন সনতের সঙ্গে দেখা শোনা হয়েছে—তারপর যে সনৎ পৃথিবীর কোন্ কোণে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, রমা তা' জান্‌ত না। চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সেলাই কর্‌তে কর্‌তে কত কথাই ভেবে গেল। বেলা প'ড়ে এল—হঠাৎ বাইরে একটু গোল শুন্‌তে পেল। রমা উঠে গিয়ে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ল নীচের ঘরের বারান্দার সাম্‌নে একটা কাঠের বাক্স পড়ে আছে। আর ভৃত্য করালীচরণ যে মুটেটা বাক্সটা মাথায় ক'রে এনেছিল তাকে খুব বক্‌ছে। রমা করালীকে উপর থেকে ডেকে বল্‌ল—ওকে আর এখন বকে কি হবে—ও ত আর জেনে শুনে বাক্সটা ফেলে দেয়নি। কিছু যদি ভেঙ্গেই গিয়ে থাকে ওকে বক্‌লেত আর তা' জোড়া লাগ্‌বেনা। ও ক পয়সা মিটিয়ে দাও।

করালী একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও পয়সা দিয়ে মুটেটাকে বিদায় ক'রে বাক্সটী কাঁধে ক'রে উপরের ঘরে নিয়ে এল।

রমা একবার করালীকে বাক্সটী খুল্‌তে বলে আবার বল্‌ল—থাক্ এখন তুমি অনেকটা হেঁটে এসেছ বাবু এলেই খুলো।

সারদা কুমার সেদিন অনেক রাত ক'রে বাড়ী এলেন। কাজে কর্ম্মে দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। সে রাত্রের মত আর বাক্স খোলা হোল না। বাক্সটী ঘরে আসা অবধি রমার মন যেন আরও কেমন হ'য়ে গেল। প্রথম রাত্রে রমা একটু ঘুমিয়েছিল তার পর ঘুম ভেঙ্গে সেই যে জেগে ব'সে রইল আর অনেক চেষ্টা ক'রেও ঘুমুতে পার্‌ল না। এ জাগরণ যেন কারুর পাওনা ছিল। সে যেন আজ সেটুকু রমার কাছে দাবী ক'রে বসেছে।

সকাল বেলা উঠে চা খেতে খেতে সারদাকুমার করালীকে দিয়ে বাক্সটা খোলালেন। ডালা খুলে একটা খবরের কাগজে মোড়া একখানা শাল বেরুল। বহুদিনের পুরোণ কাজ করা—ব্যবহার ক'রে প্রায় জীর্ণ হ'য়ে এসেছে—তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাঁজ ক'রে কাগজে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। তার নীচে ছেঁড়া

কতগুলি খাতা, বিস্তর কাগজ পত্র, ক'খানা বই, একজোড়া সবুজ রঙ্গের রেশমী মোজা, একখানা সাদারেশমের রুমাল, ধলে বাঁধা কতগুলি টাকা নোট্, একটা কৌটতে একটা সোণার আংটি, একটী সোণার গিনি, একজোড়া হাতের বোতাম, আর কতগুলি তারিখ লেখা একটুক্‌রো কাগজ !

সারদা কুমার জিনিস পত্র গুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লেন—এ ত বড় প্রহেলিকা ! কে পাঠালে বাপু, নাম ধাম চিঠি পত্র নাই ! কার বিপদ কার ঘাড়ে এসে জুট্‌ল।

বল্‌তে বল্‌তে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লেন—বৃথাই বকে যাচ্ছেন—রমা সেখানে নাই।

খাতা পত্রের বিরাট স্তূপ থেকে একখানা খাতা হাতে ক'রে অন্য ঘরে এসে দেখ্‌লেন রমা বসে তরকারী কুট্‌চে।

হাস্‌তে হাস্‌তে সারদাকুমার বল্‌লেন—আচ্ছা রমা একি কাণ্ড বল ত ? কে পাঠাল, কার জিনিষ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

রমা মাথা তুল্‌ল না। আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই উত্তর কর্‌ল—কে পাঠিয়েছে তা বল্‌তে পারি না—তবে কার জিনিস তা' জানি। এক আধখানা খাতা উল্টে পাল্টে দেখ্‌লেই হয়ত তাঁর নাম দেখ্‌তে পাবে।

সারদা খাতাটীর প্রথম পাতা উল্টে দেখ্‌তেই বলে উঠ্‌লেন—এ ত সনৎ বাবুর নাম রয়েছে দেখ্‌ছি। সব জিনিসই কি তবে তার ?

রমা জলের বাটী থেকে ছাড়ান আলুর টুকরোগুলো ছেঁকে তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌ল—হাঁ সব জিনিসই তাঁর মনে হচ্চে। মনে হচ্চে কেন—আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি তাঁরই।

সারদাকুমার হঠাৎ একটু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। একটু চিন্তা ক'রে বিরক্তির স্বরে বল্‌লেন—এ কবিত্বের মানে কি ? তোমার নামে এসব ছাই ভস্ম পাঠান কেন ? দেখা হ'লে ছুটো কথা বল্‌তাম তাঁকে।

রমা এবার মুখ তুলে চাইল। চোখ ছুটো তার লাল হ'য়ে উঠেছে—সারদা কুমারের মুখের দিকে কাতরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌ল—তাঁর সঙ্গেত তোমারও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। হয়ত কারুকে আমাদের নাম ঠিকানা বলে

রেখেছিলেন তিনিই খুব সম্ভব পাঠিয়ে দিয়েছেন। যার জিনিষ তাঁর উপর আর রাগ ক'রো না। তিনি হয়ত এতদিনে সকল গ্লানির অতীত!

সারদাকুমার স্ত্রীর কথাগুলি শুনতে শুনতে একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন। কথা শেষ হ'তেই বল্লেন—তাইত, এগুলো না হয় সনৎ বাবুর ভাইয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই।

রমা দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। স্বামীর মুখের একেবারে কাছাকাছি এসে বল্‌ল—না তা ক'রো না।

সারদাকুমার জিজ্ঞেস করলেন—তবে এ গুলো নিয়ে কি করব?

রমা ধীরে ধীরে বল্‌ল—ওঁর সবাই থাক্‌তেও এ জিনিসগুলি আমাদের কাছে এসেছে। আমরা পারি তাঁর অসমাপ্ত জীবনের চিহ্নগুলি সার্থক করে তুলব। ভাল না লাগে একদিন পুড়িয়ে দিলেই হবে সব।

সারদাকুমার রমার হাতখানি ধরে বল্লেন—রমা তুমিই ঐ মানুষটাকে বুঝেছিলে—আর তা বুঝি সে জান্‌ত।

রমা সারদা কুমারের হাত থেকে নিজের হাতখানি খুলে নিয়ে পাশের আসনে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌ল—তা হবে।

. . . সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

"বিদ্যাপতি"

নারীর মন

চৈত্রের খর-রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরের পাশ দিয়া শীর্ণ সিঙ্গারণ নদীর স্বচ্ছ জলটুকু ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দুই পার্শ্বে পুষ্পিত পলাশবনের মাঝে, দু'একটা কয়লা-কুঠির 'পাল্লা' মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘন পত্র-পল্লবে ঢাকা অসংখ্য রক্ত-রাঙা ফুলের আড়ালে কয়েকটা কোকিল ক্রমাগত ডাকিতে সুরু করিয়াছিল। এই রৌদ্র-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া, সাঁওতাল যুবতী ভুলি, কোকিল-ডাকা প্রান্তরের উপর চলিতে চলিতে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। তাহার সুস্থ সবল দেহে যৌবনের উন্মাদনা, পরণে একখানা চওড়া পেড়ে' তাঁতের মোটা সাড়ি, মাথায় দোলন-খোঁপার মাঝে মাঝে রক্ত-পলাশ।

মাথার উপর রুদ্র অভিশাপে চারিদিকের গাছপালাগুলা ঝলসিয়া পুড়িতেছিল, পায়ের নীচে ধরিত্রীর তপ্ত বুকের উপর পথিক চলাচলের সরু পথটুকু তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ভুলি উঠিয়া দাঁড়াইল। অদূরে কয়েকটা কাটা ধানের ক্ষেতের পারে, খাওড়া, তাল ও মহুয়া গাছের ফাঁকে বাবুদের গাঁয়ে বাসন্তী-মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন রকমে তাহাকে সেইস্থানে পৌঁছিতে হইবে। গত তিন চার দিন ধরিয়া সেখানে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে নাচ, গান, যাত্রা, কবি ইত্যাদি হইতেছে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও সে যাইতে পারিতেছিল না। আজ যদি টুর্‌ণীকে তাহার স্বামীর সহিত বসিয়া সেখানে 'কবি' শুনিতে দেখে, তাহা হইলে সে দু'য়ের মধ্যে একজনকে খুন করিয়া আসিবে। হোক্ না টুর্‌ণী তাহার এক মায়ের পেটের বোন্, তাহা হইলেও আর সে তাহার অন্যায় স্পর্দ্ধা এবং ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। তাহার স্বামী পীরু মাঝির সহিত যেখানে-সেখানে আসা-যাওয়া, মেলা-মেশা এবং ভালবাসার ভিতর দিয়া টুর্‌ণীর নামে লোকমুখে যে কুৎসাটা দিন দিন রটিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। অবিবাহিতা টুর্‌ণীর নামে এ নিন্দাবাদ রটানোর জন্য লোককেও তো দোষ দেওয়া যায় না! কারণ, বাসন্তীপূজার প্রথম দিন হইতে সেই যে টুর্‌ণীকে লইয়া পীরু তাহাদের ধাওড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—আজ পর্য্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। তাহারা ফিরিয়া আসবে ভাবিয়া ভুলি, তাহাদের

জন্য ভাত পর্য্যন্ত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু অবশেষে লোক অভাবে সে ভাত কুকুরকে খাওয়াইতে হইয়াছে।

রাগের ঝোঁকে নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে ভুলি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিল। পথের দুই পাশে টিনের চালা বাঁধিয়া কয়েকটা খাবারের দোকান বসিয়াছে, মাথার উপর কাপড়ের পর্দ্দা টাঙাইয়া কোথাও বা 'বাজি' খেলা সুরু হইয়াছে, কাচের চুড়ি বিক্রেতাদের দোকান ঘিরিয়া মেয়েদের ভিড় জমিয়াছিল, পান, বিড়ি ও সরবতের দোকানগুলা লোকে লোকারণ্য! বাসন্তী-মন্দির সংলগ্ন সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে যাত্রাগান চলিতেছিল,—সেখানেও অসংখ্য নরনারী! এই বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্য হইতে ভুলি কেমন করিয়া পীরু ও টুরণীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিল, তাহাদেরই কুলি-ধাওড়ার একটা সাঁওতালের মেয়ে স্বামীর হাত ধরিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া আছে;—মেয়েটার হাতে লাল কাগজের একটা 'ফির্‌কিরি' বাতাসের জোরে অগ্নি শিখার মত ঘুরিতেছিল। তাহার নিকট গেলে হয়ত টুরণীর খবর পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, ভুলি লোকের ভিড় সরাইয়া প্রাণের উদ্বেগে সেইদিকে চলিতে লাগিল।

চারিদিকের হট্টগোলে যাত্রাগানের একটি মাত্রাও কেহ বুঝিতেছিল কি না সন্দেহ। বাবুদের কয়েকটা ছেলে, চাপ্‌রাশী লইয়া কোলাহল থামাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় ভুলিকে এইরূপ ভাবে লোক সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, চশ্‌মা-পরা একটা ছোক্‌রার উদ্যত বেতখানা ভুলির পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভুলি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, ছোক্‌রা বলিতেছে,—ব'স্ ওইখানে, এগিয়েছিস্ কি, মারের চোটে পিঠের চাম্‌ড়া তুলে' দিব।

রাগে ও অভিমানে ভুলির চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল। ছল-ছল চোখে বাবুটির মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। বাবুদের ছেলে,—বলিবার কিছুই নাই! নহিলে হয়ত' তাহার কাঁকনের একটি আঘাতে তাহার মত পাঁচটা যোয়ান্‌কে ভুলি একসঙ্গে ঘায়েল করিয়া দিতে পারে!

যাত্রার লোকগুলা জম্‌কালো পোষাক পরিয়া আসা-যাওয়া করিতেছিল। জলভরা চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে ভুলি তাহাদিগকে বেশ ভাল করিয়া দেখিতে

পাইতেছিল না, অধিকন্তু তাহাদের বক্তৃতার ভাষাটা তাহার নিকট হেঁয়ালির ছন্দের মত বোধ হইতেছিল। ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়া ভুলি সেখান হইতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, এক আলুলায়িতকেশা রমণী বক্তৃতা করিতে করিতে ছুটিয়া আসরের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার বাম হস্তে উদ্যত তরবারি। ভুলি ভাবিল, সে যদি আজ এম্‌নি একটা ধারালো তলোয়ার হাতে পাইত, তাহা হইলে গায়ের জোরে দুনিয়ার সমস্ত বাধা বিপত্তি এড়াইয়া তাহার প্রিয়তম পীরুকে জয় করিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিতে পারিত। ভুলি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেখান হইতে অতি সন্তর্পণে উঠিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রৌদ্রে পথ চলিয়া পিপাসায় তাহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া গিয়াছিল। একটা সরবতের দোকানে গিয়া বলিল, এই! দে এক পয়সার।

সরবৎ বিক্রেতা মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল,—যা—যাঃ, এক পয়সার সরবৎ মিলে না।

—তবে কৎকে দিবি ?

—চার পয়সা।

'তাই দে' বলিয়া অঞ্চলের প্রান্ত হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া ভুলি তাহার হাতে দিল।

বরফ দেওয়া সরবৎ মুখে দিতেই ভুলির সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল; বলিল,—বাঃ ই যে বড় কালা!

ভুলি সরবতের গ্লাসটা ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আসা-যাওয়ার সরু পথের পানে এক একবার কটাক্ষ হানিয়া দেখিয়া লইতেছিল, যদি টুরণী ও পীরুকে হঠাৎ দেখিতে পাওয়া যায়!

সে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—হাঁ হে, কবি কোথা হচ্ছে ?

লোকটা বলিল,—ইস্কুলের মাঠে।

ভুলি সেই দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশ জুড়িয়া একটা কালো মেঘ উঠিয়াছিল। ঝড়ের বেগে পথের ধুলা উড়িয়া পথযাত্রী লোকগুলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে কোন রকমে চোখে কাপড় ঢাকা দিয়া কিয়দ্দূর

আসিতেই ঝড়ের বেগ থামিল। উত্তর দিকের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক্ মারিতেছিল। পশ্চিম আকাশের খানিকটা জুড়িয়া অস্ত রবির রক্ত আভাস আগুন খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। তালগাছের ফাঁক দিয়া বিদায় রবির রক্তিম ছটা সুমুখে বাঁশ গাছের পাতায় পাতায় ঝক্‌ মিক্ করিতেছিল।

চুলির আওয়াজ কানে যাইতেই ভুলি বুঝিল, ইস্কুলের মাঠ সেখান হইতে বেশী দূর নয়। যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ভুলি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, কবির তর্জ্জা আরম্ভ হইয়াছে এবং সাঁওতাল ও বাউরী শ্রোতাগণ মনযোগ দিয়া শুনিতেছে।

কিঞ্চিৎ আশা হইল। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, পীরু ও টুর্‌ণী পাশাপাশি বসিয়া একমনে গল্প করিতেছে। ভুলি তাহাদের নিকট অগ্রসর হইল। তাহাদের কাছে গিয়া ডাকিল, টুর্‌ণী শোন্, উঠে আয়।

টুর্‌ণী উঠিয়া আসিল। পীরু ভুলিকে দেখিতে পাইয়াও কোন কথা বলিল না,—যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপ ভাবে 'কবি' শুনিতে লাগিল।

টুর্‌ণীকে লোকজনের গোলমাল হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, ভুলি সজোরে ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড়্ বসাইয়া দিয়া বলিল,—লজ্জা লাগে না টুর্‌ণী! তোর দায়ে আমার যে মুখ পুড়ে' গেল।

চড়্ খাইয়া টুর্‌ণী রাগিয়া উঠিল, বলিল,—বেশ কর্‌ব তুর কি?

ভুলি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—বেশ কর্‌বি? কর্‌লেই হলো আর কি! . . . আয় তুই ঘরকে আয়, তোকে খুন্ কর্‌ব আমি।—বলিয়া তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গেল।

টুর্‌ণী চীৎকার করিয়া উঠিল, পীরু! পীরু! . . .

পীরুর নজর ছিল তাহাদেরই দিকে। টুর্‌ণী ডাকিতে না ডাকিতে, পীরু হাজির হইল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পীরু ভুলির চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে টানিয়া পিঠের উপর লাথি মারিতে আরম্ভ করিল।

ভুলি ধীরে ধীরে টুর্‌ণীর হাত ছাড়িয়া দিয়া পীরুর নিকট সরিয়া আসিয়া বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিল,—লে, কত মার্‌তে পারিস্ মার্ থাল্‌ভরা। . . . মেরে মরাঁই দে কেনে, খালাস্ পাই তাহেলে।

বাবুদের একজন চাপ্‌রাশী শান্তিরক্ষার জন্য দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল।

টুর্ণীকে লইয়া পীরু পুনরায় গান শুনিতে বসিল। ভুলি আর একবার সজল চক্ষে তাহাদের পানে তাকাইয়া বেদনার্ত্ত প্রাণে বাড়ী ফিরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে উৎসবের কলরোল তাহার কানে প্রেত-পিশাচের আর্ত্ত চীৎকারের মতই বাজিতে লাগিল। . . .

যে কাজ করিবার জন্য ভুলি, রৌদ্র-ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া ক্রোশখানেক পথ হাঁটিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, সে কাজ ত হইলই না, অধিকন্তু রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে সে ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল। ধাওড়ার প্রায় সকলেই নাচ-গান শুনিতে গিয়াছে, মাত্র দু'চার জন পুরুষ ও রমণী রাত্রে যাইবে বলিয়া তখন হইতে উদ্যোগ করিতেছিল।

স্বামীর নিকট যে এরূপভাবে নির্য্যাতিত হইয়া আসিতে হইবে, এ কথা ভুলি মনে করিতে পারে নাই। টুর্ণী যদি না কাছে থাকিত, তাহা হইলেও বা এ নির্য্যাতন অক্লেশে সহ্য করিতে পারিত,কিন্তু এতগুলা লোকের সাক্ষাতে অপমান— ছি, ছি, এ যে অসহ্য!

ভুলি যে ঘরটায় থাকিত, তাহারই খান পাঁচ ছয় ঘর পার হইয়া একটা ঘরে ভোলা মাঝি বাস করিত। ভোলার সহিত ভুলির প্রথমে বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, পরে কি একটা কারণ বশতঃ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেছে এবং মাস দুই পরে ভুলি স্বেচ্ছায় পীরুকে বিবাহ করিয়াছিল। আজও ভোলা তাহার কথার গোলাম। ভুলি মুখের একটি কথা খসাইলে ভোলা সবই করিতে পারে।

সেদিন আর ভুলির রাঁধিবার ইচ্ছা ছিল না, ঘরে বসিয়া থাকিতেও পারিল না। ধীরে ধীরে ভোলার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ভোলার ঘরে অন্য কেহই ছিল না। সে তখন মদ খাইয়া 'কবি' শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

ভুলিকে দেখিয়া, লাঠিখানা ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া ভোলা বলিল,— ভুলি যে! আজ কি মনে ক'রে? . . .

ভুলি বলিল,—কেনে, আস্‌তে নাই নাকি ভোলা? . . .

ভোলা কহিল,—বোস্ তবে। তুই বাসন্তী পূজো দেখ্‌তে যাবি নাই?

—না। আচ্ছা ভোলা, তুই বিয়া কর্‌বি নাই? নিজে রেঁধে খেছিস যে! . . .

ভুলির এই একটি কথাতেই এক নিমেষের মধ্যে ভোলার প্রাণে গতদিনের

অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল, বলিল,—না, আজ আবার সে কথা কেনে ভুলি? . . .

ভুলি বলিল, আমি 'শাঙা' কর্‌ব তোকে, তুই যদি আমার একটি কাজ করিস্।

ভোলা তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ বল্ দেখি?

বাহিরে জ্যোৎস্নালোকিত উঠানটার পানে ভুলি তাকাইয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—পীরুকে তুই গায়ের জোরে হারাতে পারিস্ ভোলা?

ভোলা নিজের স্ফীত মাংসপেশীগুলার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—তা পারি হয় ত।

—তবে এই কথা রইল তোর সঙ্গে, কাল যদি লড়াইএ জিত্‌তে পারিস্ তাহ'লে আমি তুর্‌ই।

ভোলা খুসী হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বাঁশের লাঠিখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—আমি তবে চল্‌লম ভুলি।

ভুলিও তাহার পশ্চাৎ উঠিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়িতেই ভোলা পিছন্ ফিরিয়া বলিল, টুর্‌ণী পীরুকে 'শাঙা' কর্‌বেক নাকি?

কথাটা গুরুতর না হইলেও, ভুলি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া বলিল,—কে জানে তা!

ভুলি ঘরে ফিরিতেছিল, দেখিল বৌয়ান ঝোঁপের পাশ দিয়া যে রাস্তাটা পাঁচ নম্বর খাদে গিয়া, পৌঁছিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া হাড়িদের কয়েকটা মেয়ে বড় বড় ব্যাটিতে ভাত বাঁধিয়া খাদে চলিয়াছে আর সকলে মিলিয়া একতানে গান ধরিয়াছে—

—কেসো ফুলে বন করেছে আলা লো,
কেসো ফুলে বন করেছে আলা—!
ও ছুঁড়িরা! ঝড়িয়ে দে গা, সকল যাবে জালা লো,
সকল যাবে জালা!—

ভুলি তাহাদের পশ্চাৎ ধরিল। ভাবিল রাত্রে খাদে কাজ করিলেও কিছু রোজগার করিতে পারিবে।

খাদের নিকট যাইতে খাদ-সরকার বলিল, কি কর্‌বি ?—

—গাড়ী বোঝাই দিব।

সেদিন মধ্যাহ্নে সত্য সত্যই ভোলা ও পীরুর শক্তি পরীক্ষা হইয়া গেল। পাঁচ নম্বর খাদের সুমুখে ট্রাম-লাইনের ধারে, পীরু খাদ হইতে ফিরিতেছিল, ভোলা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—ইস্‌ বড় যে জোর হইছে তোর্‌।

পীরুর মনটা বেশ ভাল ছিল না, বলিল, কই আমিত ঠেলি নাই।

ভোলা তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া ডান্‌ হাতখানা সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—আয়, পাঞ্জা লড়্‌বি ?

পীরু সজোরে একটা ধাক্কা মারিতেই ভোলা মাটিতে পড়িয়া গেল। পীরু তাহার পিঠের উপর একটা লাথি বসাইয়া দিল।

ভোলা উন্মত্তের মত উঠিয়া পীরুর গলাটা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে বসাইয়া দিল এবং পিঠের উপর এমন এক ঘুঁসি বসাইয়া দিল যে, আঘাতটা সাম্‌লাইতে তাহার একটু সময় লাগিল।

পীরু সিংহবিক্রমে ভোলাকে আক্রমণ করিল।

দূরে একটা অশ্বত্থগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ভুলি সমস্তই দেখিতেছিল। ভুলি জানিত, ভোলা হয় ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে, তথাপি তাহার এ আগ্রহ কেন হইল কে জানে ? পীরুর স্ফীত বক্ষ এবং সুগোল শরীর রা গ আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভুলির মনে আনন্দ হইতেছিল। আজ যদি তাহার স্বামীর সহিত ভুলির মনের সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলে সে হয় ত তাহার বিজেতা স্বামীর গলা জড়াইয়া সহস্র চুম্বনে তাহাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইত।

ভোলা টলিতে টলিতে ট্রাম লাইনের পাশে গড়াইয়া গেল। পীরু তাহার ঘাড়টা ধরিয়া লাইনের উপর সজোরে ঠুকিয়া দিতেই কপালের খানিকটা অংশ কাটিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া আসিল।

পীরু আপন মনে রাস্তা ধরিল। পাছে দেখিতে পায় ভাবিয়া, ভুলি একটু পাশ ফিরিয়া আড়ালে দাঁড়াইল।

একটা সাঁওতালদের মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া ভুলিকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই। ঠুরণী কোথা জানিস্‌ ?

ভুলি জানিত না, বলিল,—কেনে ?

মেয়েটা বলিল,—আড়্কাঠি * তাকে খুজে বেড়াছে। সে নাকি আসামে কাজ করতে যাবেক্।

সংবাদটা শুনিবামাত্র ভুলির মাথাটা ঘুরিয়া গেল। কয়লা কুঠি ছাড়িয়া টুর্‌ণী আসামের চা বাগানে কাজ করিতে যাইবে! সে তো জানে, সেখানে গেলে আর কেহ ফিরিয়া আসে না! ভুলি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—আড়্কাঠি কোথা ?

—ওই যে। বলিয়া মেয়েটা একটা লোকের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

এমন সময় পরাজিত ভোলা রক্তাক্ত দেহে ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে ভুলির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলি কোন কথা না বলিয়া একমনে কি ভাবিতেছিল। ভোলা বলিল,—আমি হেরে গেলাম ভুলি।

ভুলি তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল,—ভাব্না কি ভোলা ? . . . তুই এক কাজ কর্। টুর্‌ণী এলে তাকে ধরে রাখিস্, কোথাও যেতে দিস্ না। দেখিস্! আমি চট্ ক'রে শুঁড়িখানা থেকে আসি।

ভোলা বলিল,—কোথা টুর্‌ণী ?

—বোধ হয় সাত নম্বর খাদে গেইছে। যেখানেই যাক্ এই পথেই ফির্বেক।

ভোলা বলিল,—আচ্ছা।

ভুলি তাড়াতাড়ি আড়্কাঠির নিকট গিয়া বলিল,—কাথে খুঁজ্ছিস্ হে ?

লোকটা তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল,—টুর্‌ণী মেঝেনকে। কোথা আছে বল্তে পারিস্ ?

ভুলি তাহার হাত ধরিয়া আর একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল,—টুর্‌ণী আমারই বোন্, সে যাবেক্ নাই, চল্ আমি যাব।

লোকটা বলিল,—বাঃ, তাকে যে পঁচিশটা টাকা দিয়াছি।

—আমাকেও ত দিথিস্ ? . . . আমি লিব নাই, চল্।

আড়্কাঠি সানন্দে বলিল,—চল্ তবে ইষ্টেশনে।

ভুলি তাহার সহিত ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, আরও প্রায় কুড়ি পঁচিশজন কুলি কামিন সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় তাহারাও আসাম-যাত্রী। . . .

*আসামের চা-বাগানে যে ব্যক্তি কুলি কামিন পাঠায়, তাহাকে 'আড়্কাঠি' বলে।

ট্রেনখানা আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে! সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ্ দুইটা এতক্ষণে ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। দূরে পলাশবনের ভিতর দিয়া টুরণী ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।

ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল,—কাঁদছিস্ কেনে?

ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দুৎ কাঁদ্‌ব কেনে লো?

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

---

* * *

. . . কাপুরুষের কাঁধে ঝুলি, ভিক্ষা মাগে বাজারে;
মানের খোঁজে সোজা মাথা নোয়ায়।
বোঝে না যে সেইটি তাহার সাজার ওপর সাজা রে
দিনটি খালি ককিয়ে কেঁদে গোঁয়ায়!

"মুক্তি"



পথিক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩

সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়াও দীপ্তি ঘুমাইতে পারিল না। তাহারই পাশে মায়া শুইয়া আছে, কিন্তু সে জাগিয়া আছে কিনা বোঝা যায় না। ডাকিতেও সাহস হইতেছে না। বিছানায় শুইয়া অবধি মায়া একই ভাবে পড়িয়া আছে! ঘরের নিস্তব্ধতা অসহ্য হওয়াতে দীপ্তি মায়াকে একটু ঠেলিয়া ডাকিল—দিদি।—'

মায়া একেবারে উঠিয়া বিছানা হইতে নামিয়া বলিল—চল্ একটু ছাদে ঘুরে আসি।

বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে শুধু শ্রীশের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। মায়া দীপ্তিকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—দেখ্ Sinners have no rest! শ্রীশদা এখনও বসে বসে লিখ্ছে!—কিন্তু কি লিখ্ছে জানিস?

দীপ্তি। আমি জগতের অনেক জিনিসই জানিনা বা বুঝ্তে পারি না, আমার দাদাটি তার মধ্যে একটি! জন্মে অবধি ওকে দেখ্ছি, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ওকে বুঝ্তে পার্লাম না।

মায়া। বুঝ্তে হ'লে ভালবাস্তে হয় দীপ্তি, এই খানটায় এগিয়ে আয় বেশ স্পষ্ট দেখ্তে পাবি।

দীপ্তি মায়ার পাশে দাঁড়াইয়া এক হাতে তাহার কোমর জড়াইয়া আর এক হাতে ছাদের প্রাচীরের উপর ভর দিয়া দেখিল শ্রীশ তাহার টেবিলের উপর লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া আছে, দুই তিনবার কলম লইয়া কি যেন লিখিতে

চেষ্টা করিল, শেষে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হাত দুটি জড় করিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল।

মায়া বলিল—ঐ শ্রীশদা! দুনিয়ার ব্যথার বোঝা বহে বেড়ায় কিন্তু এখন এমন একজন কেউ ওর পাশে নেই যে ওর কপালটায় হাত বুলিয়ে দেয়—একবার তাকায় ওর মুখের দিকে! . . . ওকে তোরা গম্ভীর চাপা, আরো কত কি বলিস্ না?—এখন দেখ্ একবার ঐ গম্ভীর ঐ চাপা মানুষটার মধ্যে কি করুণ বেদনার উৎস ছাপিয়ে উঠেছে! . . .

দীপ্তি। দিদি, তুই এমন ক'রে সব জিনিসকে দেখবার চোখ ফুটিয়ে দিস্ যে সত্যি বল্‌ছি আমার ভয় করে।

মায়া। নির্ভয়ে ত অনেক দিন কাট্‌ল, এবার একটু ভয় কর্, একটু ভাব্। দিনের আলোতে হাসি গানের ভিতর দিয়ে যে পৃথিবীকে দেখিস, রাতের অন্ধকারে তাকে কেমন দেখায় একবার ভাল ক'রে দেখে নে।

ড্রইং রুমের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। দীপ্তি বলিল—আর নয় দিদি শুবি চল্। অনেক রাত হ'য়ে গেছে—'

মায়া শ্রীশকে দেখিতে দেখিতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, দীপ্তির কথা শুনিতে পায় নাই। দীপ্তি আবার ডাকিল—দিদি চল্ ঘরে যাই।

মায়া। কিন্তু কি ক'রে যাই বল্‌ত? চোখের সাম্‌নে ওকে ঐ রকম দেখে ঘুমাতে পার্‌ব না ত . . . ও কাঁদ্‌ছে! জানিস্ দীপ্তি ঐ রকম ক'রে পুরুষ মানুষরা কাঁদে . . . ঐ হাত দুটো যে ওরই তা যেন ওর খেয়াল নেই! কি ক'রে মোচ্‌ড়াচ্ছে, দেখেছিস্! . . . আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্‌ছে—আমার মনে হয় কান্নাটা পুরুষের পক্ষে একটু শক্ত . . . কাঁদ্‌তে গেলে সমস্ত শরীরের ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় হ'তে থাকে, ওদের কাছে কান্নাটা আমাদের মত সহজ নয়।

দীপ্তি। যাবি ভাই একবার ওর কাছে?

দীপ্তি এমন সহজ সরলতার সঙ্গে ঐ কথাটি বলিল যে মায়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—বলিস্ কি দীপ্তি! তুই যাবি?—'

দীপ্তি। হাঁ, তাতে ক্ষতি কি?—অন্যায় কি আছে এতে?

মায়া। না আমি অন্য কোন ক্ষতি বা অন্যায়ের কথা ভাব্‌ছি না। আমার মনে হয় আমাদের ও এখন সইতে পারবে না। তাছাড়া আমরা ওর

এই কষ্টের ওপর আরো খানিকটা লজ্জা চাপিয়ে দেবো। এখন শুধু একটি মানুষ ওর কাছে যেতে পারে দীপ্তি, সে তুইও ন'স্, আমিও নই।

দুই ভগিনীতে আবার বিছানায় আসিয়া শুইল। দীপ্তি মায়ার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি ওর কিসের দুঃখ?—'

মায়া অত্যন্ত শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল—জানিনা দীপ্তি—তুই ঘুমো।

সকালে চা খাওয়ার পর শ্রীশ প্রতিদিনের মত পলায়নের আয়োজন করিতেছে দেখিয়া মায়া বলিল—শ্রীশদা, তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে, এখুনি পালিও না।

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—শ্রীশদা তোমার যদিও পালাতে পার্‌লে আর কিছুই চায় না, তবুও হুজুরে হাজির রইল।—কি কথা শুনি?

মায়া। প্রথম নম্বর হচ্ছে—তুমি পরের বোন্‌দের জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষটা ঘেঁটে যেখানে যেখানে ভাল খদ্দর পাও তা জোগাড় ক'রে এনে দাও, এদিকে তোমার নিজের বোন্‌গুলো দেশী খদ্দর ত দূরের কথা, 'জাপানী' বা 'ম্যাঞ্চেষ্টারের' খদ্দরও পায় না।

শ্রীশ, মায়ারই কথার প্রতিধ্বনির মতই বলিল—নিজের বোনগুলো পরের ভাইএর খোঁজ খবর নিতে এতই ব্যস্ত, যে আমার ঘরে খুব কম ক'রে এখনও প্রায় দশ জোড়া ভাল অন্ধ্রদেশের খদ্দর সাড়ী রয়েছে তা একবার কষ্ট ক'রে দেখবারও ফুরসুৎ পায় না!

মায়া হাসিয়া বলিল—ওরে বাপ্‌রে! আচ্ছা বাপু, আমি না হয় প্রথম নম্বরে হার্‌লাম। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে—আজ ঠিক একমাস হ'ল তুমি আমায় দেখ্‌তে যাও নি! প্রত্যেক 'ভিজিটার্স' ডে'তে 'এব্‌সেন্ট্‌' হওয়ার দরুণ তোমার একটা শাস্তি আমি ঠিক করেছি।

শ্রীশ। তা এটাও বৃথা হবে। তুমি দ্বিতীয় নম্বরেও হার্‌লে। এক-মাস পূর্ব্বে শ্রীশ 'শ্রীঘর' বাস কর্‌ছিল—তার অপরাধটা স্বেচ্ছাকৃত নয় বোধ হয়।

মায়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা শ্রীশদা, তুমি কি আগে জান্‌তে পেরেছিলে আমি তোমাকে ও সব প্রশ্ন করব?

শ্রীশ। দূর্, তা কেন, আমি যে তোর দাদা।—দাদা মানে জানিস্ ত?

মায়া। খুব জানি বাবা তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে ? 'নন্‌-কো-অপারেশন'আর 'প্যাসিভ্‌ রিজিস্‌টান্স্‌' প্রচার ক'রে ক'রে সত্যি তোমাদের মাথার ঘিলুগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে—'

ভাই বোনের এই স্নেহের কলহটুকু সকলেই আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে ছিলেন। এমন কি সুবর্ণও হাসিয়া বলিলেন—শ্রীশ আর মায়ার পাল্লায় পড়্‌লে মরা মানুষও হেসে ওঠে।

অনেক দিন পরে মিত্র পরিবারে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এই হাসিটুকু বজায় রাখিবার জন্য মায়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে করুণাকে বলিল—মাসীমা শ্রীশদার সঙ্গে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে এনে একদিন খাওয়াতে হবে।

করুণা বলিলেন—সে ত ভাল কথা আমি খুব রাজি। তোমারা দিন ঠিক কর।

কিন্তু শ্রীশ আপত্তি করিল—সুধীর না ফির্‌লে ও সব হবে না মায়া—

মায়া রাগিয়া বলিল—তোমাদের sentiment গুলো সব পচে গেছে শ্রীশদা, ওটা মোটেই healthy sign নয়। তা ছাড়া সুধীরবাবু একথা শুন্‌লে খুসী ছাড়া দুঃখিত হবেন না।

মায়ার জয় হইল। বীরেন্দ্রনাথ মায়ার পক্ষ লইলেন। বলিলেন—তাহ'লে ঐ খাওয়াটা সকালেই হওয়া চাই আর তার জের রাত পর্য্যন্ত চল্‌তে দিতেও আমার আপত্তি নেই। তাতে আমার একটা লাভ হবে। অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি এই সব 'মিনিয়েচার' গান্ধীদের নিয়ে একটু নাড়া চাড়া কর্‌ব। এই সুযোগে সেটা হ'য়ে যেতে পারে।

মায়া দীপ্তি শ্রীশ এই তিন জনের মধ্যে আর একবার তর্ক হইয়া যাইবার পর ঠিক হইল রবিবার অর্থাৎ পরের দিনই সকলকে আনিয়া খাওয়াইতে হইবে।

তখন বেলা প্রায় দশটা, দীপ্তির ঘরে বসিয়া মায়া একখানি উপন্যাস পড়িতেছিল। দীপ্তি স্নান সারিয়া ভিজা চুলের ডগায় 'গের' দিয়া মায়াকে তখনও পড়িতে দেখিয়া তাহার হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—বাবা রাত দিন বই! আমরা যেন আর কেউ নই ?—

মায়া হাসিয়া বলিল—বা রে মেয়ে, নিজে দিব্যি ক'রে স্নান সেরে এলেন আর আমি বেচারী একলাটি থাক্‌তে না পেরে একটু পড়্‌তে বসেছি, অমনি

চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নেওয়া হ'ল! কিন্তু এমন জায়গায় থামালি দীপ্তি, তোকে কোন দিন ক্ষমা কর্‌ব না—ওঃ কি সুখ পাচ্ছিলাম যে—'

দীপ্তি। ছাই সুখ।

মায়া। ছাই সুখ?—বলিস্ কিরে! তিন দিন পরে জর্জ্জের সঙ্গে আইরিসের দেখা হয়েছে, তাও আবার কত কষ্ট ক'রে কত বাধা এড়িয়ে, বুড়ী পিসির চোখে ধূলো দিয়ে. . . সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে, চারিধার নিস্তব্ধ—আইরিস্‌কে কাছে টেনে নিয়ে জর্জ্জ চাপা আর ভারি গলায় বল্‌ল—I love you so Iris, I——'

আইরিস তার মুখখানি জর্জ্জের মুখের কাছে তুলে ধর্‌ল . . . জর্জ্জের ঠোঁট দুটি নেমে আস্‌ছে! . . . আইরিস কেঁপে উঠ্‌ল! . . . তার চোখ বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে সুখের আবেশে, আর বাঁদর মেয়ে তুই এসে বাধা দিলি—'

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—যত Trash নভেল পড়্‌বে!—

মায়া। Trash?—তার মানে?—আচ্ছা ধর্ তুই যখন ঐ আইরিসের মত একজনকে মুখ বাড়িয়ে দিবি আর যদি তখন বাধা পড়ে—তুই কি করিস্?—

দীপ্তি। জানি না—যাও—'

মায়া। খুব জান বাবা খুব জান, আচ্ছা দেখা যাবে, আমি ত আর আজই মর্‌ছি না। কিন্তু বলে রাখ্‌ছি কাল মেলাই Grapeshot এখানে এসে পড়্‌বে—

দীপ্তি। তাতে আমার কি?

মায়া। এমন কিছুই নয়, তবে লোভে বা লভে প'ড়ে সে বেচারীকে—'

দীপ্তি রাগিয়া বলিল—আঃ থাম বল্‌ছি।

মায়া থামিল না হাসিয়া বলিল – সে বেচারী বিলেত যাবার সময় তোকে মেলাই জিনিস দিয়ে গেছে।

দীপ্তি। আচ্ছা আচ্ছা এখন স্নানটা সেরে নাও গে ত লক্ষ্মী মেয়ের মত, নইলে কালকের মত বকুনি খেতে হবে।

মায়া উঠিয়া বলিল—নাঃ সেটার প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ নেই; এখন Tangible কিছু খাবার জন্যে পেট্টা চেঁচামেচি কর্‌ছে—চল্‌লাম।

মায়া স্নান করিতে চলিয়া গেলে দীপ্তি, জর্জ্জ ও আইরিসের নিকট

অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বইখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল এবং জর্জ্জ ও আইরিসকে তাহাদের বড় দুঃখের মিলন-সুখ নিঃশব্দে উপভোগ করিতে দিল।

দীপ্তি পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে। বারে বারেই আইরিস কাঁদিয়া বলে—কি হবে জর্জ্জ? পিসিমা আর বাবা কিছুতেই—' তাহার কথা আর শেষ হয় না, কান্নায় কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। জর্জ্জ নিষ্ফল আক্রোশে দন্তে দন্ত চাপিয়া বলে—Damn it! কিন্তু কোন উপায় দেখিতে পায় না।

ঝোপের মধ্যে নিশাচর পক্ষী ডাকিয়া উঠে. . . আইরিস শিহরিয়া জর্জ্জকে জড়াইয়া ধরে. . . সময় বহিয়া যায়! আইরিস ভয়ে ভয়ে বলিল—আর ত থাকা যায় না জর্জ্জ, আজ ছেড়ে দাও—' জর্জ্জ বলিল—তবে যাই আইরিস—' আইরিস তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলে—আর একটু থাক—একমিনিট শুধু একমিনিট—'

জর্জ্জ তাহার চওড়া হাতখানি আইরিসের গালে বুলাইয়া বলিল—সাম্‌নের এপ্রিলে আমার মাইনে হবে সাত পাউণ্ড। আর তিন পাউণ্ড যদি কোন মতে যোগাড় করতে পারি. . . আচ্ছা থাম, এখন কাজ করি আট ঘণ্টা, ধর যদি এবার থেকে আর চার ঘণ্টা বেশী কাজ করি আর 'ব্রেকফাষ্ট'টা বাদ দিয়ে যদি একেবারে 'লাঞ্চ' খাই,—না তাতে আমার কোনই কষ্ট হবে না আইরিস,তাহ'লে বোধ হয় বছরখানেকের মধ্যে তোমার জন্যে ছোট্ট একখানা ঘর—ওঃ আইরিস, ছোট্ট একখানা নিজের ঘর . . . তুমি নিজের হাতে সব সাজাবে. . . কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখ্‌ছি পুরানো 'ফার্‌নিচার' কিন্‌তে দেবো না সব নতুন চাই—

আইরিস্ জর্জ্জের মাথাটি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—জর্জ্জ—my husband—'

হঠাৎ জর্জ্জ বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল! আইরিস্ দেখিল, তাহার বাবা চাবুক হাতে লইয়া, তাহাদের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে এবং কিছু দূরে তাহার পিসিমা। . . .

জর্জ্জ লাফাইয়া আইরিসের পিতার হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া তাহারই উপর উহার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেই আইরিস্ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—না জর্জ্জ, তা হ'তে পারে না।

জর্জ্জ চাবুক ফেলিয়া তাহার আরক্ত চোখদুটি আইরিসের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—Good bye—'

স্নানের ঘরে জলপড়ার শব্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মায়া তখন গান ধরিয়াছে। দীপ্তি বই ফেলিয়া দিয়া একবার ডাকিয়া উঠিল—দিদি তোর হ'ল ?—কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। দীপ্তি আবার বইখানি তুলিয়া লইল। এই অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন এবং স্বাভাবিক কাহিনীটি দীপ্তির মনকে ক্রমেই গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল, সে পড়িতে আরম্ভ করিল—এক সপ্তাহ পরে জর্জ্জ একখানি পত্র পাইল, আইরিস্ লিখিতেছেঃ—

কাল আমার বিয়ে জর্জ্জ—আমি যখন বল্‌তে পার্‌ছি একথা, তখন তোমার কষ্ট পাবার কোন কারণ থাক্‌তে পারে না। তা ছাড়া আমার কষ্ট ঘোচাবার জন্যে তোমাকেও আর বার ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে হবে না। বুড়ো মার্‌কুইসের টাকাগুলো—থাক্ সে কথা। এই লোকের হাতেই একটু 'লিখে জানিও তোমাকে কোথায় দেখ্‌তে পাব—আর একটিবার অন্তত তোমাকে দেখ্‌তে চাই—'

তোমারই আইরিস্

জর্জ্জ লিখিলঃ—

কাল যখন গির্জ্জেয় যাবে, ঠিক ফটকের পাশেই আমায় দেখ্‌তে পাবে, কিন্তু বেরিয়ে এসে আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না। তার কারণ তোমার বিয়ের সময় জান্‌লাম চারটে পঁয়তাল্লিস আর আমার ট্রেণ ও ঠিক ঐ সময়ে ছাড়্‌বে। আমি 'নিউজিলাণ্ড' যাচ্ছি আইরিস্। শুনেছি সেখানে এখনও সভ্যতাটা এত প্রবল হ'য়ে ওঠে নি, তাছাড়া কাজ কর্‌বার পক্ষে অমন দেশ আর নেই। খুব কাজ কর্‌ব সেখানে গিয়ে—

তোমার জর্জ্জ'

দীপ্তি আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পাতা উল্‌টাইয়া ফেলিল। ইহাতে সেই পরের দিনের কথা লেখা আছে জর্জ্জ ফটকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চারিদিকে গোধূলির অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতেছে লোকের ভীড় ঠেলিয়া আইরিসের গাড়ী আসিয়া থামিল . . . তাহার মুখ মোমের মত সাদা . . .

দীপ্তি আর পড়িতে পারিল না। বই ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিল, না,

দিদিটা আমার আজকের সব আনন্দ নষ্ট ক'রে দিল—আর ওর স্নান কি আজ আর হবে না?—'

সে আসিয়া স্নানের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল—দিদি? বাবা, তোর আজ হ'ল কি—'

মায়া উত্তর দিল—বা রে মেয়ে, এখনও দশ মিনিট হয় নি!

মায়া ঘরে আসিতেই দীপ্তি বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দিদি, এ কিন্তু ভারি অন্যায় না?

মায়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে কি অন্যায়, হঠাৎ অমন ক্ষেপে গেলি যে?

দীপ্তি। পয়সাটাই বড় হ'ল, মানুষের প্রাণটা কিছু নয়?—'

মায়া বুঝিতে পারিল যে সে এতক্ষণ বইখানা পড়িতেছিল, বলিল—তা যদি হ'ত তাহ'লে কোন গোলই থাক্‌ত না, আর তোকেও কষ্ট ক'রে গল্প পড়্‌তে হ'ত না।

দীপ্তি। চাইনা পড়্‌তে, ওঃ ওদের সমাজটা কি হৃদয়হীনদের সমাজ!—'

মায়া। ওগো ঠাক্‌রুণ, সমাজটা চিরদিনই হৃদয়হীন, আর সব সমাজই এক রকম, 'আমাদের' ও 'ওদের' ব'লে বিশেষ পার্থক্য নেই।

দীপ্তি। কিন্তু কেন ওরা পাবে না পরস্পরকে?—ওদের কি অপরাধ?—'

দীপ্তির কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই করুণা ঘরে আসিয়া বলিলেন—কিরে!—তোরা যে ওপর থেকে নাম্‌তেই চাস্‌ না!

মায়া তাহার চুল আঁচ্‌ড়াইতে আঁচ্‌ড়াইতে বলিল—কি ক'রে নাবি? তোমার মেয়েটি সমাজের জুলুম্‌ নিয়ে তর্ক বাধিয়ে বস্‌ল। বলে কেন ওরা পরস্পরকে পাবে না? . . . আচ্ছা মাসীমা, ওকে কি ক'রে বোঝাই বল ত? বড় মানুষের মেয়ে আর গরীবের ছেলেতে বিয়ে হ'তে পারে না, তা ও কিছুতেই বুঝ্‌বে না!

মায়ার কথার সুরে একটা তীব্র ইঙ্গিত ছিল, করুণা তাহা বুঝিলেন কিন্তু হাসিয়া বলিলেন—নে এখন তর্ক রাখ্‌, নীচে গিয়ে দেখ্‌বি চল্‌ কে এসেছে?

৪

মায়া ও দীপ্তি নীচে আসিয়া দেখিল তাহাদের ছোট মামা নগেন্দ্রনাথ এবং 'ভিটের মাটি' কাগজের সম্পাদক বিমল ভট্টাচার্য্য শ্রীশের সহিত তুমুল তর্ক বাধাইয়া দিয়াছেন! টেবিলের উপর খাবার সাজান রহিয়াছে—কিন্তু তাহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ কাহারও দেখা যাইতেছে না, কেবল বীরেন্দ্রনাথ, এই তর্কের স্রোত সহজে থামিবে এমন আশা না দেখিয়া, 'আলুভাতে' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনই খাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—খেতে ব'সে উপাসনা হ'লে বরং থাম্‌বার আশা থাকে কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তি পাশাপাশি বস্‌লে—সমস্ত দিনব্যাপী!—'

মায়া নগেন্দ্রকে টানিয়া তাহার দিকে ঘুরাইয়া বলিল—দেখ ছোট মামা, ওসব 'প্রপাগাণ্ডা ওয়ার্কস্'এর কথা পরে হবে, এখন তুমি শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে এস। এই পোষাকে কিছুতেই তোমায় খেতে দেবো না।— কি বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমায় ছোট মামা!

নগেন্দ্র। বিশ্রী?—তার মানে?—'

মায়া। মানে আরসির সাম্‌নে দাঁড়ালেই বুঝ্‌তে পার্‌বে—খদ্দরের সুট্‌ তার ওপর আবার 'ষ্ট্রাইপ কাটা'! . . . . যাও এখুনি শ্রীশদার কাপড় পরে এস।

নগেন্দ্র। দেখ্‌ মায়া, এই পরে আমি—'

মায়া। না ছোট মামা ও সব কোন 'সার্টিফিকেট্'ই মান্‌ব না। সে নগেন্দ্রকে টানিয়া শ্রীশের ঘরে লইয়া চলিল।

বীরেন্দ্রনাথ করুণাকে বলিলেন—ওগো, আর ত পারি না!—'

করুণা হাসিয়া বলিলেন—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! এখন বেলা ত এমন কিছুই বেশী হয়নি—'

নগেন্দ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলে সকলে আহারে বসিলেন। মায়া বলিল—দেখ, কেউ যদি খাবার সময় 'পলিটিক্স' চালাও তাহ'লে আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে যাব, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি কিন্তু—'

নগেন্দ্র, সুবর্ণকে বলিলেন—দেখ বড়দি, সেদিন একখানা বিলিতি কাগজে দেখ্‌ছিলাম, ওদের দেশে মেয়ে 'কন্স্‌টেবলের' খুব দরকার। মায়াকে পেলে তারা ডবল মাইনে দিয়ে রাখ্‌বে,—ওকে পাঠাবে?—'

খুব একচোট হাসি হইয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শ্রীশ এবং বিমল আবার তর্কে জমিয়া উঠিতেছে।

বিমল বলিতেছিল—এই যে সমস্ত যুবকেরা দলে দলে ফিরে আসছে পল্লী-সংস্কারের কাজ ফেলে, এর মধ্যে কি দেখ্‌তে পাই জান শ্রীশ?—ধৈর্য্যের অভাব। ওরা চায় একরাত্রে পাবনা জেলাটাকে 'প্যারী' করে তুল্‌তে! . . . আরে সবুর কর্।

শ্রীশ। তা মোটেই নয়। তারা সবুর কর্‌তে খুব রাজী, শুধু যদি 'কর্ত্তারা' দয়া ক'রে তাদের দু'বেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থা ক'রে রাখেন—'

বিমল। ঐ ত তোমার ভুল শ্রীশ! কে খাবার ঠিক করে রাখ্‌বে?—তাকেই ক'রে নিতে হবে সব, নিজের হাতে।

শ্রীশ। তাহ'লে তুমি বলতে চাও, এই যে দেশের লোকের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে কত রকম নাম দিয়ে, তার থেকে কিছু ঐ কর্ম্মীরা দাবী কর্‌তে পারে না?—'

বিমল। না। সেটা তাঁদেরই জন্যে রাখা হবে যাঁরা দেশের জন্যে চিন্তা করছেন।

বিমল এই চিন্তা কথাটির উপর এমন করিয়া জোর দিল যাহাতে বোঝা যায় যেন চিন্তা করিলে মানুষ পঙ্গু হইয়া যায়, কাজেই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঐ টাকা সযত্নে রক্ষিত হইবে। যাহারা কাজ করে তাহাদের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কারণ নিজেদের সুখ-সুবিধা তাহারা যেমন করিয়াই হোক করিয়া লইবেই।

বিমল বলিল—এই ধর না পুলিনবাবু। তিনি শুধু ভাব্‌তে জানেন। মানুষের মনের মত ক'রে কি ক'রে ভাব্‌তে হয় তা তিনি জানেন। আর ঐ চিন্তাকে কাজে লাগাতে পার্‌লে কত সহজে যে উন্নতি হ'তে পারে, তা তাঁর মত এমন সহজে কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। বাস্তবিক অমন ক'রে উপায় গুলোকে চোখের সামনে দেখ্‌তে পেলে কাজ কি সহজ হ'য়ে আসে না?—'

এবার শ্রীশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মায়া বলিয়া উঠিল—তাহ'লে এক কাজ করুন না কেন বিমলবাবু, এই কর্ম্মীদেরও ভাব্‌তে বসিয়ে দিন। ভেবে ভেবে

প্রবন্ধ লিখে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে যদি ওরা কাজে নামে, তাহ'লে ওদের ছ'বেলা ছ'মুঠোর জন্যে ভাব্‌তে হবে না—ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটবে না। বলেন ত আমিও চিন্তা করতে রাজী আছি। আপনার কাগজে লিখ্‌লে, কি রকম 'পে' করেন?—ছ'একটা ইংরিজি কাগজ ভাল প্রবন্ধের জন্যে দৈনিক ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে থাকে।—মাস ছয় লিখ্‌তে পারলেই 'প্রপাগেণ্ডা ওয়ার্কস' আর অত শক্ত মনে হবে না।

মায়ার কথার তীব্র খোঁচাটি বিমলকে বেশ একটু কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কোন কথা বলিবার না পাইয়া মাথা নীচু করিয়া থালার ভাত তরকারী গুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল, কিন্তু ঐগুলিকে যে মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হইবে তাহা যেন তাহার মনে নাই।

দীপ্তি বিমলের এই বিব্রত ভাবটি তাহার চশমার আড়াল দিয়া দেখিয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে তাকাইয়া নীরবে জানাইতেছিল—আর কেন ভাই দিদি? ওকে ছেড়ে দে—'

করুণা তর্ক থামাইবার জন্য বলিলেন—এই মাত্র তুই সকলকে বলিয়ে নিলি যে খাবার সময় কেউ তর্ক করতে পারবে না আবার নিজেই আরম্ভ করেছিস্‌?

মায়া লজ্জিত হইয়া বলিল—ভুলে গেছি মাসী কিন্তু সব সময় চুপ ক'রে থাকাও শক্ত।

খাওয়া শেষ হইলে বসিবার ঘরে সকলে আসিতেই, বিমল মায়ার পাশে বসিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ যে আপনি বল্‌লেন প্রবন্ধের কথা,—সত্যি লিখুন না। আপনার মধ্যে এমন চমৎকার সব জিনিস রয়েছে!—

মায়া। কি লিখ্‌ব?

মায়ার কথার সুরে উৎসাহ পাইয়া, বিমল বলিল—কি লিখ্‌বেন?—সব চেয়ে সহজে আপনি যা বলতে চান বা পারেন, তাই।—নারীর কথা, তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তার বাধা, এই সব—আমি আর কি বলব আপনাকে? সে সব ত আপনি বোঝেন। আমি চাই আপনারা এবার বেরিয়ে আসুন, আমাদের দেখ্‌তে দিন, সৃষ্টির প্রথম থেকে যাদের আমরা সব দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম, শুধু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে হাজার রকমের নিষেধ-বিধান তৈরী ক'রে রেখেছি—সে সমস্ত সম্বন্ধে প্রত্যেক নারীর আলোচনা করবার সময়

এসেছে গতানুগতিক ধারণা—সংস্কার বা প্রথাগুলোকে একটু ঘসে মেজে দেখ্‌তে হবে।

মায়া। কি হবে?

অতখানি বক্তৃতার পর ছোট্ট ঐ উত্তরটি পাইয়া বিমল আবার যেন উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—কষ্টি পাথরের ওপর দাগ পড়্‌লে খাঁটি মেকি ধরা পড়ে। সত্যকে চেন্‌বার সুযোগ পাব—'

মায়া হাসিয়া বলিল—কাজ চালান নিয়ে যখন কথা তখন যদি সোনার চেয়ে পেতলটাকেই বেশী দরকারী বলে ভাবি তাতে আপনার রাগ করবার কি আছে?

বিমল। দরকারী ভাবতে পারি কিন্তু তাই বলে সোনাকে অশ্রদ্ধা কর্‌ব কেন?—'

মায়া। অশ্রদ্ধা ত কর্‌ছে না কেউ। আমাদের দেশের মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব চায় না কোন দিন, তাতে অশ্রদ্ধার চেয়ে শ্রদ্ধাই বেশী স্পষ্ট। তাঁরা বলেন—'আমার স্ত্রী কাজ কর্‌বে?' তাঁদের অভিমানে আঘাত লাগে। নারী তাঁদের কাছে শুধু স্ত্রী আর কিছু না। আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে ঐ কথাটা খুব ভাল ক'রেই বোঝে।

সুবর্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—মায়া, তোর এ কথাগুলো কি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে না? আজ যে তুই একা পথ দিয়ে চলে ফিরে বেড়াস্, তার মধ্যে শিক্ষিত সমাজের কি কোন হাত নেই বল্‌তে চাস্?

মায়া। হাঁ মা। এতে শিক্ষিত সমাজের কোন হাত নেই।—আমি চলে ফিরে বেড়াই, কিন্তু তুমি কি দাও? হাজারবার ভাব নাকি এতে আমার মর্য্যাদার হানি হ'ল? তুমি ভাব শিক্ষা পেলে তবে মেয়েরা বেরুতে পারে, কিন্তু এটা তোমার ভুল ধারণা মা।—আচ্ছা আমি ত তোমাদের শিক্ষিত সমাজের মেয়ে,—বল কোন্ পথটা তোমরা আমার জন্যে খোলা রেখেছ?

সুবর্ণ। বলিস্ কি মায়া, তুই যে অবাক কর্‌লি! তুই বল্‌তে চাস—সেকালের মেয়েরা যে অসুবিধা ভোগ কর্‌ত আজও আমরা তাই কর্‌ছি?

মায়া। তার চেয়ে বেশী মা। তখন মেয়েরা বুঝ্‌ত তাদের পক্ষে

কোন পুরুষ মানুষের মুখের দিকে তাকান পাপ, বাইরে বেরুন পাপ, লেখাপড়া শেখা পাপ। এটা তারা বিনা বিচারে মেনে নিয়ে ছিল, তার কারণ তাদের কানে ঐ সব মন্ত্র দেওয়া হ'ত, আর আজ তোমরা আমাদের সে সব ধারণা কেড়ে নিয়েছ অথচ কোন উপায় রাখনি!

সুবর্ণ। তার মানে?

মায়া। মানে তোমরা ভাব এতে অন্যায় হবে।

সুবর্ণ। কি কর্‌তে চাও?

মায়া। তা কি ক'রে বল্‌ব? একটা কি ইচ্ছে?—সব কর্‌তে চাই। জীবনটাকে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা না থাক্‌তে দিয়ে কাজের ভিতর দিয়ে দিন রাত ছুটে বেড়াতে চাই—দেবে?

সুবর্ণ। মায়া, তুই কি—পাগলের মত বক্‌ছিস?

মায়া হাসিয়া বলিল—তাই যদি আমার কথা থেকে প্রমাণ হয়, তাহ'লে আমার কথা আর না বলাই ভাল—আচ্ছা ছোটমামা—তোমার কি মনে হয়, আমি পাগল?

নগেন্দ্র একবার মায়ার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু হাসিল তাহার পর পাইপে একটা জোরে টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—আমি ঠিক ধর্‌তে পারব্‌ না, কারণ ওটা যদি পাগলামীই হয় তাহ'লে ও ছাড়া তোকে আমি চিন্‌তেই পার্‌ব না।

বিমল এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে মায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, বিস্ময়ের তাহার সীমা ছিল না! মায়া তাহার দিকে চাহিতেই বিমলের সমস্ত শরীর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

মায়া হাসিয়া বলিল—কি বিমলবাবু, আপনি মনে মনে সব লিখে নিচ্ছেন নাকি?—কিন্তু দোহাই আপনার 'নারীর কথা' নাম দিয়ে ঐ যে সব প্রবন্ধগুলো আপনাদের কাগজে ছেপে বার করেন তার মধ্যে আমায় টেনে আন্‌বেন না। আমি কারো কাছে কাঁদি না, কারুকে আঘাত দিতে চাই না, আমার যদি কিছু কর্‌বার ইচ্ছে হয় তা আমি যেমন ক'রে পারি নিজেই ক'রে নিই—নিঃশব্দে। খবরের কাগজের পাতায় কাঁদুনি গেয়ে আমাদের দেশের মানুষকে ঘুম পাড়াবার পক্ষপাতী আমি নই।

বিমল আহত হইয়া বলিল—এটা কিন্তু আপনি অবিচার করলেন, সবাই কি ঐ রকম ?—একজনও কি এমন মানুষ নেই যে—

মায়া। থাকতে পারেন, কিন্তু লজ্জায় মরে যাই যখন দেখি কোন মেয়ে পুরুষের কাছে কাঁদছে, পুরুষেরই অত্যাচারের উল্লেখ ক'রে! . . . 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ব'লে যাঁরা নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধটা প্রচার করেন, তাঁদেরই কাছে কাঁদতে হবে ?—

এই কথা কয়টি সকলকেই একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল বীরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে একটা বইএর পাতা উলটাইতে লাগিলেন, নগেন্দ্র নির্ব্বাপিত পাইপটায় অল্প অল্প টান দিতেছেন, শ্রীশ মাটির দিকে তাকাইয়া হাতের আঙ্গুলগুলি মুড়িয়া মুড়িয়া শব্দ করিতেছে দীপ্তি ও করুণার চোখের কোণে জলের বিন্দু দেখা দিয়াছে—কিন্তু সুবর্ণ আগুন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—মায়া তুই থাম্ বল্‌ছি—নইলে—'

করুণা মায়ার কাছে উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তুই সব জিনিসকেই বড় বাড়িয়ে দেখিস্ মায়া—একটু ভেবে দেখ্, তোরা যাতে সুস্থ সবল মন নিয়ে বেড়ে উঠ্‌তে পারিস্ এমন কোন পথই কি রাখেনি সমাজ ?

মায়া তাহার আরক্ত মুখখানি করুণার মুখের দিকে তুলিয়া তাহার আঁচলের এক প্রান্ত নিজের আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—গোটা দুই পথ দেখ্‌তে পাই ছোট মাসী, একটা হচ্ছে—'ইস্কুল মাষ্টারি,—আর একটা—বিয়ে—'

সুবর্ণ। তোর এই কথাগুলো মেয়ে মানুষের স্বাভাবিক নম্রতা শ্লীলতাকে যে কত দূর ছাপিয়ে উঠেছে আজ তা জান্‌লাম, আর সব চেয়ে আমার কষ্ট হচ্ছে মনে ক'রে যে তুই আমারই মেয়ে—'

মায়া। কিন্তু তুমি যেটাকে নারীত্ব বলে ভাব মা, আমি তাকে অন্য নাম দিয়েছি কিন্তু তা বল্‌তে চাই না . . .'

নগেন্দ্র পাইপটা টেবিলের উপর ঠুকিয়া বলিল—Thus far and no further . . . আর তর্ক চল্‌তেই পারে না—কিন্তু মায়া তোরই হার হ'ল।

মায়া। ইস্—কি প্রমাণ ?

নগেন্দ্র। তোর কথা। ব্যস্ আর তর্ক চল্‌তে পারে না। এখন বল ত কাল্‌কের menu'টা কি হবে?

বীরেন্দ্রনাথ। বেঁচে থাক দাদা। উঃ, সেই তখন থেকে 'হত্যে' দিয়ে প'ড়ে আছি শুন্‌তে পাব বলে, কথা শুনে ত আর পেট ভরে না?—কি মায়া? এখন যে একেবারে চুপ!—ডাল হবে কি ডালনা হবে, ঝোল হবে কি কালিয়া হবে—লাগ একবার কোমর বেঁধে দেখি!

মায়া হাসিয়া সুবর্ণের পাশে বসিয়া আদর করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল—তুমি ঠিক ক'রে দাও মা—'

মায়ার কথায় সুবর্ণের অনেকখানি রাগ পড়িলেও অভিমান গেল না, তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের কি হবে না হবে তার মধ্যে নেই।

মায়া। কেন? সে হবে না মা, তোমাকে বল্‌তেই হবে।

সুবর্ণ মুখখানি মায়ার দিক হইতে ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—না।

মায়া। তুমি এর মধ্যে তা'হলে থাকবে না?

সুবর্ণ। না—'

মায়া। কেন?

সুবর্ণ। তার ত কোন দরকার নেই। তোমরা যখন সব নেমন্তন্ন করতে পাঠাও আমার মত চেয়েছিলে কি?

মায়া সুবর্ণের অভিমানের কারণ বুঝিয়া তাঁহার কোলে বসিয়া বলিল—আচ্ছা আর এমন ভুল হবে না। ওটা আমারই দোষ হয়েছে তা মান্‌ছি।—কিন্তু এতে যে তোমার কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না তা জান্‌তাম না।

সুবর্ণ। আমার মত নেই ব্যস্। নে ওঠ্, বিরক্ত করিস্ নি।

করুণা। কেন এতে অন্যায় কি দেখ্‌লে?

সুবর্ণ। অন্যায় ত বল্‌ছি না—আমি যদি না চাই আমার মেয়ে ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে, যাদের কোন পরিচয়ই জানিনা শুধু শ্রীশের সঙ্গে জেলে গিয়ে'ছিল ছাড়া—'

এই কথার খোঁচা খাইয়া বিমল এবং শ্রীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শ্রীশ সুবর্ণের কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য মুখ তুলিতেই করুণা ইঙ্গিত করিলেন কোন কথা না কহিতে। কিন্তু মায়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে এক-

বার শ্রীশ এবং বিমলের দিকে তাকাইল, তাহার পর চোখ বন্ধ করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল, এবং করুণার কাতর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—হাঁ, মা, তাঁরা কেউ সিভিলিয়ন বা ব্যারিষ্টার বা ঐ রকমের কিছু ন'ন, যে যদি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে ফেলি আমাকে তাঁদের কাছে লজ্জায় পড়্‌তে হবে। তবে এঁদের সঙ্গে মেশার দরুন যদি তোমরা আমাকে অনুপযুক্ত ভাব, আমাকে ছেড়ে দাও মা,আমি হাত জোড় ক'রে তোমাদের সভ্যসমাজ থেকে বিদায় চাইছি . . .,

ঘরের সবাই একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সুবর্ণও মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিবার সাহস পাইলেন না। মায়ার কথার সুরে মনে হইল যেন সহস্র সহস্র বৎসরের শৃঙ্খলিত নারী-হৃদয় মুক্ত আলোবাতাসের স্পর্শ পাইবার জন্য নড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ ফুলদানী হইতে একটা ফুল লইয়া ছিঁড়িতে লাগিল। বিমল একবার তাহার মুগ্ধ দুটি চোখ দিয়া মায়াকে দেখিয়া লইয়া বলিল—আমি এখন আসি?— প্রেসে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে—'

করুণা। তাহ'লে কাল তুমি আস্‌ছ ত বিমল?

কিন্তু বিমল এইমাত্র সুবর্ণের কথাগুলি শুনিয়াছে, সেই কথার জ্বালা এখনও তাহার মনে মিলাইয়া যায় নাই তাই একটু আপত্তি জানাইয়া বলিল— খুব লোভ হচ্ছে কিন্তু এত কাজ প'ড়ে রয়েছে যে—'

মায়া। না সে হবে না বিমলবাবু, আপনাকে আস্‌তেই হবে। না বল্‌তে পারেন না। মেশোমশাই, আপনার সম্পাদক অবাধ্য হচ্ছেন, ওঁকে আস্‌তেই হবে বলে দিন—কোন ওজর চল্‌বে না।

নীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—ওহে যত রকমের অপবাদ আছে তার মধ্যে, পুরুষের কাছে 'Joy Killer'এর মত আর একটাও নেই।

দীপ্তি তাহার কালো কালো দুটি চোখ বিমলের মুখের উপর তুলিয়া বলিল— কাল আপনি এলে বেশ হবে কিন্তু, আমার কতকগুলি বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান বিশেষতঃ ঐ কল্যাণী—সেই যে, যার লেখার আপনি খুব প্রশংসা করেন—'

বিমল একবার ভয়ে ভয়ে সুবর্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া সম্মতি জানাইল তাহার পর সকলকে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

বিমল বাহিরে যাইতেই সুবর্ণ বলিলেন—তাহ'লে কাল এখানে একটা 'বারোয়ারি' বস্‌ছে বল ?—'

শ্রীশ। বারোয়ারি মানে ?—'

সুবর্ণ। মানে যা তাই—'

শ্রীশ আরক্তমুখে বলিল—দেখুন মাসীমা,আপনি কি ভাবেন বয়েসে বড় হ'লে ছোটদের যা খুসী তাই বল্‌তে পারেন ?

করুণা রাগিয়া বলিলেন—আঃ শ্রীশ, তোর কি আজ কোন কাজকর্ম্ম নেই—যা এ ঘর থেকে, বেরো—'

শ্রীশ। না মা, আমি আজ ওঁর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া ক'রে নিতে চাই—তুমি বাধা দিও না। আমার বন্ধুদের দেখ্‌বার এবং জান্‌বার পূর্ব্বে এমন সব কথা বল্‌বার ওঁর কি অধিকার আছে ?—উনি বল্‌লেন—তাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনা শুধু শ্রীশের সঙ্গে জেলে গিয়েছিল ছাড়া—'

সুবর্ণ। সত্যিই ত তাই—'

শ্রীশ। মা, এখনও সময় আছে, ওদের জানিয়ে আসি আমরা মত বদ্‌লেছি—'

করুণা ব্যথিত হইয়া বলিলেন—দূর পাগ্‌লা ! তার দরকার নেই। দিদির মত না থাকে, ওঁর ভাল না লাগে, তফাতে থাক্‌বেন। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাব্‌ছি শ্রীশ, আমিও ত মা। আমার ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে ভয় থাকবে না ? এই যে এতগুলি ছেলেকে আমার ঘরের মধ্যে আন্‌ব যাদের সঙ্গে আমার মেয়েরা মিশ্‌তে চাইছে—এই মেশাটা এখানেই শেষ হবে না এটা নিশ্চয়ই, এ থেকে কি দাঁড়াবে তার সম্বন্ধে কোন বিচার করব না ?—নিশ্চয়ই করব। যতদিন আমি মা, তোরা আমার ছেলে-মেয়ে ততদিন ও ভাবনা আমি ভাব্‌বই।

মায়া বলিল—তা ভাব না, কিন্তু ঐ ভাবনার মধ্যে অশ্রদ্ধা থাক্‌বে কেন ?

করুণা। এটাকে তুই অশ্রদ্ধা বল্‌তে পারিস্ না মায়া। মানুষ চিরকালই গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌তে চায়। কারণ আমি যেখানে থাক্‌ব, সেই জায়গাটার সমস্ত বিষয়ই আমার জানা চাই। এই জানা কথাটারই আর একটা নাম হচ্ছে 'গণ্ডী'। এর মধ্যে এখন যদি বাইরে থেকে এমন কিছু নিয়ে আসি যাতে আমার এই চির-

অভ্যস্ত ঠাইটুকুর মধ্যে একটা বিপ্লব বা 'বদল' হবার সম্ভাবনা আছে, আমি তার সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করব না শ্রীশ ?

শ্রীশ। তাহ'লে আমায় আর একটা কথাও বুঝিয়ে দাও। তোমরা যখন একটা চিরঅভ্যস্ত গণ্ডী ভেঙ্গে নিজেদের মনের মত ক'রে থাকবার ঠাই গড়ে নিয়ে ছিলে, আর যার মধ্যে আজও রয়েছ, তাতে তোমরা যা আশা ক'রে ছিলে 'পাব বলে,' তা পেয়েছ ?

করুণা একটু ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—ঠিক বলতে পারি না শ্রীশ, কি আশা করেছিলাম—হয় ত আমরা কোন আশাই করি নি ? কারণ ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে থেকেই আমি বোর্ডিং'এ কাটিয়েছি। জগতের অবস্থাটা যে ঠিক কি ছিল তা জানতে অনেক সময় লেগেছে—জানবার সুযোগও পাইনি কারণ বোর্ডিং থেকে বেরিয়েই তোদের সংসারে এসে পড়লাম। জগৎকে প্রথম দেখলাম—তোর যখন বয়েস তেইশ বছর . . .

যখন স্কুলে পড়তাম, মনে পড়ে আমাদের সঙ্গে কতকগুলি মেয়ে পড়ত তারা ব্রাহ্ম নয়। তাদের আমরা বেশ অশ্রদ্ধার চোখেই দেখতাম—ওদের চাল চলন আমাদের মত নয় বলে কত সময় হেসেছি—নিজেদের বড় মনে করেছি। আমরা স্বাধীনতাকে হাতের মধ্যেই পেয়েছি, তা কারো কাছেই চাইতে হয়নি, বা পেতে কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। সে কষ্টগুলো সব আমার'মা সয়ে গিয়েছেন, তার বিষয় শুধু গল্প শোনা ছাড়া বুঝতে বিশেষ কিছু চেষ্টা করিনি। যে অবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠেছি তাকেই সহজ বলে মনে হয়েছে।

শ্রীশ। এই রকমভাবে সহজ হ'তে গিয়ে দেশের কাছ থেকে আমরা কি তফাৎ হয়ে যাইনি মা ? আমার মনে হয় এতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে—'

করুণা। সে ক্ষতিকে বেড়ে উঠতে না দেবার অধিকার তোমাদের আছে। আমাদের দিন আমরা কাটিয়ে এসেছি শ্রীশ, এবার তোমাদের পথ তোমরা ক'রে নাও। শুধু এই কথাটি মনে রেখো—তৃপ্তিকে বাইরে পাওয়া যায় না, সে আছে তোমার মনেই। ছোট'র মধ্যে থাকলে যেমন মনটা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে,

বড়'র মধ্যে থাকলে তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পায়। কোন্ অবস্থা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ বলা বড় শক্ত।

শ্রীশ। সেই ভেবে কি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব এক জায়গায় মা ?—

করুণা। না চলবে। আমাদের ভয় ভাবনা তোমাদের পথ আট্‌কাতে পারবে না—

শ্রীশ। তুমি কি অমঙ্গল আশঙ্কা কর মা ?

করুণা। অমঙ্গল নয় শ্রীশ, অশান্তি। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক্, আচ্ছা মায়া এই সঙ্গে তোদের কমলা, কল্যাণী, শান্তা, উমা আর যদি কেউ থাকে তাদেরও বল্ না আস্‌তে, ওরা ত সব এক একটি 'স্বদেশিনী' বল্‌লেও হয়।

মায়া বলিল—বাঃ সে ত আমরা ঠিক করেছি আগেই। ওরা সবাই আস্‌বে। ফোনে জানিয়েছে।

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—মায়া 'মজালে রাক্ষস কুলে মজিলা আপনি—' এ কিন্তু বড় সুবিধে ঠেক্‌ছে না ছোড়্‌দি! এতগুলি মনসা দেবীর এক জায়গায় আবির্ভাবটা একটু উৎকণ্ঠার কারণ, বিশেষতঃ যখন 'ধুনোর' গন্ধের সম্ভাবনা আছেই—'

মায়া প্রতিবাদ করিল—এ কিন্তু তোমার বড় অন্যায় ছোট মামা, আমরা বুঝি সব মনসা ?

নগেন্দ্র—নিশ্চয়ই সে বিষয়ে ত আমার আর তিলমাত্রও সন্দেহ নেই—কিন্তু উপস্থিত আর একটী মনসা কখন যে অন্তর্ধান করেছেন তা ত বুঝ্‌তে পারছি না!—দীপ্তিটা গেল কোথায় ?—

সকলের প্রথমে মনে পড়িল যে দীপ্তি সেখানে নাই। করুণা বলিলেন—তর্ক হ'লেই ও আর টিক্‌তে পারে না, কখন্ পালিয়েছে।

নগেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—তর্কগুলো 'হজমিগুলি' হ'লেও এই দুপুর বেলা একটু 'গড়িয়ে' নিলে বিশেষ অন্যায় হবে কি ? এবং সকলের আপত্তি না থাকলে আমি উঠ্‌তে পারি কি ?—

মায়া উপরে আসিয়া দেখিল দীপ্তি সকাল বেলাকার সেই অসমাপ্ত বইখানি লইয়া পড়িতেছে। মায়া দীপ্তির পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল—কি রে, ব্যর্থ প্রেমের নামতা মুখস্থ করছিস্ নাকি ?

দীপ্তি বইখানি বন্ধ করিয়া মায়ার দিকে সজল দুটি চোখ তুলিয়া বলিল—আচ্ছা, এর কি কোন উপায় হ'তে পারে না দিদি? এই যে এমন সুন্দর সুন্দর জীবনগুলি অশান্তির কালিতে ভরে ওঠে,—এই যে লজ্জা, এর হাত থেকে বাঁচ্‌বার কোনই কি উপায় নেই?—

মায়া। উপায় তোরই হাতে, কিন্তু যদি ভাল মেয়ে হ'তে চাস্ তাহ'লে নেই। তোর হাতে তুলে কেউ কিছু দেবে না। মারামারি ক'রে নিতে পারিস্ বাঁচ্‌বি, নইলে অমনি ক'রে মরে থাক্‌তে হবে।

দীপ্তি। আচ্ছা আইরিসের কি করা উচিৎ ছিল তুমি মনে কর?

মায়া। ঐ অপমানিতের পাশে দাঁড়িয়ে বলা—এ অপমান আমারও অপমান, তোমাকে একা বইতে দেবো না . . .'

দীপ্তি। তার পর?

মায়া। ঐ 'তারপর'কে জুজু ভেবেই ত মানুষ মরে দীপ্তি . . . তারপর ঐ বন্ধুর হাত ধরে জীবনের পথ দিয়ে চলে আসা উচিৎ ছিল।—পুরুষ মানুষ একেবারে অসহায় যতক্ষণ না নারী তাকে চলায়। তার নড়বার ক্ষমতাই নেই . . . জর্জ্জ যখন বল্‌ল—বিদায়—' তখন তার ঐ কথার সুরের ভিতর দিয়ে কি অসহায় ভাবে সে আইরিস্‌কে ডেকে ছিল . . .

মেয়েদের Martyr হবার স্বভাবতঃই একটা নেশা থাকে, একটু ধাক্কা পেলে, অমনি ওরা নিজেদের জীবনের যা কিছু সবই ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু কতক্ষণ পারে?'—ঐ আইরিস আর একজনকে বিয়ে করল কিন্তু এক মাসের মধ্যেই আবার জর্জ্জকে লিখ্‌ছে—'

দীপ্তি। এটা কি উচিৎ?

মায়া। উচিৎ অনুচিৎ জানিনা দীপ্তি, ওটা হচ্ছে ভ্রম-সংশোধন। স্বভাবকে কোন যুক্তি তর্ক দিয়ে থামান যায় না। ফলে কি হ'ল?—ঐ চমৎকার ছেলেটার নির্ভীকতা, সত্‌তা, তেজস্বীতার ওপর ফুটে উঠ্‌ল—ধূর্ত্ততা নীচতা . . . দেখ্‌ত কি ক'রে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আস্‌ত, এই কাছে আস্‌বার কত নূতন নূতন উপায় তারা বার করত! . . . ভালবাসার নাম দিয়ে যে স্বেচ্ছাচারিতাকে তারা প্রশ্রয় দিল, তাকে কোন যুক্তি দিয়ে 'স্বাস্থ্যকর' প্রমাণ করতে পারি না দীপ্তি—জীবনে

যাকে সব চেয়ে বড় সত্য বলে জান্‌ল, তাকেই অবহেলা, অপমান, অস্বীকার ক'রে শুধু কতকগুলি মানুষের মন রাখ্‌বার জন্যে কিম্বা বিশেষ কতকগুলি অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এমন ক'রে প্রচণ্ড সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার ক'রে দিল! . . .

মানুষ যখন বলে—তোমায় ভালবাসি, তখন তার ঐ কথার মধ্যে দিয়ে আর এক নূতন জগতের সৃষ্টির আরম্ভ হ'য়ে যায়, একথা কারো মনে থাকে না! দীপ্তি, ঐখানটা পড়ে দেখ একবার—ঐ ২০৭ পাতার নীচে যেখানে আইরিস তার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছে—Can it be George ?—or he—' দীপ্তি, ভগবানের রাজ্যে এর চেয়ে আর একটা বড় শাস্তির কথা ভাব্‌তে পারিস ?

দীপ্তি চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল—মায়াও আর কোন কথা কহিল না।

৫

যে জমিটা একটু বেশী নীচু সেইখানেই সমস্ত জল আসিয়া জমা হয়। সুপ্রকাশের ঘরখানিরও ঐ রকমের একটি গুণ ছিল—বাইরের মানুষকে টানিয়া আনিয়া ভিতরে জড় করে! কিন্তু ঘরখানির এই আশ্চর্য্য শক্তির প্রভাব সকলে প্রাণ মন দিয়া অনুভব করিলেও, ঠিক কারণটা বুঝিতে পারিত না।

নিজের ঘরে বসিয়া কিছু কাজ করিতেছে হঠাৎ কাহারও মনে ঐ আকর্ষণী শক্তি অনুভূত হইল—তাহার আর না যাইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। কেহ বাজার করিয়া ফিরিতেছে এবং অফিসের 'বেলা' হইবার আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া একবার সুপ্রকাশের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারে না, ইহা ছাড়া অবসরের সময়গুলির কথা বলাই বাহুল্য। এইজন্য সকলের মনেই একটা কৌতুক-মিশান ভয় লাগিয়া থাকিত—ওর কাছে গেলে চট্ ক'রে ওঠা যায় না . . . এই আকর্ষণী শক্তির বিষয় জানিত শুধু সুপ্রকাশ নিজে। তাহার একাণ্ড চায়ের পেয়ালাগুলির মধ্যেই এতগুলি মানুষের প্রাণ বাঁধা ছিল।—যে যখনই আসুক এক 'কাপ' হইবেই! . . . সুপ্রকাশ নিজে বেশ সৌখিন মানুষ। ঘরখানি পরিপাটি করিয়া সাজান, বসিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়—সমস্ত সময়ই কোন না কোন ফুল তাহার টেবিলে থাকিবেই।

বই পড়িবার অপেক্ষা কিনিবার বাতিক অত্যন্ত বেশী ছিল। ঘরে ঢুকিলেই বড় বড় আল্‌মারিগুলি চোখে পড়ে।

দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকে। তাহাও আবার তাহার খুসী মত। সে সমস্ত ছবি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাদিতে ছাপা হয় এবং ইহা হইতে প্রতি মাসে তাহার যে কয়টি টাকা হাতে আসে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট, তাহাকে বাড়াইবার তাহার কোনই আগ্রহ নাই।

মানুষ ক লইয়া কি করিয়া আনন্দ করিতে হয়, এবং আনন্দ করিবার সহস্র উপায় এবং পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার মত আর কেহ নয়। এই জন্য সকলেই তাহাকে চাহিত।

বন্ধুদের বেদনায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে তাহার ক্লান্তি নাই। সবাই তাহার কাছে মন হাল্কা করিয়া বাঁচিত। এই জন্য সময় সময় ঠাট্টা করিয়া সুপ্রকাশ বলিত— আমি যেন মিউনিসিপ্যালিটির 'কনজ্যারভেন্‌সি লরি'! ছুনিয়ার ময়লা বুকে নিয়ে বেড়াই।

স্বদেশী আন্দোলন লইয়া শ্রীশের সহিত তাহার পরিচয়। এত অল্প সময়ে পরস্পরের মধ্যে এমন একটা গভীর সহানুভূতির বন্ধন পড়িয়াছিল যে দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা বহুকাল হইতে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষত্বের দিকে দেখিলে কোথাও কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—নিজেদের মত ইত্যাদির পার্থক্য যত বেশীই থাক, কোন দিন একজন আর একজনের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে না। অথচ কাজের সময় দেখা গিয়াছে একজন আর একজনের পাশেই আছে।

শ্রীশ যখন খদ্দর ঘাড়ে করিয়া পথে পথে ফিরিত; সুপ্রকাশ আপত্তি করিত কিন্তু তাহাকে একা ছাড়িয়া দিত না; এবং তাহার যে কয় দিন জেল হইয়াছিল তাহা শ্রীশের পাশে থাকার জন্যই।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হইবে সুপ্রকাশ ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে এমন সময় বিকাশ, মুনি এবং জীবন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল—কি গো, হঠাৎ এমন রণ বেশে যে?—

মুনি। রণে আহ্বান করলে কি আর চুপ ক'রে থাকা যায়?—'

সে একখানি চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া সুপ্রকাশের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—আচ্ছা প্রকাশ, এর অর্থ কি? আর আমিই একা নই এরাও এক এক পরোয়ানা পেয়েছে!

সুপ্রকাশ। অর্থ হচ্ছে—অনর্থ।

জীবন। তার মানে?

সুপ্রকাশ। মানে, মাছ ধর্‌বার সময় বঁড়্‌শীতে টোপ্‌ দেবার যে মানে তাই।—নাকে কাঁটা আট্‌কে খেলাবে।

জীবন তাহার নাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—সে এ নাক নয়—কিন্তু তোমার ঠাট্টা রাখ ব্যাপারটা কি বল।

সুপ্রকাশ। আমি অত ভাবি টাবি না। আমিও ত একখানা চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তোদের মত মাথা ব্যথা করে না।

মুনি। তা না হয় তোমার মাথা একটু ভাল। আমাদের পচা মাথা যদি একটু বেশী ব্যথা করে—এখন কি করা উচিৎ বলে দাও।

সুপ্রকাশ। বুদ্ধিমানের কাজ—অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন—'

সকলে একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল—কখন না—'

সুপ্রকাশ। তবে আর অত ভাব্‌বার কি আছে?—

বিকাশ। ভাব্‌বার থাক্‌বে না? বল কি প্রকাশ?—এই ধর না জীবনটা চেয়ারে বস্‌লেই পা দোলায়, মুনিটা নাক খোঁটে আর আমাকে ত চেনই ফিক্‌-ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেলি কারণে-অকারণে . . . চিরকাল মেসে একা একা থেকে ঐ রকম কত বদ্‌ অভ্যাস হয়েছে এখন যদি সেখানে একসঙ্গে বা পর্য্যায় ক্রমে ঐ সমস্ত ক্রিয়া-কলাপগুলি কর্‌তে থাকি—তাহ'লে?—

সুপ্রকাশ। হাঁ তা ভাব্‌বার কথা বটে, তবে যদি বল, তোমাদের চপেটা-ঘাতে বা চিম্‌টি ঘাতে সচেতন ক'রে তুল্‌তে পারি—'

মুনি। সত্যি কিন্তু আমি ঐ ব্রাহ্ম বাড়ীগুলিকে ভয়ানক ভয় করি, ওদের চার পাশ এমন ঘসা মাজা যে সর্ব্বদাই যেন কেমন তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তে হয়। একবার মিঃ চাটার্জির বাড়ীতে গিয়ে ওঃ সে কি বিপদেই পড়েছিলাম।—ড্রইং রুমে সকলে জটলা ক'রে বসে ছিলেন, সেইখানে আমার ডাক পড়্‌ল। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়্‌ল আমার জুতোর ওপর—অমনি ফস ক'রে

খুলে ফেলে ভিতরে গিয়ে পড়েছি! . . . ইস্! সেকি সকলের চোখ টেপাটেপি ক'রে হাসি! চাটার্জি বল্লেন—এখানে মেয়েরা রয়েছেন, জুতোটা পায়ে দিয়ে আসুন—' মাইরি বল্ছি আমার কান্না পাচ্ছিল—'

বিকাশ। আচ্ছা ধর্ যদি কাল আমার ভয়ানক মাথা ধরে বা পেট কামড়ায় আমায় রেহাই দিবি?—

জীবন। কখন না। যমের বাড়ী গেলেও টেনে নিয়ে আস্‌ব।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা এক কাজ কর্ না কেন? তোরা সবাই আমাকে যা কর্‌তে দেখ্‌বি তাই করবি। আমি উঠ্‌লে উঠ্‌বি, বস্‌লে বস্‌বি, হাঁচ্‌লে হাঁচ্‌বি—'

মুনি। ও বাবা তা পার্‌ব না, তার চেয়ে নিজের মৎলবে মর্‌ব।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা তোদের এতভয়ের কারণটা কি?

মুনি। চিঠিটা প'ড়ে দেখ না।

সুপ্রকাশ। দেখেছি ত—শ্রীশ লিখ্‌ছে—মায়া আর দীপ্তি আমার মত দু'একটি 'জেল্ বার্ড'দের খাওয়াতে চায়—'এতে ভয়ের কি আছে?—খাবি রে—খাবি! নেমন্তন্ন।

জীবন। সে ত জানি। কিন্তু মানুষের কাছে গেলেই কথা বল্‌তে হয়—কি বল্‌ব?—'

সুপ্রকাশ। এরই জন্যে এত ভাব্‌না, তা এক কাজ কর্ আমার শেল্‌ফ থেকে 'Moral Discourse of Epictetus.' টা নিয়ে খানিক মুখস্থ ক'রে যা। ঘরে ঢুকেই আওড়াতে থাক্‌বি---সবাই ধন্য ধন্য করবে।

সুপ্রকাশের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমন সময় ভৃত্য একটা প্রকাণ্ড ট্রেতে করিয়া চা ও সিঙারা লইয়া উপস্থিত!

জীবন হাত জোড় করিয়া অভিনয়ের সুরে ভৃত্যকে বলিল—হরি বাপ, তুইকি আমাদের হৃদয়ের গোপন কন্দরে লুক্কায়িত অতি সূক্ষ্ম ঐ বাসনার কথাও জানিস?—ওরে বিকাশ—অ সুপ্রকাশ আরে দেখ্ দেখ হরি কি এনেছে—'

সুপ্রকাশ একটা সিঙাড়া খাইতে খাইতে বলিল—আচ্ছা মুনি, ব্রাহ্ম সম্বন্ধে তোর কি মত?

মুনি বলিল—ব্রাহ্মরা হিন্দু হ'তে পারে কিন্তু বাঙ্গালী নয়।

বিকাশ তখন সবে একটু চা মুখে দিয়াছে মুনির কথায় হাসির চোটে তাহার 'বিষম' লাগিল। মুনি বলিল—তা তোমরা হাসতে পার কিন্তু ওটা আমি সত্যি ভেবেই বল্‌ছি। আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সহজ সম্বন্ধটা বজায় নেই। কিন্তু কোথায় যে মেলে না, তা তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। খুব সহজে ওদের অন্য দেশীয় বলে মনে ক'রে নিতে পারি যদিও ওরা যে ভাষা ব্যবহার করে তা বাংলা বল্‌তে আমি বাধ্য। খদ্দর প'রে, তোমার আমার পাশে দাঁড়িয়েও দেখ্‌বে ওরা যেন হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষ।

সুপ্রকাশ। অর্থাৎ কোন মতে ওদের বিদেশী বলে বাজারে প্রমাণ ক'রে বাংলার ঐতিহাসিক মণ্ডলীর কাছ থেকে নাম কিন্‌তে চাও ত?

মুনি। ধ্যেৎ পাগ্‌লা। আমি তা বল্‌তে চাই না।—এই দেখ না শ্রীশকে, ও ত সমানে আমাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে কাটাচ্ছে, এক কাজ এক ভাব্‌না নিয়ে তবু দাঁড়াও ত দেখি ওর পাশে—ঐ রুক্ষ অস্থিচর্ম্মসার মানুষটার পাশে তোমাদের রমণীরঞ্জন চেহারাগুলোর চেকনাই দেখ্‌বে আর থাক্‌বে না। আমাদের মত হাজার মানুষের ভিড়ের ভিতর থেকে ওর স্বাতন্ত্র্য এবং পার্থক্য বুঝে নিতে কারো বেশী সময় লাগ্‌বে না।

সুপ্রকাশ। ঠিক যেন কাশীর চিনির পাশে দোবরা চিনির মত?—'

মুনি হাসিয়া বলিল—হাঁ তাই বটে।

সুপ্রকাশ। কিম্বা যেন আমরা 'অন্ধকারের কম্বল' মুড়ি দিয়ে সব ভিড় ক'রে বসে আছি, আর ও যেন আলোর জোয়ারে 'গা-ভাসান্' দিয়ে তর্ তর্ ক'রে ভেসে চলেছে, না?—'

মুনি। তাও হ'তে পারে।—মোটের ওপর, 'তুমি আমি' এক হ'তে পারি কিন্তু 'ও আমি' এক নই। আমরা চলেছি সহস্র বছরের তাগা-তাবিজ, নিষেধ-বিধানের বোঝা বয়ে, আর ও যেন ছেঁড়া কাপড়ের মত পথের এক পাশে সে সব ঠেলে সরিয়ে রেখে উচ্ছৃঙ্খল স্রোতটির মত বহে চলেছে . . . দেখিস নি, ও যখন পথ চলে, মনে হয় যেন উনপঞ্চাশ বায়ু ওকে ঠেলে নিয়ে যায়!—ওর সঙ্গে পা ফেলে চলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুপ্রকাশ। অর্থাৎ পথগুলো ওদের সহজ হ'য়ে গেছে সব, এই ত বল্‌তে চাও?—'

মুনি। হাঁ, আর তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, আমাদের চলার পথে যে ঘাঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের recognise না ক'রেও—'

সুপ্রকাশ। আজ কি বার?

মুনি। শনি,—কেন?

সুপ্রকাশ। যদি রবি হ'ত, তাহ'লে ভাব্‌তাম, এইমাত্র বুঝি তুমি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছ—তোমার মনের অন্ধকারের পর্দ্দাটায় বেশ খানিকটা ফুটো হয়েছে আর তার ভিতর দিয়ে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে!—কিন্তু এখনও ত বোঝা গেল না পার্থক্যটা কোথায়।

জীবন। আমি চেষ্টা করলে মুনির কথাটা বোঝাতে পারি তোমাদের।

বিকাশ। তর্ক ছাড়া কিন্তু—'

জীবন। রাজী,—কিন্তু প্রথমটা একটু হেঁয়ালির মত ঠেক্‌তে পারে—শোন:—

সেই গোলে মালে আমার মাথায় যখন লাঠির চোটটা লাগ্‌ল, আর রক্তে আমার সমস্ত শরীর রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন আমার পাশে সে দাঁড়িয়েছিল . . . উঃ কি আনন্দ পেয়েছি ঐ এক মুহূর্ত্তে!—আঁচল ছিঁড়ে আমার মাথা বেঁধে দিল . . . চোখ তার জলভরা . . . বল্‌ল—'প্রার্থনা করি আপনার ঐ রক্ত পড়া যেন সার্থক হয়—' আমার দেহের সমস্ত রক্ত যদি বার ক'রে দিতে পার্‌তাম্ তখন!—চোখ আপনা হ'তে বন্ধ হ'য়ে এল! তারপর দেখি সে আর একজনের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে! . . . সেইখান থেকে তাকে আমার কৃতজ্ঞতার নমস্কার জানিয়েছি—'

সুপ্রকাশ। হিয়ার হিয়ার!—দিব্যি এক পশলা প্রেমবারি-বর্ষণ হ'য়ে গেল! কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের তর্কের কি সম্বন্ধ আছে?

মুনি। সুপ্রকাশ তোমার বুদ্ধিটা কিছু মাটো—ও বল্‌তে চায় ওর জীবনও শ্রীশের মত মুক্ত এবং সহজ হবে যখন ঐ কল্যাণী ওর হাত ধরে—'

জীবন। আঃ মুনি হতভাগা থাম বল্‌ছি।—আসল কথাটা কি জান প্রকাশ? আমার মনে হয় শুধু 'ব্রাহ্ম' বলে নয়, শ্রীশ তার জীবনের সার্থকতার সন্ধানকে দেখ্‌তে পেয়েছে।—দেখ না, ওর চোখে কি তীব্র জ্বালা, কি অপূর্ব্ব শান্তি পাশাপাশি রয়েছে! ও যখন পথ চলে, তখন মনে পড়ে যায় তাকে,

প্রাণে খুসী আর ধরে না, তাই ও ছুটে চলে . . . যখন কাজ করে, তখন মনে পড়ে যায় তাকে যার হাতখানি ওর সকল কাজের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে।—তাই কাজ ক'রে ও তৃপ্তি পায়, কাজের মধ্যেই ও বিশ্রাম পায়। আর আমরা—'

সুপ্রকাশ বলিয়া উঠিল—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলেছি ত চলেইছি . . . খাট্‌ছি ত খাট্‌ছিই . . . বসে যদি থাকি, তা যেন আর ফুরোতে চায় না! অথচ বিশ্রাম পাই না—' সর্ব্বদাই যেন কি এক গভীর শ্রান্তি সমস্ত শরীরে মাখান রয়েছে না ?—

মুনি। দেখ প্রকাশ তোমাদের কথাগুলো বিকারগ্রস্থ মানুষের মত হ'লেও ওর মধ্যে অনেকটা সত্যি মেশান আছে। মনটা যেমন দমে যাচ্ছে আবার তেমনি বলে উঠ্‌ছে—আশা আছে . . . আশা আছে!—সেই ডালকুত্তো মুখো মেড়োটা তার হাত ধরতেই এক ঘুসিতেই যখন তার নাকের ডগাটা চ্যাপটা ক'রে দিলাম তখন ওঃ সে কি মিষ্টি ক'রেই হেসেছিল! . . . তারপরই আবার রেগে বল্‌ল—কেন মারলেন ওকে? এটা অন্যায় কিন্তু—এত অসহ্য লাগ্‌লে ত কাজ এগুবে না . . .

কি আশ্চর্য্য কথাগুলি!—আমরা কি কোন দিন পরামর্শ ক'রে কাজে লেগেছিলাম? পথে এসে দেখ্‌লাম তাকে জীবনে প্রথম, কিন্তু ভাই এ না হ'লে ছিল ভাল—'

সুপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু প্রমাণটা হ'ল কি?

বিকাশ। প্রমাণ হ'ল—সোনার কাঠির সন্ধান পাওয়া গেছে এবার তার স্পর্শ পেলেই দেখ্‌বে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে—উনপঞ্চাশ বায়ু ওদের পিঠে থাব্‌ড়া মেরে মগজটাকে ঘুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে—'

জীবন। ঠিক তাই, সত্যি বলছি প্রকাশ এই এক মাসের মধ্যে এমন সময় —এমন মুহূর্ত্ত যায় নি যখন তার কথা মনে পড়েনি!

মুনি। জেল থেকে ফিরে অবধি এমন রাস্তা নেই যাইনি . . . কত জানালার দিকেই যে তাকিয়েছি কিন্তু—'

সুপ্রকাশ। কিন্তুটা ঐখানেই থাক, আর জের টেনো না—সত্যি তাহ'লে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবো।

জীবন। সেটা আর তোমায় কষ্ট ক'রে কর্‌তে হবে না—আমরাই যাচ্ছি নইলে—'

সুপ্রকাশ। নইলে কি ?

জীবন। আমাদের 'মাঠকড়াই' চিবুতে হবে।

সুপ্রকাশ। তার মানে ?—'

জীবন। আমাদের মেসের রাঁধুনিটার দৃষ্টিশক্তি কিছু বেশী, যদি ঘড়ির কাঁটাটা ন'টা থেকে দশটার ঘরে আসে আর তখনও আমরা না ফিরি সে দেখ্‌তে পায়—'বাবুরা কোন জায়গায় দিব্যি আরামে খেতে বসেছেন'। যতই ভাবে ততই তার খাবার ফেলা যাবার ভয় বেড়ে যায় . . . বাবুরা খাবেন না—ফেলা যাবে ? পয়সার মাল ?—তাই সে চেটেপুটে খেয়ে নেয়—ওহে বিকাশ—তোমার ত হাওয়া খেলেই চলে—কিন্তু আমরা একটু বেশী Materialist—ওঠ—'

সকলে হাসিতে হাসিতে সুপ্রকাশের নিকট হইতে বিদায় লইল। এবং কথা রহিল—কাল সকালে সকলে এক সঙ্গে শ্রীশদের বাড়ী যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রী—

বর্ত্তমানের বিশ্বব্যাপী জীবন-সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া রচিত গল্প বা প্রবন্ধ, কার্য্যকরী মনে হইলে আমরা তাহা কল্লোলে ছাপিব, কিন্তু ঐ সকল রচনার মধ্যে যাহা বক্তব্য থাকিবে, তাহাই আমাদের মত ইহা ধারণা করিলে ভুল হইবে।

অশ্রু

রাত্রি ছিল বড় একা। কেউ তাকে ভালবাস্‌ত না!

নদীপারের বাগানের মাঝখানে সারাদিন খেলা ক'রে টুকটুকে ফুটফুটে মেয়েটি দিনের আলোতে রাশি রাশি হাসি খুসী ছড়িয়ে সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমিয়ে পড়্‌ত। ঘরের কোণে তরুণী যৌবনের সাড়া পেয়ে রঙিন কল্পনা জল্পনা নিয়ে লুকোচুরি খেলে আঁধার সায়রে এসে আশ্রয় নিত—পর-দিনের মধুর সূর্য্যালোকের স্বপ্ন দেখ্‌তে। কেউ একবার ফিরেও তাকাত না তার দিকে! তাই তার বড় দুঃখ।

দিনকে সে ভালবাস্‌ত বড্ড! কেবলই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কখন্ বন্দী করবে তাকে নিজের বাহুর মাঝখানে। তার পর কবে তাকে বসন্ত উৎসবে বরণ ক'রে নেবে ব্রীড়াবনতা বধূটির মত!

কিন্তু যেমনি সে গোধূলির চম্পক আঙুল দিয়ে তার গলাটি ধরে আদর করতে যেত, দিন পালিয়ে যেত অপরাহ্নের পদবিক্ষেপে!

তবু রাত্রি ছাড়্‌ল না, ছুটে তাকে ধরতে গেল। দিন পশ্চিম দিকের রক্তিম অধিত্যকার ওপর দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

ব্যর্থ হৃদয়ে শৈল শ্রেণীর কোল থেকে রাত্রি নেমে এল! ব্যথা অশ্রুকণার মত পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়্‌ল!

প্রভাতে মানুষ দেখ্‌ল ফুলের কোলে ঘাসের আঁচলে বিন্দু বিন্দু জল জমে রয়েছে। ভাব্‌লে শিশির পড়েছে!—'

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

. . . কথা শুনলেই কি আর বোঝা যায়?—বোঝা পড়া মনের ভিতর। . . .

"জয় মালা"

কাজের মানুষ

অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া একটা মিউনিসিপাল বোর্ড তৈয়ারী হইল। ইহাতে নাস্তিক হরিবিলাসেরই চরিত্রের চাইতে চেষ্টার জোর বেশী ছিল। তার নাম দেওয়া হইল—"অল্ ইণ্ডিয়া মিউনিসিপাল বোর্ড"। ভারতবর্ষের যেখানে যত মিউনিসিপলিটি আছে তাহাদের ভিতর হইতে একজন করিয়া সদস্য এই বোর্ডে থাকিবে স্থির হইল। প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই বোর্ডের অধিবেশন হইবে। কোনও বড় সহরে এই সভা বসিবে আর এক বৎসরের জন্য একজন করিয়া নূতন 'চেয়ারম্যান' মনোনীত হইবে। এই ত হইয়া গেল ব্যবস্থা। উদ্দেশ্য—ভিন্ন ভিন্ন মিউনিসিপালিটির সদস্যেরা আপন আপন অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ও আলোচনাদির দ্বারা উপকৃত হইবেন।

সে বছর সভা বসিল—বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা সহরে। চেয়ারম্যান হইলেন নাস্তিক হরিবিলাস। হরিবিলাস চিরকালই কিছু নাস্তিক ছিলেন না। ভূমা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি বস্তর প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। প্রথম জীবনে দেশী কাপড়ের দোকান ছিল, হুজুগ কাটিয়া যাইতেই, ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন। খুঁজিয়া পাতিয়া বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকী পদ পাইলেন। বড়লোকদের খাতির করিয়া বিলাতী কাগজের তর্জ্জমা করিয়া আর সভাসমিতিতে যোগ দিয়া এক রকম করিয়া কিছু কাল কাজটী বজায় ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট যখন সদয় হন্ খোলার চালের ফুটা দিয়াও রোদ্ আসে। গরমের দিনে মাথা ফাটে—বর্ষার দিনে বৃষ্টি পড়ে—কিছু আর শুক্নো থাকে না! হরিবিলাসেরও তাহাই হইল। একজন সস্তাদরের সম্পাদক পাইয়া কাগজের পৃষ্ঠপোষক ধনী, হরিবিলাসকে "অন্যত্র চেষ্টা" করিতে বলিলেন।

সকল জিনিষে অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়াই হরিবিলাসও ভবিষ্যতের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে একটা ছুটী করিয়া কাগজে পত্রে ইংরাজী বাঙ্গলাতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রবন্ধ লিখিবার তাঁহার একটা মস্ত বড় কায়দা ছিল। সুরু করিবার সময় আসল বিষয়টী সম্বন্ধে

দু একটী কথা লিখিয়াই পরোক্ষে নিজের সুখ দুঃখের কথা দেশের উপর দিয়া তাহার ভিতরে কলমের ডগায় করিয়া চালাইয়া দিতেন—উপসংহারে দেশের লোককে লক্ষ্য করিয়া এই অন্যায় ও অবিচার মোচনের জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেন। এতে করিয়া তাঁহার দুইটী লাভ হইল। একদিকে দেশের লোক তাঁহাকে সৎসাহসী, দেশসেবক বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, অন্যদিকে অর্দ্ধগবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা খোঁচাতে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদের কাছেও হরিবিলাসের খাতির হইল।

এদিকে হরিবিলাস রাজনীতিক সভাসমিতি ছাড়াও হরিনাম সংকীর্ত্তন সৎসঙ্গতাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত দেশের প্রতি তাঁহার একটা গোপন মায়া ছিল। উপার্জ্জনের কোনও পথ ছিল না। অতি কষ্টেই বাহ্যিক কাঠামটা বজায় রাখিয়া ছিলেন। জামা জুতা যাহা ছিল তাই অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু একদিন এক হরিসভায় গিয়া তাহারও কিনারা হইয়া গেল। প্রমত্ত কীর্ত্তনের পর লুঠের বাতাসা কোঁচড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন একটা জোড়া মাত্র জুতা তাহাও কে বাতাসার সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে! চোখে তাঁহার জল আসিল। হরিসাধকরা ভাবিলেন হরিবিলাসের কি ভাব! এখনও ভাবে গদ গদ, চোখে জল! হরিবিলাস ভাবিলেন এই আমার দেশের লোক! এই হরিরলুঠ বাতাসা প্রসাদ লইয়া ঘরে যাইবে তা না একি?—এই দেশ!

সেই হইতে হরিবিলাস মিউনিসিপালিটির সভ্যদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নূতন উৎসাহে আইন রিপোর্ট প্রভৃতি কাগজে সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কর্ত্তারা আগেই একটু সসব্যস্ত হইয়া ছিলেন কাজেই হরিবিলাস উল্টা গান ধরিতেই তাঁহারা তাঁকে লুফিয়া নিলেন। সে বছরেই তাঁহাকে এক বছরের জন্য 'চেয়ারম্যান' মনোনীত করা হইল। একবারে মোটা মাইনে! তাই হরিবিলাস নাস্তিক হইয়া গেলেন। আপন কর্ম্মকুশলতার উপরই তাঁহার ভক্তি হইল—ঈশ্বরকে বাদ দিলেন।

প্রথম বৎসরের অধিবেশনে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত করা হয় এবং সেই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত রিপোর্ট দিবার জন্য সদস্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। এ বৎসর হরিবিলাস সে গুলি সভার সমক্ষে পাঠ করলেন।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সভ্যেরা এক বৎসরের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ রিপোর্ট সহ উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন যথা :—

১। মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ডোবা প্রভৃতি ভরাট করিবার জন্য যে অর্থব্যয় হয় তাহা কিরূপে কমান যাইতে পারে?

২। মিউনিসিপালিটির রাস্তা গলিতে ধূলা নিবারণের জন্য যে জল ছিটান হয় তাহার ব্যয় কিরূপে সংক্ষেপ হইতে পারে?

৩। দেশের লোকেরা মৃৎপাত্রের মহার্ঘ্যতা সম্বন্ধে যে আবেদন করিয়াছে কি উপায়ে তাহার মীমাংসা হইতে পারে?

৪। পথে ঘাটে ফুটপাতে দেশবাসীরা যে ঈষৎ কুঁজো হইয়া চলেন তাহা কিরূপে নিবারণ করা যাইতে পারে? কারণ লোক সোজা হইয়া তাড়াতাড়ি পথ চলিলে পথে ও ফুটপাতে জায়গা বেশী হয় ভীড় হয় না এবং বিদেশীদের লাথি ও ধাক্কা থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা যায়।

একজন সভ্য প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—এই প্রশ্নের মীমাংসার মাত্র দুইটী পথ আছে। হয় একবার অধিক অর্থব্যয় করিয়া যাবতীয় ডোবা খানাগুলিকে অন্য স্থানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হউক নচেৎ দেশের খবরের কাগজ, মাসিক সাহিত্য ও গল্প পুস্তকাদিতে, প্রবন্ধ গল্প ও কবিতাদিতে শতকরা নিরানব্বইটিতেই যে "বুকের বোঝার" উল্লেখ দেখা যায় তাহা ব্যবহারোপযোগী করা হউক। যাঁহারা এই সকল "বুকের বোঝা" লইয়া আজীবন কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা যদি সেগুলি বুকে রাখিয়া যন্ত্রণা না পাইয়া মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ডোবা প্রভৃতিতে ফেলিয়া দিয়া আসেন তাহা হইলে মাটী ও জঞ্জাল দিয়া ভরাট করিবার গাড়ীভাড়া খরচ একেবারে কমিয়া যায়। আমি প্রস্তাব করি এ বিষয়ে দেশবাসীকে সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়া প্রাদেশিক ভাষার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক। এবং এরূপ প্রত্যেক 'বুকের বোঝা' মুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপর এই আনন্দ লাভের জন্য বোঝা প্রতি দুই আনা টেক্স ধার্য্য করা হউক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রিপোর্টে অন্য সভ্য বলিলেন—আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটির করদাতাগণ যদি ঘরে বসিয়া গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায় 'চোখের

জল' না ফেলিয়া তাহা প্রতিদিন দুইবেলা পথে আসিয়া ফেলেন তাহা হইলে গাড়ী করিয়া বা অন্য উপায়ে ধূলা নিবারণের জন্য পথে যে জল ছিটান হয় তাহার ব্যয় সংক্ষেপ হয়। তবে এই সকল দেশবাসীরা যাহাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বা জনতা করিয়া চোখের জল ফেলিয়া পথের শান্তিভঙ্গ না করেন তাহা দেখিবার জন্য মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে পুলিশবিভাগে পুলিশ মতায়নের জন্য আবেদন করা হউক। এ সম্বন্ধেও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।

তৃতীয় প্রশ্নের রিপোর্ট পড়িতে একজন স্বনামধন্য কুম্ভকার উঠিয়া বলিলেন—আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে—সকল প্রকার মৃৎপাত্রেরই মূল্য-বৃদ্ধি হয় নাই। কেবলমাত্র মাটীর ঘড়া ও কলসীর দাম বাড়িয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের দেশবাসী চিত্রশিল্পীরা কতক পরিমাণে দায়ী। তাঁহারা তাঁহাদের "মন্দির পথে" "স্নানের ঘাটে" "প্রেমের পসরা" প্রভৃতি আনন্দ ও বিরহের সকল প্রকার ছবি আঁকিতেই একটী করিয়া কলসী বা ঘড়া ছবির বিষয়ীভূত নর-নারীর কাঁখে বা কাঁধে স্থাপন করেন। এই সকল ছবির নক্সা আঁকিতে তাঁহারা এক একজনে তিন চারিটী করিয়া কলসী ও ঘড়া প্রত্যহ ক্রয় করেন। ছবি আঁকিবার পর সেগুলি দিয়া কি করেন পুলিশ রিপোর্টের অস্থি-ঘাতীর 'লিষ্ট' দৃষ্টে তাহা কিছু অনুমান করিতে পারি নাই। আমার প্রস্তাব এই সকল দেশীয় চিত্রশিল্পীদিগকে মিউনিসিপালিটি হইতে অনুরোধ করা হউক, আপাততঃ তাঁহারা কিছু কালের জন্য এইরূপ ছবি আঁকা স্থগিত রাখিয়া কোনও কর্ম্মশীল জীবনের বা তদনুরূপ বিষয়ের ছায়া অবলম্বনে ছবি আঁকুন। তাহা হইলে মাটীর জিনিষের দাম অনেক কমিয়া আসিবে।

চতুর্থ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া জনৈক সভ্য বলিলেন—যে সকল লোক মাথা নীচু করিয়া কুঁজো হইয়া অন্যমনস্কভাবে পথে ঘাটে চলা ফিরা করেন তাঁহাদের নাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত একটী সরলরেখা টানিয়া যতখানি স্থান তাঁহারা চলাফিরাতে অধিকার করেন তাহার সম্যক্ মাপ লইয়া ফুটপ্রতি এক পয়সা করিয়া পথকর ধার্য্য হউক। এবং এই সংগৃহীত অর্থ হইতে একাংশ বা ততোধিক ব্যয় করিয়া একটী "কুঁজো পরিদর্শক" বিভাগ খোলা হউক। এই সকল ইনস্পেক্টররা পথে পথে ঘুরিয়া উপরিউক্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগের নিকট হইতে মাপ সাব্যস্ত করিয়া কর আদায় করিবেন। তাহা হইলে পথের ভীড়ও অনেক

কমিয়া যাইবে। পয়সা দিতে হইবে বলিয়া পথগুলিকে তাঁহাদের বৈঠকখানা বা বেড়াইবার মাঠ বলিয়া মনে করিবেন না। এবং এই উপায় অবলম্বনের জন্য কর্তৃপক্ষকেও কোনওরূপ ব্যয়াতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইতে হইবে না।

রিপোর্ট পড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হরিবিলাসের জয়ধ্বনি উঠিল। সভার অনুমোদন অনুসারে নানা ভাষার পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

ইহাতে দেশের লোকের কতদূর কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল বা তাঁহারা আপন আপন সাধ্যানুসারে মিউনিসিপালিটিকে কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আগামী বৎসরের অধিবেশনের পূর্ব্বে জানিবার কোনও উপায় নাই।

বোর্ডের নিয়মানুসারে কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে হরিবিলাসের পদচ্যুতি ঘটিল। চতুর্থ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রস্তাবানুসারে একটী ইনস্পেক্টরী পদের জন্য প্রার্থী হইয়া হরিবিলাস আবেদন করিলেন। হরিবিলাসের তাহাতেও জয় হইল। জানিনা তিনি এখন কোন্ দেশের কোন্ পথে ঘুরিয়া বেড়ান।

কবির মরণ

রাজা বল্লেন—এত গোলমাল কিসের হে! দেশে হঠাৎ এমন মড়াকান্না উঠ্‌ল কেন?

পারিষদেরা হেসে বল্লে—আজ্ঞে ওদিকে কান দেবেন না, ওরা একটু সখের কান্না কাঁদ্‌ছে। কে একটা কবি মরে গেছে কিনা—

রাজা খোঁজ নিলেন, কে কবি। জানলেন কবি, তাঁরই দেশের কবি। গর্ব্বে তাঁর বুক দশ হাত ফুলে উঠ্‌ল।

তিনি সবাইকে ডেকে বল্লেন—কবির জন্যে তা হোলে একটা কিছু করতে হয়।

সবাই সমস্বরে বলে উঠ্‌ল—আজ্ঞে বিরাট শোক সভা করুন, আপনার যখন খুসী হয়েছে—

রাজা বল্লেন—শোক সভা বড় পুরোণো হোয়ে গিয়েছে, রাজা আমি, একটা রাজসিক ব্যাপার কিছু হওয়া চাই।

সবাই বল্লে—আজ্ঞে তা হোলে মর্ম্মরমূর্ত্তি।

মূর্ত্তি তৈরি করবার হুকুম দিয়ে রাজা চলে গেলেন!

চারিদিকে সমারোহ পড়ে গেল। কবির মর্ম্মরমূর্ত্তির জন্য শিল্পীর কাছে লোক গেল। কবির বন্ধুদের কাছে খবর এল—চল কবির দেশে, সেখানে তোমাদের বন্ধুর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হবে, রাজার নিমন্ত্রণ।

কবির বন্ধুরা রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি কোরে রাজার দূতকে বলে দিলে—আচ্ছা যাব।

অপমান বিজড়িত এই নিমন্ত্রণ তারা একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না।

তেপান্তরের মাঠ। তার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে মাটির পথ চলে গিয়েছে, কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। রাজার মোটর-গাড়ী কবির বন্ধু তারই মতন একদল লক্ষীছাড়াকে পাঁজাকোলা কোরে ধরে অন্ধকার ধাত্রির নিকষ কালো কাঁপা বুক ফুঁড়ে ছুটে চলেছে . . .

তারা চলেছে তাদের মৃত বন্ধুর আত্মার তর্পণ করতে।

মোটর-গাড়ী চলেছে ষ্টিমারের ঢেউয়ে-পড়া পান্সির মতন, উঠতে পড়তে হেল্‌তে ছুল্‌তে। প্রত্যেক ওঠা নামার তালে তালে তাদের প্রাণপাখী ধড়ফড়িয়ে উঠ্‌ছে। সেই ধড়ফড়ানিটুকু থামিয়ে দেবার জন্য মোটর তার চার-পায়ে রাশি রাশি পথের ধূলো তুলে তাদের নাকে মুখে ঠেসে ধরছে। মধ্যে মধ্যে পাগলা হাওয়া তারই মতন সৃষ্টিছাড়া এই লোকগুলোর সন্ধান পেয়ে রাস্তা থেকে লাফিয়ে উঠে তাদের মাথায় লাল-ধূলোর লাজাঞ্জলি ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

কবির বন্ধুদের মুখে কথা নেই; বুকে তাদের বিষম বোঝা। তারা যে চলেছিল বন্ধুর পলাতক আত্মার তর্পণ করতে।

রাত্রির অন্ধকার আর ধূলোর ধোঁয়া ঠেলে দৃষ্টি যতদূর যায়——অন্ধকার—ধূ ধূ অন্ধকার।

বন্ধুদের মনে ছায়াবাজির মতন একটার পর একটা কত ছবিই উদয় হচ্ছিল, মিলিয়ে যাচ্ছিল। এই রকম কত অন্ধকার আর কত জ্যোৎস্নাময়ী রজনী তারা সবাই একত্র বসে আশার আকাশ-কুসুম চয়ন করেছে। যাক্ সে কথা!

তাদের দেখে তুনিয়াশুদ্ধ লোক টিট্‌কিরি দিয়েছে। সাধু বলেছে—সাবধান! গৃহস্থ বলেছে—এ বাড়ীতে পা দিও না। ভণ্ড বলেছে—ওরা সাংঘাতিক লোক। সবার অপমানের কাছ থেকে সন্তর্পণে নিজেদের বাঁচিয়ে তারা একটা আলাদা রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সুস্নিগ্ধ মরণ চুপি চুপি এসে তাদের একজনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে গিয়েছে; যাক্ সে কথা!

সংসার তাকে দারিদ্র্য দিয়েছিল। লোকে তাকে অবজ্ঞা করেছে। পরিহাসের তীক্ষ্ণ বেদনায় অন্তর তার ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। মৃত্যু তাকে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দিয়েছে। আশার কুসুম-পেলব মঞ্জরী নিরাশার দংশনে বার বার জর্জ্জরিত হয়েছে, কিন্তু নিরুৎসাহ কখনো তাকে পায়ে দল্‌তে পারে-নি।

সে ছিল মূর্ত্ত বিদ্রোহ। শত শতাব্দীর মূক বেদনার করুণ কাহিনীকে সে ভাষা দিয়েছিল। নিজের বুক ফাটা তুঃখের গলা টিপে ধরে সে অন্যের শ্রান্ত ভগ্ন বুকে আশার সঙ্গীত জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু অবহেলার উদাস ঝড় সে ভাষা, সে সঙ্গীতের সুরকে উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে।

বন্ধুরা সবাই ভাবছিল, আজ জীবযাত্রার অবসানে তাদের বন্ধু মহিমালক্ষ্মীর

সামনে গিয়ে তার এতদিনের সযত্নে গাঁথা মালাখানি নিয়ে কি ভাবে দাঁড়িয়েছে? আজন্ম-সঞ্চিত রুদ্ধ অশ্রুজল দিয়ে যে সে মালা গাঁথা। তার প্রতি বিন্দুটিতে কত কাহিনী জড়িত আছে, তার সব কথা যে তারা জানে—যাক্ সে কথা!

এতদিন কেউ তার খোঁজ নেয় নি! যদিও তাদের মধ্যে তার স্থান ছিল সবার ওপরে, কিন্তু তাদের বাইরে কোথাও তার জন্য এক বিন্দুও স্থান ছিল না। আজ মৃত্যুর পর চারিদিকে তার শোকসভা, ভগ্নদূতদের আর বিশ্রামের অবসর নেই।

তাদের কল্পনার পাখা মুক্ত আকাশে ছুটতে না পেরে অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ছিল। হঠাৎ সারথীর গলার আওয়াজে তাদের চমক ভাঙ্‌ল—নামতে হবে এইবার।

বেলা শেষে মাঠের মাঝে কবির মর্ম্মর মূর্ত্তি ঘিরে বিরাট সভা। দেশ বিদেশ থেকে বক্তা এসেছে। ভাড়া করা বক্তারা কেউ ঘণ্টা কেউ বা দু-ঘণ্ট ধরে কবির গুণ গাইলেন। বক্তারা বল্লেন—কূল পবিত্র হয়েছে, জননী কৃতার্থ হয়েছেন।

রাজা কবির মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন কোরে চলে গেলেন।

দেশশুদ্ধ লোক রাজার পেছনে যেতে যেতে বল্লে—এমন গুণগ্রাহী রাজা যাদের, তাদেরই ঘরে এমন কবির জন্ম হয়।

সভাস্থল শূন্য। কেবল কবির বন্ধুরা সেই মর্ম্মরমূর্ত্তির চারপাশে দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যার আবছায়া ক্রমে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হোলো। সেই অন্ধকারে বন্ধুরা মূর্ত্তির গলায় একে একে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

---

* * *

. . . কান্না যখন ঝরে তখন বুকখানিকে চূর্ণ ক'রেই ঝরে, কিন্তু ঝর্‌তে ঝর্‌তেই শুখিয়ে যায়! . . .

"মালিনী"

বিড়ালের স্বর্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুড়ো পিসিমার আদর যত্ন থেকে আজ আমি কত দূরে! পিপাসা পেতেই নর্দ্দমা থেকে আকণ্ঠ পুরে জল পান ক'রে নিলুম, কিন্তু আজ তা যেরূপ তৃপ্তিকর যেরূপ সুমিষ্ট বলে বোধ হ'ল এরূপ আর কখনো মনে হয় নি। সব কিছুই আমার কাছে সুন্দর ও ভাল বলেই মনে হ'ল। এমন সময় আর একটা বিড়াল সেখানে এসে উপস্থিত হ'তেই আমরা তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ছুটলুম। সর্ব্বাগ্রে আমি তাকে আমার প্রীতি জ্ঞাপন করি, কিন্তু এটা নাকি আমার একজন সঙ্গীর প্রাণে সইল না, সে রেগে আমার ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বেদনায় আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম।

বড় বিড়ালটা আমায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌তে লাগ্‌ল, "যাক, এর জন্য ভাবনা কি, ভাব কর্‌বার মত ঢের বিড়ালই পাবে, এখন চলে এস আমার সঙ্গে।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাফেরা কর্‌তেই আমার খুব ক্ষিদে পেল, বন্ধুকে তাই বল্লুম, "এখানে আমি খাব কি?"

তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "যা পাবে।" এ প্রশ্ন আমায় বড় একটা সান্ত্বনা দিল না, কেন না অনেক খুঁজেপেতেও খাবারের সন্ধান মিল্‌ল না। অবশেষে দেখ্‌লুম, পাশের খোলার ঘরের বারান্দায় একটা স্ত্রীলোক রান্না কর্‌ছে। দেখলুম মাছ ভেজে রেখে সে মশলা পিষ্‌ছে। সুযোগ বুঝে যেই আমি এক টুকরো মাছ মুখে ক'রে চম্পট্ দিব অমনি মেয়েটা পাশ থেকে একটা ডালের কাঁটা দিয়ে আমার কোমরে এক ঘা বসিয়ে দিল। মুখের গ্রাস ফেলে তখন প্রাণ রক্ষা কর্‌তে ছুট্‌লুম।

ছাদে ফিরে আস্‌তেই বন্ধু বল্লে, "এমন ক'রে তো চল্‌বে না। আর কখনো এভাবে খেতে যেয়ো না। যে মাছ ভেজে রাখা হয়েছে তা বেরালের জন্যে নয়। বেরাল এঁটো পাতের পাশে যা পড়ে থাক্‌বে, তাই খাবে, মনে রেখো।" একথা কখনো জান্‌তুম না যে, মানুষের আহার্য্যে বিড়ালের কোন অধিকার নেই।

আমি এতদিন জানতুম; মানুষ যা খাবে বেরালেও তাই খেতে পারে এবং তার সে অধিকার ষোল আনাই আছে। বন্ধু বল্লে, রাত্রি হ'লে আমরা খেতে পাব। তার একথা শুনে সত্যিই আমি বড় নিরাশ হ'য়ে পড়্লুম। সে বল্লে রাত্রিতে নীচে নেমে যেয়ে বাড়ীর দরজার পাশে যে আবর্জ্জনার স্তূপ আছে, তার থেকে বেছে আমাদের আহার্য্য বার ক'রে নিতে হবে। সারাদিন না খেয়ে রাত্তির পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বন্ধু কিন্তু বেশ শান্ত ভাবে দার্শনিকের মতই কথাগুলি বল্লে, কিন্তু তা শুনে আমার দেহ থেকে প্রাণটা তখনই বেরিয়ে পড়্বার উপক্রম হ'ল।

(গ)

আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস বইল, ক্রমে আজকা'র মতই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়্তে আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। বেশ একটু শীত করতে লাগ্ল। জ্যোৎস্নার সাহায্যে আমরা ছাদ থেকে নীচে নেমে এলুম। রাস্তায় এসে দেখি, কি নগ্ন কদর্য্য তার রূপ, সব অন্ধকার, এখানে সেখানে দু'একটা দোকান তখনো বন্ধ হয় নি। লোক চলাচল নেই বল্লেই চলে। সূর্য্যের আলোর মত আলো তো নেইই, কেবল ঘন ঘোর অন্ধকার চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে এক একটা গ্যাসের আলো মিট মিট ক'রে জ্বল্ছে। ফুটপাথে জলে কাদায় একেবারে পিছল হ'য়ে পড়েছে, পা হড়্কিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তখন এ কষ্টের চাইতে ঘরে সুখের কথা আমার মনে হ'ল।

রাস্তায় পৌছতে না পৌছতেই বন্ধু আমার ভয়ে কাঁপ্তে লাগ্ল। ভয়ে লাঙ্গুল পশ্চাদ্ভাগে নিয়ে সুমুখের বাড়ীটার দিকে দ্রুত পলায়ন কর্‌ল এবং আমাকেও তাড়াতাড়ি তার অনুসরণ কর্তে বল্ল। খোলা দরজার এক পাশে সে আত্মগোপন কর্বার মতো একটু স্থান পেয়ে বেজায় আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌ল। পলায়ণের কারণ জিজ্ঞাসা কর্তেই সে বল্লে "দেখ্ছ না ঝুড়ি ও লাঠি হাতে একটা লোক এদিকে আস্ছে?"

—হাঁ।"

—"সে আমাদের দেখ্তে পেলে আর রক্ষা ছিল না—একেবারে আস্ত খেয়ে ফেল্ত!"

—একেবারে খেয়ে ফেল্ত! বলো কি? তবে কি রাস্তায়ও আমাদের স্থান নেই? আমরাই খেতে পাই নে, আবার আমাদেরই তারা খেতে চায়!"

(ঘ)

যাই হোক, লোকেরা বাড়ী ঘর ঝাঁটিয়ে যত রাজ্যের আবর্জ্জনা বাড়ীর সদর দরজার কাছে রাস্তার উপর ফেলে দিয়েছে। আমি সেই সব আবর্জ্জনা স্তূপ খুঁজে খাবার মত কিছু না পেয়ে হতাশ হ'য়ে পড়্লুম। এখানে সেখানে কাদা মাখা দু'চারটে ভাত বা মাছের কাঁটা পাওয়া গেল। ক্ষুধাতেষ্টায় প্রাণ তখন কণ্ঠাগত, সুতরাং সেই অখাদ্যই তখন খুব রসাল বলে মনে হ'ল, তাই তৃপ্তির সঙ্গে আহার করা গেল। বন্ধু সেই আবর্জ্জনা স্তূপ ঘেঁটে একাকার ক'রে ফেল্ল। সারা রাত এই ভাবে তার পিছু পিছু আহারের সন্ধানে এমনি ধারা ঘুর্তে লাগ্লুম, প্রতি বাড়ীর সদর দরজায় অলিতে গলিতে চরে বেড়ালুম। একদিকে অসহ্য ক্ষিধের তাড়না অপর দিকে সুদীর্ঘ দশ ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজে আমার ভয়ঙ্কর কাঁপুনি এল। তখন রাস্তাকে, স্বাধীনতাকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, সেই সময় পিসিমার সেই কয়েদ, সেই বন্ধনই আমার নিকট বাঞ্ছিত হ'য়ে উঠ্ল।

ভোরে বন্ধু আমায় টল্তে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে?"

আমি বল্লুম—হাঁ,

—বাড়ী যেতে চাও?

—যেতে তো চাই, কিন্তু বাড়ী চিনে তো আর যেতে পার্ব না।"

—আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস। কাল প্রাতে যখন তুমি বাইরে চলে এসেছিলে, তখনই তোমায় দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, তোমার মত সুখী কখনো স্বাধীনতার কঠোর আনন্দ উপভোগ কর্তে পার্বে না। সে যাই হোক, আমি তোমার বাড়ী জানি, এস তোমায় আমি তোমাদের সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্ব।"

বন্ধু আমার সরল ভাবে কথাগুলি বল্ল। আমরা বাড়ীর সদর দরজায়

পৌছতেই সে এতটুকু উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে বল্‌ল, "তা হ'লে এখন আমি চল্লুম, নমস্কার !"

আমি বলে উঠলুম, "না তা হবে না, তুমি যেতে পাবে না। এস আমরা একসঙ্গেই এখানে থাকি। কর্ত্রী বড় ভাল মানুষ, তিনিও তোমায় আমার মত ক'রেই যত্ন আদর করবেন, আর—

আমায় বাধা দিয়ে বন্ধু বল্লে, "না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। তুমি একটা প্রকাণ্ড নির্ব্বোধ। আমি না খেয়ে মরতে রাজী আছি, তবু তোমার এই পরাধীনতার শিকল কিছুতেই পরতে পারব না। তোমার ন্যায় পরগাছার মত যারা, তারাই ও সুখের জীবন লোভনীয় মনে করে। আমি স্বাধীনতা-কামী, সামান্য পার্থিব সুখভোগের বিনিময়ে অধীনতাকে বরণ ক'রে নিতে চাইনে কিছু'তই। যাক্, চল্লুম !"

সে দ্রুত গতিতে চলে গেল। আমি দেখ্‌লুম তার মুখ চোখে একটা তৃপ্তির, গর্ব্বের দীপ্ত আভা ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ঘরে প্রবেশ করতেই তোমার পিশিমা রেগে প্রথমটায় আমায় খুব কশে প্রহার দিলেন কিন্তু তাহ'লেও সেই প্রহারেও যেন আমার কষ্ট হ'ল না বরং আনন্দই হ'ল। আনন্দ হ'ল এই কারণে যে, যতই কেন প্রহার দিন, পরক্ষণেই তো পেট পুরে খেতে দেবেন !

* * *

এই কথা বলে মিনি বল্‌লে, দেখ দিদিমনি, আমাদের বুকের ছাতি গুলোও যেমন ছোট, প্রকাণ্ড ঐ স্বর্গটাকেও তারই মত ছোট ক'রে নিয়ে উপভোগ করতে চাই।

True happiness, paradise is to be shut up and beaten in a room where meat is.

তাই রান্নাঘরটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে সব চাইতে বড় স্বর্গ, —আশ্চর্য্য !

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী

১

স্মৃতির একটা উজ্জ্বল নিশানা রেখে প্রদোষ আকাশের ছড়ান মেঘগুলো যখন সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে ছুটে যেত, তখন অরুণা তার ক্ষুদ্র সংসারটীর এক রাশ ভাবনা নিয়ে রুগ্ন স্বামীর শিয়রে বসে নিজের সেই সুদূর অতীতের এক-টানা সুখের দিনগুলিকে ফিরে পাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত।

অরুণা নিজে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ত, তার সে দৈনিক প্রার্থনা এত বড় বিশ্ব-সম্রাটের দরবারে পেশ হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই তবু সে একদিনও প্রার্থনা কর্‌তে ভোলে নি। হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে ছেলেবেলা থেকে সে যাঁর নামের সঙ্গে এই বিশ্বের অণু-পরমাণুর ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে আস্‌চে, তর্কের খাতিরে তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ কর্‌তে সে আদৌ রাজী নয়।

কিন্তু অরুণা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ত না ইহজীবনের কর্ম্মের সঙ্গে তার এই কর্ম্মফলের কতটুকু সম্বন্ধ। জীবন নাটকের প্রথম অধ্যায়ের মাত্র কুড়িটী বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে যা দেখে আস্‌চে তাতে বাধ্য হ'য়ে তাকে জন্মান্তরের অপরিজ্ঞাত কর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিতে হ'ত। তা না হ'লে তার সরল অন্তঃকরণ কখনও সংসারের এতবড় একটা ভীষণ আঘাতে এমন ভাবে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যেত না।

তবে সে নিজেই নিজের দোষ স্বীকার ক'রে নিত। তার প্রথম যৌবনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই তার এই কর্ম্মফলের সম্মুখে এসে হাজির হ'য়ে পড়্‌ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হ'য়ে, নিজের মানসিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে, সংসারে জীবন-বিনিময়ের ব্যাপারে ধনবান পিতার সম্পূর্ণ অনভিমতে সে যে মানসিক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছিল, কর্ম্মের পথে সেটাই তার এই নিরতিশয় দুঃখের অভিব্যক্তি নিয়ে ফুটে উঠ্‌ত এটা মনে ক'রে সে সময় সময় এই অনির্দ্দিষ্ট দুঃখের একটানা স্রোতে ভেসে যাবার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ত।

রোগ শয্যায় শুয়ে, বিকাশ, অরুণার সেই চিন্তাকাতর শীর্ণ মুখখানির মলিন সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে দিনে দিনে মরণের পথে পাড়ি দেবার জন্য অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। যে দেশে তার মত কর্ত্তব্য-প্রিয় উদার-প্রাণ যুবকেরা নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দেবার প্রধান শত্রু 'অন্নচিন্তায়' কাতর; যে দেশের নিত্য-বিরাজিত ম্যালেরিয়া, দুঃখ, দারিদ্র্য, অর্দ্ধাশন, অপমান, নিরাশা, বিশাল যুবক সমাজকে গ্রাস করে, তাদের অসময়ে বার্দ্ধক্যের পথ দিয়ে মরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে, সেই দেশে বায় বহুল সভ্যতাভিমানী যুবক সম্প্রদায় সাধারণতঃ যে ভাবে মরতে চায়, বিকাশ ঠিক সেই পথেই আজ মরণ শয্যায় শুয়ে পড়েছে।

ডাক্তার তাকে 'থাইসিস্' বলে জবাব দিয়েছে।

সে আজ দেড় মাসের কথা। এর আগে বিকাশ আরও বার কত কিছু কিছু সময়ের জন্য রোগ শয্যায় শুয়ে ছিল বটে, কিন্তু সে তত চিরস্থায়ীরূপে নয়। ডাক্তারী ঔষধ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের কষ্টলব্ধ পয়সার বিনিময় ক'রে কয় বারই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, আবার অভাবের প্রতিকারের জন্য দরখাস্ত হাতে ক'রে নিয়ে সওদাগরী আফিসের কেরাণী হবার উচ্চ আশায় ছুটে গিয়েছে, কিন্তু এবার সে একবারেই নিরাশ। এ যাত্রায় বেঁচে উঠ্‌লে সে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় নিঃসম্বলে কেমন ক'রে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে এই ভাবনায় সে মরণ-প্রার্থী।

অরুণা তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজের যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রে ফেলেছে। এই দারুণ অভাবের দিনে নিজেদের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চল্‌তে গিয়ে ইতিপূর্ব্বে অরুণার একমাত্র সম্বল গহনাগুলি এক এক ক'রে হস্তান্তরিত হয়েছে। মাত্র দুইগাছি 'হাতের শাঁখা' সম্বল ক'রে, এখন উপায়াভাবে দৈবের 'ওপর নির্ভর ক'রে আছে। কিন্তু তাতেও শান্তি আসে না। দেবতারা কি কখনও কর্ম্মফলকে ধরে রাখ্‌তে পেরেছে? হিন্দুর ঘরের অশিক্ষিতা মহিলারা যাকে বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে অরুণা যে সে বিশ্বাস করবার শিক্ষা পায়নি।

কিন্তু সে দিন এসে যখন তার 'মনের মত' তাকে তারকেশ্বরে "হত্যা" দেবার পরামর্শ দিয়ে গেল, অরুণা সে কথাটাকে কেন যে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিতে পার্‌ল না তা বলা যায় না।

বিকাশ সে কথা শুনে, সেই রোগশীর্ণ মলিন মুখে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে আর কেন অরুণা! এত গুলো নিরাশার মাঝখান দিয়ে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় ক'রে লাভ কি?

অরুণা একটু মুখ ভার ক'রে বল্‌লে—কিন্তু তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে—(ত্যাগের' মাঝখান দিয়েই মানুষ 'মানুষ' হ'তে পারে।)

তার উত্তরে বিকাশ ম্লান হেসে বলেছিল—কিন্তু এত গুলো নিরাশাকে ত্যাগ করবার ক্ষমতা যে আমার নেই।

২

স্বাবলম্বনের পথে দাঁড়িয়ে, নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য সেই স্বদেশী যুগের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বিকাশ যতগুলি দেশ হিতকর কাজে হাত দিয়েছিল, কেবল মাত্র স্বজাতির সহানুভূতির কৃপণতায় অনবরতই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে, তার সমস্ত একাগ্রতা তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছে। রোগ শয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে বিকাশ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল এই এত বড় বাঙ্গালাদেশে একমাত্র দাসত্ব ভিন্ন বাঙ্গালীদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আর কোনও উপায় নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া ভগবানের অভিপ্রেত নয়। দেশের অবস্থা জেনেও প্রত্যেক বাঙ্গালী, তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে জীবিকার্জ্জনের অপর কোনও উপায়ের শিক্ষা না দিয়ে গোলামি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্‌বার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, নিজের জাতি ধর্ম্মের অবমাননা-জনক শিক্ষার বিরুদ্ধাচারী না হ'য়ে প্রকারান্তরে সমর্থক হ'য়ে পড়ে, তার ভবিষ্যতের ফল যা হওয়া সম্ভব প্রতিনিয়তই তাই হচ্ছে।

অনারে বি এ পাশ ক'রে বিকাশ যেদিন চাকরীর চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে স্বদেশ শিক্ষার উন্নতির জন্য নিজের জীবন পণ করেছিল, ঠিক সেই সময়ের এক ক্ষীণ শুভমুহূর্ত্তে অরুণার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। বঙ্গ-বিপ্লবের অনতিদূরে থেকে দেশের কাজে এই সাহসী অক্লান্ত-কর্ম্মী যুবকের স্বদেশ প্রীতি, শিক্ষিতা অরুণার হৃদয় খানিকে একটু একটু করিয়া সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নিয়েছিল। দরিদ্রতার পীড়নে ব্যথিত এই স্বদেশ-ভক্ত যুবকের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে, ছায়ার মত, তার সকল কাজের সঙ্গিনী হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে

দমন করতে না পেরে, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতার চিন্তাভার লাঘব ক'রে দিয়ে, অরুণা তার অভিন্ন-হৃদয়া বউদিদিকে নিজের মনের ইচ্ছাটা স্পষ্ট ক'রে খুলে বলেছিল। পূর্ব্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হলেও কেবলমাত্র দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই যুবকটাকে 'কন্যার ভার' সমর্পণ করতে অরুণার বাপের ততটা আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু মেয়ের মনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি ক'রে—তার মা সেইটে সম্পূর্ণ-রূপে সমর্থন ক'রে নিলেন। তিনি বল্‌লেন—ওই ছেলেই ভাল।

৩

এতবড় একটা ধনবান জমিদার কন্যার পানিগ্রহণ ক'রে বিকাশ আপনার হৃদয়ে যে সমস্ত উচ্চ আশাকে স্থান দিয়েছিল, বিবাহের একবৎসর পরেই সে বেশ বুঝ্‌তে পারলে তার সে আশা বৃথা। বিলাসসর্ব্বস্বদেশের ধনীরা যাতে চির অভ্যস্ত এ ক্ষেত্রেও তার কিছুই পার্থক্য ছিল না। ধনবান বাঙ্গালী কবে তার সঞ্চিত ধনরাশি দেশের কাজে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করেছে ?

বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করতে জানে। ক্ষুধিতের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে নিজের সভ্যতা শিক্ষা বজায় রাখ্‌বার জন্য দেশের অর্থ বিদেশীর হাতে তুলে দিতে জানে, আর জানে মটরে, জুড়িতে বন্ধুভোজে নিজের ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাতে। বিকাশের শ্বশুরের এসব কিছু বাদ যায়নি। অধিকন্তু তিনি কাউন্সিলের মেম্বর হবার জন্য, ভোটার সংগ্রহে জলের মত অর্থব্যয় করতে, রায় বাহাদুরীর লোভে 'নিউজিল্যাণ্ড ফেমিন ফণ্ডে' দান করতে বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন। বিকাশ এ সমস্ত একেবারেই সমর্থন করতে নারাজ। সেইজন্যই সে শ্বশুরের ততটা প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে নি। একটু একটু ক'রে সেই মতের অনৈক্য যে দিন তিল থেকে তাল পরিমাণ হয়েছে বলে বিকাশের ধারণা হ'ল, হঠাৎ সেই দিনই সে স্বাবলম্বনের পথে এসে দাঁড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে, শ্বশুরের প্রদত্ত অর্থে 'ল ক্লাশের' সংগৃহীত লেকচারগুলিকে গোল দিঘীর জলে ফেলে দিয়ে, পৈতৃক পর্ণ কুটীরে জন্মভূমিতে ফিরে গেল।

অরুণা তখন তার অন্তরে—।

৪

বোমা-বিভ্রাটের যবনিকা পাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীণ-অবরুদ্ধ বাঙ্গালী যুবকদের সহযাত্রী হ'য়ে বিকাশ যখন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর সুন্দর বনের বাঘের কোলে বাস করেছিল অরুণার সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্ম-যাতনার সেই দিন গুলি যে কি ভাবে কেটে-ছিল অরুণা তাহা নিজেই বল্‌তে পারে না। দেশে ফিরে এসে নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে উদরান্নের জন্য পরের দাসত্ব করতে বিকাশ যখন সম্পূর্ণ অসমর্থ হ'য়ে পড়েছিল; তখন অরুণা তার গায়ের গহনাগুলি বেচে ছোট খাট রকমের একটা ব্যবসা করতে তাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু বিকাশ তা করেনি। পুরুষকার তখনও তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। তারপর সে বুঝ্‌তে পার্‌লে তার মত উপায় হীনের পক্ষে স্বাবলম্বনের পথে যাবার একমাত্র সহজ উপায় 'গোলামি'।

সেই গোলামিই তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

'মনের মতর উপদেশ মত তারকেশ্বর থেকে হত্যা দিয়ে একদিন সকালে ঘরে ফিরে এসে অরুণা দেখ্‌লে বিকাশ বেশ সহজ মানুষের মত সুস্থ শরীরে সেদিন-কার 'এক্সচেঞ্জ গেজেট' নিয়ে নিবিষ্ট মনে তার পাতা গুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করচে। অরুণা যখন যে সে ঘরে এসেছিল, বিকাশ তার কিছুই জান্‌তে পারেনি। যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপনার নরম হাতখানি বিকাশের কপালের ওপর রেখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আজ কেমন আছ?" তখন সে চম্‌কে উঠে খুব তাড়াতাড়ি প্রায় এক নিশ্বাসে বলে ফেল্‌লে—এত দেরী হ'ল তোমার? আমি মনে করেছিলাম কালই তুমি ফিরে আস্‌বে।

অরুণা অনেক ক্ষণ পলকহীন নেত্রে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বিকাশ একটু দৃঢ়স্বরে অথচ গম্ভীর ভাবে বলে যেতে লাগ্‌ল—শোন অরু! যে দেশে দাসত্ব ভিন্ন জীবন বাঁচবার আর অন্য কোনও উপায় নেই, সে দেশে জন্ম নিয়ে সে দেশে শিক্ষিত সমাজের অনুকরণে বিরত হ'য়ে, যারা আমার মত নির্ব্বোধ তারাই স্বাবলম্বনের পথে নিজের অভাবের প্রতিকারের চেষ্টা ক'রে থাকে। আর তারই ফলে ম্যালেরিয়ার মত সংক্রামক হ'য়ে দারিদ্র্য সে সংসারটাকে,

উৎসন্নে দিয়ে ফেলে। আমি বেশ বুঝেছি দেশকে একথা বুঝিয়ে তার কোনও প্রতিকারের চেষ্টা করা বৃথা। বাঙ্গালীর প্রত্যেক সংসার যে পথে নিজের অভাবের প্রতিকারের জন্যে ছুটে যায়, আমাকে আবার সেই পথে ছুটে যেতে হবে। স্বাবলম্বনের মোহে ভুলে থাকলে দিন দিন এই ক্ষয় রোগই আমাকে ধ্বংশের পথে টেনে নিয়ে যাবে। আমার বেশ ধারণা হ'চ্ছে এ রোগের প্রতিকারের একমাত্র সহজ উপায়—'গোলামি'। এই গোলামির আশ্রয় নিয়ে আমি সাগর পারে চলে যেতে চাই। কেবল তোমার অনুমতিটুকু নিতে বাকী রয়েছে।

অন্য সময় হ'লে অরুণা কি ভাবে যে এ কথার উত্তর দিত সে তা না বল্‌তে পার্‌লেও কেবল এইটুকু মাত্র ব'লে ক্ষান্ত হ'ল—'আগে বেশ সেরে ওঠ, তারপরে যা হয় কর্‌বে'।

শীর্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বিকাশ বল্‌লে—বাংলায় জন্ম নিয়ে, যে বেঁচে থাক্‌তে আশা করে ছনিয়ার ভেতর তার চেয়ে যে নির্ব্বোধ জন্মাতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না।

অরুণা কি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হ'ল না। বিকাশ তখনই সে ঘর হ'তে বাহির হয়ে গেল।

৫

বিশ্বের অনন্ত কর্ম্মস্রোতে সে আজ গা ভাসিয়ে দিতে চায়। সে জান্‌ত এত বড় কর্ম্ম জগতে তার মত অতি ক্ষুদ্রের জন্য অনন্ত কর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। স্বার্থত্যাগ ক'রে সে কর্ম্মের মাঝে গা ঢেলে দিলে হয়ত তার জন্ম সার্থক হ'তে পারে, কিন্তু অভাব যে তাকে বন্দী করে রেখেছে। অভাবের হাত থেকে মুক্তি না পেলে সে কেমন ক'রে কর্ম্মের পথে আত্মশক্তি নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে?

বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিতে গিয়ে যেদিন সে হতাশ হ'য়ে ফিরে এল সেদিন অরুণা আর একবার তাকে নিজের মনের ইচ্ছা জানিয়ে বল্‌লে দেশের কাজে যদি জীবন ঢেলে দেবারই সাধ থাকে তাহ'লে দেশের শিল্প নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ।

অরুণার সঙ্গে বিকাশের মতের অমিল ওই খানে। বিকাশ প্রমাণ কর্‌তে চায় দেশের শিল্প স্বজাতীর সহানুভূতি ছাড়া বেঁচে থাক্‌তে পারে না। অরুণা বল্‌লে—তাহ'লে মুদীর ব্যবসা কর।

কিন্তু সেটা বিকাশের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। উচ্চ শিক্ষায় যারা উন্নত তারা কেমন ক'রে নিজের আত্ম সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের অশিক্ষিতদের আদর্শ অনুকরণ করবে? বিকাশ ভেবে দেখ্‌লে—সেটা তার পক্ষে অসম্ভব। তার পক্ষে যেটা সম্ভব সে সেই পথই অবলম্বন করতে স্থির-সঙ্কল্প হ'ল।

আর সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে সে একদিন বাড়ীর কা'কেও কিছু না বলে 'মেসোপেটমিয়া'য় চলে গেল।

অরুণা যেদিন "আলেকজাণ্ডার ডক" থেকে 'এক্‌মা' জাহাজগামী বিকাশের বিদায় 'টেলিগ্রাম' খানি হাতে পেল, সেদিন সে অনন্যোপায় হ'য়ে নিজের পিতার কাছে ফিরে যাবার জন্য মাকে সমস্ত কথা জানাল।

গান্ধীযুগের প্রথম কল্পারম্ভে যখন স্বদেশ-সেবক যুবক দল দলে দলে কারাবরণ করে দেশের জন্য নিজের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েছিল, ভারতের সেই নব জাগরণের দিন একটী স্তম্ভিত মধ্যাহ্নে বিকাশ নিজের জন্মভূমির কোলে ফিরে এল। আজ অনেক দিনের পরে তাহাকে আপনাদের মধ্যে পেয়ে তাহার সমবয়স্কেরা দেশের জন্য তাহার নিকট অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিল, কিন্তু বিকাশ আজ দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক পশ্চাতে।

মহাত্মা গান্ধীর কারা-বার্ষিকীর দিন আসমুদ্র হিমাচলের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুব্ধ ব্যথিত নর নারীগণ যে দিন এই মহাপুরুষের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে লালায়িত সেই ভারতের স্মরণীয় দিনে 'মডারেট দলের' অন্তর্ভুক্ত বিকাশ 'আমলাতন্ত্র শাসনের' অনুগ্রহের কণাটুকু সাদরে মস্তকে ধারণ করে অরুণার কাছে ফিরে এল। অরুণা তখন মোটা খদ্দরের কাপড়ে নিজের দেহাবৃত করে 'শিবমন্দির' হতে ফিরে আস্‌ছিল। তাহার এলায়িত চুলগুলি তখনও প্রাতঃস্নানের চিহ্ন দীপ্ত। সেই যৌবন দীপ্ত শান্ত হাসি মাখা মুখখানি তখনও বিশ্বের মাতৃত্বের গৌরব-প্রদীপ্ত।

মন্দিরের পথে অরুণার সঙ্গে বিকাশের দেখা হল। অরুণা সে দেখায় তৃপ্তি লাভ করল না। এই কি তাহার সেই স্বদেশ-ভক্ত কর্ম্মবীর জীবন সহযোগী! অরুণা একদিন স্বেচ্ছায় যাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে—এই কি সেই স্বদেশ-সেবক বিকাশ? অরুণার হাতের নৈবেদ্যখানি সেই খানে

তাহার পায়ের তলায় পড়ে গেল। সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"দেবতা মিথ্যা। এত করেও আমি আমার স্বদেশ-সেবক স্বামীকে বাঁচাইতে পারি নাই। তাঁর প্রেতাত্মা আমার সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখেছে মাত্র।"

শ্রীভবতারণ বসু

* * *

. . . হায় হায়!

কেনগো সুখের ডালা পলকে শুখায়ে ওঠে বেদনার ঘায়!

তোমার নয়নবারি কেমনে মোছাতে পারি সারাদিন ধরে

আমারই এ পোড়া চোখে এমন করিয়া যদি নিরবধি শুধু জল ঝরে।

"আভ্যুদয়িক"

সংগ্রহ

. . . "ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলি বন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখোনা। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বল।"

পথ নিশীথের কালো পর্দ্দার দিকে তর্জ্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে . . ,

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা এত ইচ্ছা, সে সব গেল কোথায় ?"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্য্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক দিক পর্য্যন্ত ইসারা মেলেরাখো . . .

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে সমস্ত চরণ পাত এতদিন পুষ্প বৃষ্টির মত পড়্‌ছিল আজ তারা কি কোথাও নেই ?"

পথ নিজের শেষকে কি জানে, যেখানে সমস্ত লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধগান পৌঁছিল, যেখানে তারার আলোয় অনির্ব্বাণ বেদনার দেয়ালি উৎসব হচ্ছে ?

"পায়ে চলার পথ"

. . অবস্থা ?—যে মানুষ একটি একটি করে সমস্ত অবস্থার কাছে হার মান্‌তে পারে, আপনার আত্মার যে সর্ব্বোত্তম 'প্রেম' তাকে যে অবস্থার বিপাকে অপমান করতে পারে তার ভাল না বাস্‌লেও চলে . . .

"ফুলের দোল"

* * *

. . . অন্ধ দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু তার দৃষ্টিহীনতার বাইরে প্রকৃতির যে লীলা-নাট্য চল্‌ছে, সে ত মিথ্যা নয়, শুধু তাকে অস্বীকার কর্‌লেই ত আর তার স্থিতিকে মেরে ফেলা যায় না, সে বেঁচেই থাকে।—ঐ অস্বীকার করার ভিতর দিয়ে অন্ধ শুধু তার অন্ধত্বেরই পরিচয় দেয় . . .

"পূজারিনী"

স্বর্গীয় ললিত কুমার দে

জন্ম—১০ই জানুয়ারী ১৯০২

মৃত্যু—৯ই এপ্রিল ১৯২৩

মাটিমায়ের কোল প'রে প্রতিদিন কত শত সুন্দর জীবন জন্মলাভ করে, সকলের খবর আমরা রাখিনা, তা সম্ভবও নয়। তাকেই আমরা ভালবাসি, যাকে আমরা বুকের খুব কাছে পাই। এই কাছে পাওয়ার ভিতর দিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় এবং এই পরিচয়ের মধ্যেই মানুষের স্নেহের বন্ধনের সার্থকতা।

যে তরুণ জীবনকে আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে এ জগৎ থেকে চিরবিদায় দিয়েছি, কাজের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়—অতি অল্প দিনের। কিন্তু যে অতি অল্পক'টি দিন তাকে—কাছে পাবার, তার সঙ্গে কথা বল্‌বার তাকে সাহায্য কর্‌বার তার কাছ থেকে সাহায্য নেবার সৌভাগ্য হয়ে ছিল তাতেই মুগ্ধ হয়েছি তার কাছ থেকে আরো অনেক খানি পাবার আশা করেছি।

তার মন তার চিন্তাশক্তি কি ভাবে এবং কোন দিকে বেড়ে চলে ছিল তার কথা তার দু'একটি রচনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাবে এবং সেগুলির সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও সত্য এবং সৌন্দর্য্যের অভাব নেই।

বৈরাগ্য সাধন সম্বন্ধে সে বলেছিল—যে জীবনের মধ্যে দেবতার সাড়া পেয়েছে জীবনকে অনুভব কর্‌বার আনন্দে তার চিত্ত ভরে ওঠে; তার ইন্দ্রিয় সব সজাগ হয়ে আলো বাতাস প্রভৃতির নিত্যদানকে পান কর্‌তে থাকে. . . . মানুষের কাছে দেবতা ভিখারী হয়ে দেখা দেন, যে স্বর্গকে মানুষের মধ্যে তিনি ছড়িয়ে দিলেন মানুষের কাছেই তিনি সেই স্বর্গ ফিরে পেতে চান! . . . এই স্বর্গ কি মানুষ দিতে পার্‌বে না তাঁকে?—' মানুষ যত টুকুই দিক না তাঁকে তাই তাঁর কাছে প্রিয় হবে—কেন না তা যে মানুষের দান . . .'

মানুষের দোষের বিচার সে কোন দিন কর্‌তে চাইত না এবং দোষীর

প্রতি একটি গভীর সহানুভূতি তার মনের মধ্যে ছিল। সে বল্‌ত—Christ এর ঐ কথাটা আমার খুব ভাল লাগে, কারো বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই মনে হয়—He who is without sin, let him cast the first stone at her . . .

Dr. Gaur এর বিল্‌ সম্বন্ধে সে বলেছিল—Indias first step towards liberty of conscience . . ?

অসহযোগ সম্বন্ধে তার ধারনা—আমাদের স্বদেশ প্রীতিটা যেন National Fanaticism ! যেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল, সেটা অপরের পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল আন্‌ছে সে দিকে দৃকপাত নেই . . . দেশী কাপড় পরে আমরা self supporting হচ্ছি এ কথা না ভেবে ভাবি Manchester এর লোক গুলো জব্দ হচ্ছে . .

স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে লিখেছিল—উন্মত্ত কুকুরকে স্বাধীনতা দেওয়ার চেয়ে হাস্য কর আর কি হতে পারে . . . স্বাধীনতা বল্‌তে আমি বুঝি সেই স্বাধীনতা যা অপরের স্বাধীনতার বিন্দু মাত্র অন্তরায় নয় . . .

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথায় লিখেছে—sympathetic understanding না হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসা বাঁচতেই পারে না। . . .

এই sympthetic understanding কথাটা কি ভাবে তার মনে জাগ্রত ছিল তা তার বুদ্বুদ নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়। সে লিখ্‌ছে—কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন—যে খৃষ্টকে যথার্থ ভাবে বুঝ্‌তে হলে নিজেকেও ছোট খাট খৃষ্ট হ'তে হয়, তার কম মূল্যে খৃষ্টকে চেনা যাবে না . . . এবং আমার মনে হয় সামান্য একজন মানুষকে বুঝ্‌তে হলে ও ঠিক খৃষ্টের মনের মত বিশালতা চাই . . .

তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা বলেন—ললিতের সবই ভাল ছিল . . . জগৎকে সে ভালবেসে ছিল, তার প্রিয়গানই ছিল—যে দিকপানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।

আলোচনা

ঘুমের আগে—শ্রীউমা গুপ্তা প্রণীত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। একখানি ছোটদের ছড়া ও গল্পের বই। বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য রচিত অনেক বই দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ সহজ ও সুললিত সত্যি ছোটদের উপযুক্ত বই খুব কম পড়িয়াছি। ছড়া ও গল্পগুলির প্রত্যেকটিতে শব্দের ঝঙ্কার ও তার সঙ্গে ছেলেদেরই প্রাণের আনন্দের মত একটা নৃত্যের তাল আছে। 'শুকতারা' গল্পটী বাংলার মায়ের সুরচিত একটি চিন্তা সম্পদ।

৮৮।বি, হাজরা রোড ও বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কাঙ্গাল—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। ফরিদপুর পোঃ আঃ পাংশা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী ও এম্, নজির উদ্দিন্ আহমদ। নগদ মূল্য এক আনা; ডাকে বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। বাংলার এক প্রান্ত হইতে পল্লীর দুঃখ সম্ভূত এই পত্রিকাখানির চেষ্টা সার্থকতা লাভ করুক এই কামনা করি।

সোনার বাংলা—কয়েক সংখ্যা পাইয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। নগদ মূল্য ৴৹ আনা ও বার্ষিক মূল্য ৩৲৹ টাকা মাত্র। অনেকের ধারণা বাঙ্গালা দেশের লোক কেবল বাজে জিনিষই চান। আমাদের মনে হয় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে। অনেক কাগজে অনেক ভাল জিনিষ ছাপা হয় সত্য কিন্তু কাগজ ও ছাপার জন্য তাহা কিছুই পড়া যায় না। এ কাগজে সবটুকুই পড়া যায়। অথচ কতকগুলি অনর্থক ছবি দিয়াই লোককে ফাঁকি দিবার চেষ্টা নাই। আমরা 'সোনার বাংলার' উন্নতি কামনা করি।

———